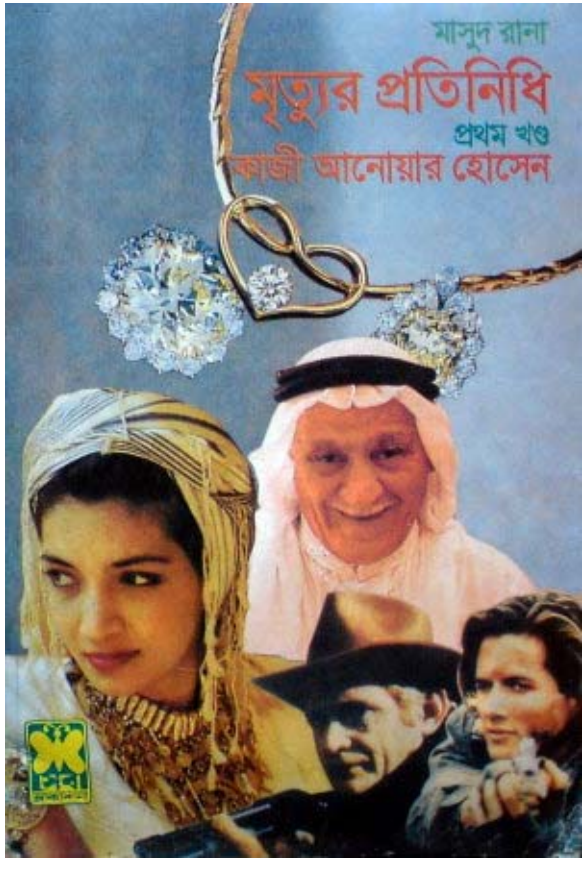

মাসুদ রানা

মৃত্যুর প্রতিনিধি-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

আকাশে চাঁদ নেই আজ। তারাও নেই। কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে আছে বিশ্ব চরাচর।

বড়সড় একটা জলজ দানবের মত পানির বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে চলেছে জাহাজটা। নেভিগেশন লাইট জ্বালানো হয়নি। আলোর বিন্দুমাত্র আভাস নেই জাহাজের আর কোথাও। বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ভৌতিক একটা অবয়ব। গুঁড়ি মেরে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। হুইল হাউসে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজটির ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন, ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। ভেতরে ভেতরে সাঙ্ঘাতিক উৎকণ্ঠিত।

দু'হাজার টনি 'লোট্টি ও মারা' নিয়ে এক সপ্তাহ আগে কুয়েত এসেছিলেন রকফোর্ড বিভিন্ন ব্রিটিশ ভোগ্যপণ্য নিয়ে। আজ ফিরে চলেছেন স্বদেশে। শূন্য জাহাজ নিয়ে। এবারই প্রথম এমনটি ঘটল। আগে কখনও শূন্য যায়নি লোট্টি ও মারা। ব্যাপারটা অকল্পনীয়।

কিন্তু কি আর করা! যেদিন কুয়েত বন্দরে নোঙর করেন রকফোর্ড, সেই দিনই সন্ধের পর ব্রিটিশ দূতাবাসে তলব করা হয় তাঁকে। জরুরী তলব। কী–না, উপসাগরীয় বাতাসের মতিগতি

ভাল নয়। ইরাক কুয়েত বর্ডারে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে শুরু করেছে, যে কোন মুহূর্তে যা খুশি তাই ঘটে যেতে পারে বলে সিআইএ এবং স্থানীয় ব্রিটিশ সংস্থাগুলো আশঙ্কা করছে।

অতএব মাল যত দ্রুত সম্ভব খালাস করতে হবে রকফোর্ডকে, এবং পালাতে হবে বন্দর ছেড়ে। এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। কেবল লোট্টি ও মারার বেলাই নয়, অন্য সমস্ত ইঙ্গ-মার্কিন জাহাজের ক্যাপ্টেনদের ডেকেও একই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছে যার যার দূতাবাস।

নির্দেশটার গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেননি অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন। পরদিনই ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয়সহ অন্যান্য সাপ্লাই কিনে স্টোর ভরে ফেলেছিলেন তিনি। শুধু ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরার কাজ বাকি ছিল, আজই সকালে সেরেছেন সেটা। তারপর সন্ধে নামতেই দে ছুট্। কোনদিক দেখাদেখি নেই।

অবশ্য জাহাজ যে একেবারেই শূন্য, তা কিন্তু নয়। মাল রাখার খোলে কিছু নেই ঠিকই, তবে ওপরের এক কেবিনে আছেন একজন যাত্রী। অত্যন্ত মূল্যবান এক যাত্রী। ধনকুবের এক কুয়েতি শেখ। কুয়েতে ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির বিশিষ্ট বন্ধু। বন্ধুর মুখে কুয়েতে সম্ভাব্য ইরাকি আগ্রাসনের আভাস পাওয়ামাত্র দেশ ত্যাগের জন্যে তৈরি হয়ে যান শেখ। ষাটের বেশি বয়স ভদ্রলোকের, বিপত্নীক। এক নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই। নিউ ইয়র্কে পড়াশুনা করে সে।

পয়সার অভাব নেই ভদ্রলোকের। প্রতিবছর অকল্পনীয় অঙ্কের অর্থ ওড়ান শখের পিছনে। অদ্ভুত শখ তাঁর। পৃথিবীর যেখানে যত হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তার নীলাম হয়, সেখানেই হাজির হয়ে যান। বগলদাবা করে নিয়ে আসেন সব। সাফাত সিটিতে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিশাল এক গ্যালারি বানিয়ে সেখানেই

সে সব সংরক্ষণ করেন তিনি।

কোটি কোটি ডলার মূল্যের রত্ন সম্ভার। অনেকের মতে এই পরিমাণ টাকায় কুয়েতের পাঁচ বছরের প্রতিরক্ষা ব্যয় অনায়াসে মেটানো সম্ভব। বন্ধুর মুখে ইরাকের সম্ভাব্য মতলব শুনে ভীষণরকম ঘাবড়ে যান ভদ্রলোক, কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভির কল্যাণে এই অদ্ভুত শখের জন্যে দুনিয়ার প্রায় সবাই কমবেশি চেনে তাঁকে, ইরাক তো বাড়ির কাছে।

সত্যিই যদি ওরা কুয়েত আক্রমণ করে, রত্ন ভাণ্ডার তো পরের কথা, গ্যালারির একটা ইঁটও অবশিষ্ট থাকবে না। বন্ধুকে ধরে বসলেন শেখ পরিত্রাণের একটা উপায় খুঁজে দেয়ার জন্যে। অনেক ভেবে বুদ্ধি দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, ওসব নিয়ে পালিয়ে যাও ইংল্যান্ডে। তাঁরই সহায়তায় লোট্টি ও মারায় প্যাসেজ পেয়েছেন ভদ্রলোক। সঙ্গে তিনটে বড়সড় ব্রিফকেসে রয়েছে তাঁর ভাণ্ডার।

নামে তাঁকে ভালই চেনেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। ফার্স্ট সেক্রেটারি খানিকটা আভাসও দিয়েছেন কি আছে ব্রিফকেসগুলোয়, ওটাই তাঁর উৎকণ্ঠার কারণ। শুধু ওগুলোর নিরাপত্তার কথা ভেবেই নেভিগেশন রুলের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন আজ রকফোর্ড। বন্দর ছেড়ে আসার ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ করে নিভিয়ে দিয়েছেন লোট্টি ও মারার সমস্ত আলো। কোনদিকে চলেছেন বুঝতে দিতে চান না কাউকে। অন্তত গালফ অভ ওমানে না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর। যাত্রীটি যেমন অমূল্য, তেমনি বিপজ্জনকও বটেন।

পায়ের নিচে ডেকের মৃদু, ছন্দোবদ্ধ কাঁপন অনুভব করছেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড, সেই সঙ্গে ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর ধুক্ পুক্ ধুক্ পুক্। জাহাজটা বেশ পুরানো। তেমনি পুরানো তিনি নিজে।

প্রায় চল্লিশ বছর হলো এর ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। লক্ষ লক্ষ মাইল সাগর পাড়ি দেয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর।

লোট্টি ও মারার সবকিছু, স-বকিছু রকফোর্ডের নখদর্পণে। তাঁর জানা আছে আর বেশিদিন চলবে না এটা, সময় ফুরিয়ে এসেছে। আর বড়জোর পাঁচ বছর, তারপর পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হবে লোট্টি ও মারাকে। সম্ভবত সেই কারণেই দিন দিন জাহাজটার ওপর মায়া বেড়েই চলেছে তাঁর। অনুভূতিটা এমন, যা কাউকে কোনমতেই ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না।

একটা ছোট, কালো চুরুট ধরালেন ক্যাপ্টেন। মাঝরাতের পর খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে মেঘের আড়াল ছেড়ে উঁকি দিল আধ খাওয়া চাঁদ। তারপর আবার অন্ধকার। অ্যামিডশিপের দিকে যাত্রীটি কি করছেন দেখতে একবার যাবেন কিনা ভাবলেন রকফোর্ড। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন। দরকার নেই। ভদ্রলোককে যথাসম্ভব বিরক্ত না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। কেবল তিনি যখন চাইবেন, এক কাপ হালকা লিকারের দার্জিলিং চা বা খাবার সার্ভ করার সময় ছাড়া কেউ যেন তাঁর কেবিনে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে বলে দিয়েছেন। দিনে-রাতে দশবার চা পান করেন শেখ।

কত টাকা ভদ্রলোকের? ভাবলেন রকফোর্ড, কত বিলিয়ন ডলার? সন্ধের ঠিক আগে যখন জাহাজে এসে উঠলেন ঘর্মাক্ত শেখ, দেখে মনে হচ্ছিল এইমাত্র যেন গোসল করে এসেছে মানুষটা। চেহারা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো অস্থির। যেন কেউ 'অ্যাই!' বললেই ঝেড়ে দৌড় দেবেন যে দিকে দু'চোখ যায়। বেচারী! পরে যখন কেবিনে ডাকিয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, তিন অক্ষরের শব্দটা মনে

মনে কয়েকবার আওড়েছিলেন রকফোর্ড। তাঁর মনে হয়েছে, ভয়ে ভেতরে ভেতরে মরে আছেন যেন শেখ।

তোয়ালে সাইজের বড় একটা রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখের-ঘাড়ের ঘাম মুছছিলেন, আর বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছিলেন। কেন যে মানুষের এত টাকা হয়, আর শখের পিছনে এত টাকা ঢালে মানুষ, ভেবে পান না রকফোর্ড। পালাও এখন পকেটের টাকায় কেনা গলার কাঁটা আর গলা মুঠোয় নিয়ে। যত্তোসব!

হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন ডেকে। ভারি ঠাণ্ডা শেষ মার্চের রাত। ফুসফুস ভরে বরফ ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিলেন তিনি, বুকটা জ্বলে উঠল যেন। উপসাগরের কালো বুকে চোখ রাখলেন ক্যাপ্টেন। পানি নয়, বিশাল এক দোয়াত কালি উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে যেন কেউ। বড় আকারের একটা পোকার মত লোট্টি ও মারা হাবুডুবু খাচ্ছে তার মধ্যে।

নিভে যাওয়া চুরুটটা ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দিলেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন। তরুণ সীম্যান পাগানকে দেখা গেল এদিকেই আসছে। কোন প্রশ্ন না করে চেয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর চার হাতের মধ্যে পৌঁছে দাঁড়াল পাগান।

'ভদ্রলোক চা খেতে চেয়েছেন, স্যার।'

'দিয়ে এসো। খুব হালকা করে বানাতে বলবে চা। খুব হালকা।'

'আই, ক্যাপ্টেন,' ঘুরে দাঁড়াতে গেল সীম্যান।

'না, দাঁড়াও। চা করে নিয়ে এসো, আমিই নিয়ে যাব ওঁর কেবিনে।'

দু'চোখ সামান্য বিস্ফারিত হলো পাগানের। 'আপনি চা নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আই আই, স্যার।' ঘুরে দাঁড়াল সীম্যান। অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাঁতের সঙ্গে সেঁটে থাকা খানিকটা তামাক পাতা আবিষ্কার করে জিভ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে আনলেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড, 'থোক্' করে ফেলে দিলেন। তারপর মন দিলেন এঞ্জিনের গান শোনায়।

ঠিক যেন তাঁর হৃদস্পন্দনের আওয়াজ ওটা। একই রকম শোনাচ্ছে। আরও কয়েক পা হাঁটলেন ক্যাপ্টেন। মনে হলো আওয়াজটার প্রকৃতি হঠাৎ করেই যেন পাল্টে গেল, কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছে এখন। টের পেলেন তিনি, ছন্দোপতন ঘটেছে কোথাও। অজানা এক অস্বস্তি চেপে ধরতে শুরু করেছে তাঁকে। অন্ধকারে কারা যেন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে রকফোর্ডের বিরুদ্ধে।

এঞ্জিন রূম।

সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ার মানুষটা খাটো, চেহারা ছুঁচোর মত। নাম মাইক পটার। তেল-কালি মেখে একাকার পুরানো একজোড়া কভারলস্ পরে আছে সে। মাথায় উলের টুপি। টুপির কিনারা টেনে কানের নিচ পর্যন্ত নামিয়ে রেখেছে পটার। যেন শীত ঠেকাচ্ছে।

যদিও বিন্দুমাত্র ঠাণ্ডা নেই এঞ্জিন রূমে। বরং গরমই লাগছে এখানে। কিন্তু দুটোর একটাও অনুভব করছে না লোকটা। অন্য ধান্ধায় রয়েছে সে, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করার মত বোধ হারিয়ে ফেলেছে সাময়িকভাবে। হাতঘড়িতে চোখ বোলাল মাইক পটার,

বারোটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

ঠিক বারোটায়, ভাবল লোকটা, লোট্টি ও মারাকে নিশ্চল করে দিতে হবে।

তেলতেলে মুখটা নোংরা দুই হাতে ডলল মাইক পটার। মন দিয়ে খানিকক্ষণ এঞ্জিনের আওয়াজ শুনল। তারপর ঘুরে ঘুরে ভালভ আর প্রেশার গজ পরীক্ষার ভান করতে লাগল। ওপাশে একটা কাঠের টুলে বসে টিনের মগে কফি পান করছে চীফ এঞ্জিনিয়ার জ্যাক ফ্লেমিং। হাতে একটা ম্যাগাজিন, উল্টেপাল্টে দেখছে। পটারের দিকে পিছন ফিরে বসা সে।

কভারলসের পকেট থেকে দীর্ঘ, ভারি একটা রেঞ্চ বের করল পটার। হাতে নাচিয়ে জিনিসটার ওজন বুঝে নিল। এই সময় শব্দ করে হেসে উঠল ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ার কিছু একটা পড়ে। এদিক না ফিরেই অনুচ্চ স্বরে বলল কি যেন পটারকে। খেয়াল করল না সে। অন্য ভাবনায় আছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কোটিপতি বনে যাচ্ছে সে, এইসব।

জ্যাক ফ্লেমিঙের বড়সড় মাথার পিছন দিকটা দেখল পটার ভাল করে, কাছে এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তারপর গায়ের জোরে রেঞ্চটা চালাল তার ডান কানের পিছনে খুলি সই করে। গুঙিয়ে উঠল ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আশ্চর্য! পড়ল না, বসে থাকল খাড়া। বরং পটারের কলজের পানি জমিয়ে দিয়ে ঘুরে তাকাল ধীরে ধীরে। চাউনিতে অবিশ্বাস, ঘৃণা, ক্রোধ আরও কী সব যেন।

আঁতকে উঠেই আবার রেঞ্চ হাঁকাল সেকেণ্ড এঞ্জিনিয়ার, এবার তার নাক সই করে। মুহূর্তে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল লোকটার সারা মুখ। কফির মগ, ম্যাগাজিন, দুটোই ছুটে গেল

হাত থেকে। টুল উল্টে গেল, হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল ফ্লেমিং, দু'হাতে মুখ চেপে ধরেছে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে।

'জেসাস গড!' বিড়বিড় করে বলল মাইক পটার। অস্ফুটে ফুঁপিয়ে উঠে শেষবারের মত আঘাত হানল লোকটার মাথার তালু লক্ষ্য করে। খুলি ভাঙার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল সে এবার। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ারের কাতরানি। সেজদার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা। পরমুহূর্তে গড়িয়ে পড়ল লাশ হয়ে।

বারোটার পর এক মিনিট গড়িয়ে গেছে তখন।

পর পর দু'বার মৃদু নক্ করে কেবিনের দরজা খুলে ফেলল পাগান। পুরু গদি মোড়া বিছানায় শুয়ে এদিকেই তাকিয়ে ছিলেন যাত্রীটি, উঠে বসলেন ধড়মড় করে। মনে মনে হাসল পাগান। 'আপনার চা, স্যার।'

'চা!' সামলে নিয়ে বিস্মিত চোখে তাকালেন আরব। 'কই, আমি তো চা চাইনি!'

'ক্যাপ্টেন পাঠিয়েছেন, স্যার,' অত্যন্ত সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল সীম্যান। 'উনি জানতে চেয়েছেন আপনার আর কিছু লাগবে কি না।'

উত্তর দিলেন না শেখ। চেহারা দেখে বোঝা যায় বেশ বিরক্ত হয়েছেন। মাথা দুলিয়ে লোকটাকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। তাই করল পাগান, তবে তার আগে তাঁর ব্রিফকেস তিনটের ওপর নজর বুলিয়ে নিল এক পলক। ওগুলোর হাতল এক করে পুরু স্টেইনলেস স্টীলের চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। চেইনের অন্য প্রান্ত হ্যাণ্ডকাফের মত করে বাঁধা মালিকের বাঁ কব্জিতে।

লোকটা বেরিয়ে যেতে উঠে বসলেন ধনাঢ্য আরব। সামনেই একটা টিপয়ে চায়ের ট্রে রেখে গেছে সে। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিলেন তিনি। ভাবলেন ভালই হলো, তেষ্টায় গলা প্রায় কাঠ হয়ে আছে। মনে মনে ক্যাপ্টেনের প্রশংসা করতে করতে চায়ে চুমুক দিলেন শেখ।

স্বাদটা যেন কেমন লাগল। চিনি নিশ্চই বেশি দিয়ে ফেলেছে ব্যাটারা!

আবার চুমুক দিলেন তিনি। এবং পরমুহূর্তে মনে হলো দেহের সমস্ত রক্ত তীরবেগে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে। পানিতে ভরে উঠল চোখ, সামনের সবকিছু ঝাপসা হয়ে এল। একই সঙ্গে শেখের মনে হলো, ইস্পাতের একজোড়া হাত যেন সর্বশক্তিতে টিপে ধরেছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। ভীষণভাবে দুলে উঠলেন শেখ, লাগল যেন এখনই গ্রেনেডের মত বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছেন তিনি।

দম নিতে পারছেন না, গলা দিয়ে শক্ত আর খুব বেশি গরম কিছু একটা ঠেলে ওপরে উঠে আসছে। উঠে দাঁড়াতে চাইলেন শেখ, কিন্তু পা দুটো যেন আর কোথাও রেখে এসেছেন তিনি, সঙ্গে নেই। বাঙ্কের কিনারা গলে পিছলে ডেকে পড়ে গেলেন আরব, কাপ-ট্রেসহ টি পয়টা অনুসরণ করল তাঁকে।

চিত হয়ে পড়ে মুখ হাঁ করে দম নেয়ার জন্যে সংগ্রাম শুরু করেছেন বৃদ্ধ শেখ। এর মধ্যেও দুটো বিষয় তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করলেন।

এক. তিনি মারা যাচ্ছেন।

এবং দুই. পিঠের নিচের দুলুনি হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে গেছে। এঞ্জিনের আওয়াজ নেই। কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে চারদিকের পরিবেশে।

হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়াল হতে ভুরু কোঁচকালেন ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। ব্যাটা, হারামজাদা! এক কাপ চা করে আনতে এত সময় লাগে? গ্যালির দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি, পরক্ষণে জায়গায় জমে গেলেন।

এঞ্জিন থেমে গেছে। সেই সঙ্গে থেমে গেছে ক্যাপ্টেনের রক্ত চলাচল। নিশ্চই মারাত্মক কোন ত্রুটি দেখা দিয়েছে এঞ্জিনে, যা আরও অনেক আগেই ঘটার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন রকফোর্ড। ব্যস্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন তিনি, আবারও থেমে পড়তে হলো। চোখ কপালে তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন।

লোট্টি ও মারার শ'খানেক গজ সামনে ধীরে ধীরে আকার লাভ করছে সাদা রঙের একটা ইয়ট, আঁধার ফুঁড়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। ওটাতেও কোন আলো জ্বলছে না। রকফোর্ডের মনে হলো পানি ফুঁড়ে আচমকা উদয় হওয়া জাহাজটায় নিঃসন্দেহে কেউ নেই। ওটা নিশ্চই ভৌতিক কিছু হবে।

দৃষ্টি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে দেখতে থাকলেন ক্যাপ্টেন। কোন ফ্ল্যাগ নেই ওটায়, নেই-কোন আইডেন্টিফাইং সাইন। বো-তে কোন নাম নেই, প্রাণেরও কোন চিহ্ন নেই ডেকে। এর মানে কি?

ওটাকে একটা ষাট ফুটি ডিজেল ইয়ট বলে মনে হলো রকফোর্ডের। মনে হলো, নিশ্চিত নন তিনি। সার্চ লাইট জ্বেলে যে দেখবেন, তাও সম্ভব নয়। আরও অন্তত দু'ঘণ্টা নিজেকে লুকিয়ে রেখেই এগোতে চান তিনি। কি ওটা? চট করে আকাশের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে যদি মেঘ সরিয়ে

চাঁদটা উঁকি দিত! আচমকা একটা ঝাঁকি খেয়ে সিধে হলেন রকফোর্ড।

কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠল, সাবধান, রকফোর্ড! সামনে বিপদ!

এক দৌড়ে ব্রিজে গিয়ে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। ঝটকা মেরে গান কেবিনেটের পাল্লা খুলে ফেললেন। ভেতরে সাজানো রয়েছে দশটা পিস্তল, ছয়টা সেমি অটোমেটিক রাইফেল। একটা রাইফেল নিলেন তিনি। কাজের ফাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে রহস্যময় জলযানটার দিকে তাকালেন এক পলক।

একটু একটু করে এগিয়েই আসছে ওটা। থামার বা লোট্টি ও মারার পথ থেকে সরে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। যেন দুটোর সংঘর্ষ না ঘটা পর্যন্ত থামবে না পণ করেছে ওটা। বিপদ সঙ্কেত বাজিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন রকফোর্ড। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডেকে দুদ্দাড় কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল, দৌড়ে আসছে লোট্টি ও মারার ক্রুরা।

তাদের কয়েকজন সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছে, পরনে লম্বা থার্মাল আন্ডারওয়্যার ছাড়া আর কিছু নেই। সবার হাতে অস্ত্র-গুলি তুলে দিলেন রকফোর্ড। নির্দেশ দিলেন, তাঁর সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। তারপর রেলিঙের কাছে গিয়ে আবার নজর দিলেন সাদা ইয়টটার গতিবিধির দিকে। অনেক কাছে এসে পড়েছে ওটা।

সত্তর গজ!

ষাট!

ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে হয়তো, ভাবলেন একবার তিনি। হয়তো অনভিজ্ঞ কোন ট্যুরিস্ট জাহাজ চালনা শেখার চেষ্টা করছে। অথবা···নিজেকে চোখ রাঙালেন ক্যাপ্টেন,

কী সব আবোল তাবোল ভাবছেন তিনি? ওটা নিশ্চই কোন···নিশ্চই কোন··· ।

আরও কাছে এসে পড়েছে ইয়টটা ।

পঞ্চাশ গজ···

চল্লিশ···

হঠাৎ মনে হলো, ওটা মেরি সেলেস্টি নয় তো? সেই রহস্যময় প্রাণের স্পন্দনহীন জাহাজ, যে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের মৃত নাবিকদের কঙ্কাল? হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয় যেখানে-সেখানে? আবার গায়েব হয়ে যায় চোখের পলকে? অনেকেই তো দেখেছে মেরি সেলেস্টিকে, সেটাই নয় তো? অসংখ্য সাগর-রহস্যের মধ্যে যাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে পৃথিবী?

পঁচিশ গজ!

বিশ!

বাঁ হাতটা নিঃশব্দে শূন্যে তুললেন ক্যাপ্টেন রকফোর্ড । গুলি চালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই । অনেক গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন কুয়েতের ব্রিটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি, তা পালন করতেই হবে । তাতে যদি প্রাণও যায়, তাও সই । হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ক্যাপ্টেনের । ওই লোকের ব্রিফকেস তিনটে লুট করার···এঞ্জিনের হলো কি?

সঙ্কেত পুরো করার সময় পেলেন না ক্যাপ্টেন, ইয়ট থেকে নীলচে সাদা আলোর মোটা একটা স্তম্ভ ছুটে এসে আছড়ে পড়ল লোঞ্চির ওপর । দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক । চোখ ঝলসে গেল, চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রকফোর্ড । পরমুহূর্তে একটা মোটা গলার দুর্বোধ্য কমাণ্ড ভেসে এল ইয়ট থেকে । ওটা কোন ভাষা ধরতে পারলেন না তিনি ।

পনেরো গজ!

দশ গজ!

আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে । অস্ত্র বিশারদ নন ক্যাপ্টেন, তবু বেশ টের পেলেন পিস্তল আর রাইফেলই নয়, আরও ভারি কিছু ব্যবহার করছে ও পক্ষ । রকেট লঞ্চার সম্ভবত । এবং সেই সঙ্গে হ্যাণ্ড গ্রেনেডও । ডজন ডজন গান মাজলের বিরতিহীন ঝলকে আলো আরও জোরাল হলো, রণক্ষেত্রে পরিণত হলো সাগর ।

ব্রিজের কাঁচ, কাঠের প্যানেলিং চুরমার হয়ে বোলতার গুঞ্জন তুলে বিদ্যুৎগতিতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে । মর্টারের ক্রমাগত আঘাতে লোঞ্চি ও মারার পুরানো খোল তুবড়ে-বেঁকে একাকার হয়ে গেল । বড় বড় ছিদ্র হয়ে প্রায় চালুনির রূপ পেয়েছে পোর্ট সাইডের খোল আর বাল্কহেড ।

ডেকে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড । মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে চলছে শত্রুর গুলিবর্ষণ, কোনদিন থামবে বলে ভরসা হয় না । মাথার ওপর দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছে কাঁচ-কাঠের টুকরো, আরও কি কি ঈশ্বরই জানেন । আচমকা গোলাগুলি শুরুর মুহূর্তে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়া ক্রুদের যারা এখনও মরেনি, তাদের গোঙানি আর আর্ত চিৎকারে ভারি হয়ে উঠেছে করডাইটের গন্ধ মাখা প্রায় স্থির বাতাস । বেশিরভাগই মারা গেছে তারা ।

একটা কাঁচের টুকরো ছিটকে এসে আঘাত করল ক্যাপ্টেনের কপালে । জায়গাটা কেটে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে নামতে শুরু করেছে, কিন্তু খেয়াল নেই তাঁর । তিনি যাত্রীটির কথা ভাবছেন । নিশ্চই ওই লোকটির জন্যেই আক্রান্ত হয়েছে লোঞ্চি ও মারা । নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে এর? এত বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর, এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা নিজের জাহাজকে কেন্দ্র করে

ঘটতে পারে, কল্পনাও করেননি কখনও।

ক্রাইস্ট ইন হেভেন! যাত্রীটিকে এ সময় সাহায্য করা রকফোর্ডের পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু নিজেই মাথা তুলতে পারছেন না, অন্যকে কি ছাই সাহায্য করবেন তিনি? তবু, এত কিছুর মধ্যেও স্বাভাবিক দায়িত্ব ও বিবেচনা বোধ হারাননি ক্যাপ্টেন। সিদ্ধান্ত নিলেন ক্রল করে অ্যামিডশিপে যাবেন, শত্রুর চোখ বাঁচিয়ে ভদ্রলোককে লাইফবোর্ডে তুলে দিয়ে সরে পড়তে সাহায্য করবেন।

সময় যেন নির্ধারণ করাই ছিল, এক যোগে থেমে গেল শত্রুর সবগুলো অস্ত্র। অকস্মাৎ নীরবতা পাথরের মত চেপে বসল পরিবেশের ওপর।

মুখটা সামান্য তুললেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড, পিট্‌পিট্ করে তাকালেন আলোর আড়াআড়ি স্তম্ভটার দিকে। আগে তবু অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাচ্ছিলেন ইয়টটাকে, এখন পারছেন না। আলোর পিছনে সব অন্ধকার। উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলেন ক্যাপ্টেন তবু, যদি কাউকে দেখা যায়! নাহ্! কিছুই দেখা যায় না।

রাইফেলটা শিথিল মুঠোয় ধরে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন হাঁটুতে ভর দিয়ে। আশেপাশে হাত পা ছড়িয়ে নানান ভঙ্গিতে পড়ে আছে অনেকগুলো লাশ। বেদনায় বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কোন অপরাধ ছিল না মানুষগুলোর। তবু মরতে হলো। পৃথিবীতে বাড়ল আরও কিছু পিতৃহারা, বিধবার সংখ্যা। একটা কি দুটো দেহ এখনও মৃদু মৃদু নড়ছে ওর মধ্যে। উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন।

এখনও মরেনি ওরা। তবে মরবে। দুনিয়ার সর্বাধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রও লোকগুলোর কোন উপকারে আসবে না। প্রচণ্ড আক্রোশে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ক্ষমতা নেই,

থাকলে এই মুহূর্তে চরম প্রতিশোধ নিতেন। দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন ওই সাদা ইয়ট এবং তার দয়ামায়াহীন খুনী আরোহীদের।

তবে কিছু তো এখনও করতে পারেন তিনি। গুলি বর্ষণ থেমে গেছে বলে যে রকফোর্ড বেঁচে গেছেন, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। যে কোন মুহূর্তে লোট্টি ও মারার গায়ে ভিড়বে ইয়ট, খুনীর দল উঠে আসবে এটায়। কাজেই বসে বসে মরি কেন? তার আগে যে ক'টাকে পারা যায়···ভাবতে ভাবতে সেমি অটোমেটিকটা তুলে কাঁধে ঠেকালেন।

ট্রিগার টানতে যাবেন, এই সময় শক্ত কি যেন ঠেকল মাথার পিছনে। গুঁতো খেয়ে টলে উঠলেন তিনি, বাধ্য হলেন এক পা এগিয়ে যেতে। সামলে নিয়ে ঘুরে তাকালেন রকফোর্ড। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সীম্যান পাগান। দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। ভয়ঙ্করদর্শন একটা রিভলভার শোভা পাচ্ছে তার হাতে।

'তুমি!'

হাসিটা আরও প্রসারিত হলো পাগানের। 'আই, ক্যাপ্টেন।' হাত বাড়াল সে, 'দিন, আপনার বোঝাটা আমাকে দিন।'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে দেখলেন রকফোর্ড। দাঁতে দাঁত চেপে হিস্ হিস্ করে বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক!'

'তা আর বলতে?' ছিনিয়ে নিল পাগান রাইফেলটা।

'শয়তান! দু'মুখো সাপ!'

'একদম ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন।'

চুপ মেরে গেলেন ফ্র্যাঙ্ক রকফোর্ড। পাগানকে হাতের অস্ত্র তুলতে দেখে নিজেকে শক্ত করে নিলেন। 'শেষ প্রার্থনা করার জন্যে কিছু সময় দাও আমাকে।'

'কিছু কেন? জায়গামত পৌঁছে যত খুশি নিন না, কে নিষেধ

করতে যাবে?'

আহত এক নাবিক মরণ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। পরক্ষণেই ট্রিগার টেনে দিল পাগান। মাথার খুলি প্রায় পুরোটাই উড়ে গেল তাঁর। প্রথম কাজ সেরে দ্রুতপায়ে শেখের কেবিনে এসে ঢুকল পাগান। ডেকে বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে পড়ে আছেন শেখ। চোখ দুটো টকটকে লাল, বিস্ফারিত। যেন এখনই লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে।

ব্যথা সহ্য করার ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা। এক হাতে গলা চেপে ধরেছিলেন শেখ মৃত্যুর আগে, ওভাবেই আছেন। রক্ত জমে জবাফুলের মত হয়ে আছে মুখটা। চোখ সরিয়ে ব্রিফকেস তিনটের ওপর নজর দিল পাগান। হিপ পকেটে রাখা একটা পাউচ থেকে দীর্ঘ, সরু ব্লেডের একটা ছুরি বের করে হাঁটু মুড়ে বসল লাশের পাশে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্টেইনলেস স্টীলের বাঁধন খুলতে।

ঝাড়া দশ মিনিট খোঁচাখুঁচির পর কুট্ শব্দে খুলে গেল চেইনের বিল্ট ইন তালা। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল পাগান। রুমাল বের করে ঘাড়ের, মুখের ঘাম মুছল। দু'হাতে বোঝাগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসবে, এই সময় বাইরে পায়ের শব্দ উঠল। কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠল তাকে।

'আমি এখানে!' হাঁক ছাড়ল পাগান।

দোরগোড়ায় হাজির হলো খাটোমত এক লোক। গাট্টাগোট্টা, পেশীবহুল দেহ। 'পেয়েছ?'

'জ্বি,' অত্যন্ত সমীহের সঙ্গে উত্তর দিল পাগান। 'এই যে।'

ব্রিফকেসগুলো দেখল লোকটা। তারপর লাশটার দিকে তাকাল এক পলক। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মুখে। 'গুড! ভেরি গুড!' কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিস্তল তুলল লোকটা। বুকের বাঁ দিকে

তিন তিনটে ফুটো নিয়ে মৃত শেখের ওপর পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল বিস্মিত, হতবাক পাগান।

দুই

পয়েন্ট থ্রী এইট ওয়ালথার পি.পি.কে-র বিরতিহীন বিস্ফোরণের আওয়াজে কাঁপছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড শূটিং গ্যালারি। টেক্সচারড্ দেয়াল শুষে নিচ্ছে আওয়াজ, ফলে প্রতিধ্বনি উঠছে না, তবে হালকা ধোঁয়া ও করডাইটের গন্ধে একটু একটু করে ভারি হয়ে উঠছে বদ্ধ রুমটার পরিবেশ। পুরো এক ক্লিপ গুলি শেষ করে থামল মাসুদ রানা। ইয়ার প্রটেক্টর নামিয়ে ওপরে তাকাল। চার দেয়ালের চারটে বড় এগজস্ট ফ্যান টেনে বের করে দিচ্ছে কটুগন্ধি ধোঁয়া।

মাসুদ রানা যেখানে দাঁড়িয়ে, গ্যালারির সে অংশ পুরোপুরি অন্ধকার। ও প্রান্তে, যেখানে ওর টার্গেট, সেখানে আছে আলো। তবে এতই অল্প যে থাকা না থাকা দুইই সমান। জুতোর আওয়াজ শুনে সামনে তাকাল মাসুদ রানা। এগিয়ে আসছে বি.সি.আই-এর টেকো ইনস্ট্রাক্টর। আবছা আলোয় লোকটার মুখে হাসি দেখতে পেল ও। দু'হাতে হার্ডবোর্ডের তৈরি দুটো মানব-টার্গেটের কাঠামো ধরে আছে ইনস্ট্রাক্টর।

'অবিশ্বাস্য!' রানার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। হাসি আগের থেকে চওড়া হল আরও। 'এবারও হারিয়ে দিয়েছেন আপনি আমাকে। তবে আমি এখনও বেঁচে আছি, হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছি, আর আপনি মরে গেছেন। এই যা সান্ত্বনা।'

মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। কোন মন্তব্য না করে

পিছিয়ে এল ও, একটা ডেস্কের পাশে দাঁড়াল। হুড পরানো একটা টেবিল ল্যাম্প আছে ওটার ওপর, জ্বেলে দিল সেটা। টার্গেট দুটো ডেস্কের ওপর শুইয়ে দিল টেকো। 'এই দেখুন,' বলল সে। 'কিভাবে নিজের কলজে নিজে ছেঁদা করেছেন আপনি।'

দেখল মাসুদ রানা। ওর নিজের টার্গেটের বুকের বাঁ দিকটা, যেখানে কালো রঙে হার্ট আঁকা ছিল, প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে জায়গাটা চালনির মত। 'হার্ট তো গেছেই, স্টমাকের বাঁ দিকটাও খতম।' টাক চুলকাল ইনস্ট্রাক্টর। 'আমি তত ভাল করতে পারিনি।' নিজের টার্গেট দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'হার্টে, স্টমাকে লাগাতে পেরেছি ঠিকই, তবে আপনার মত পারিনি। একটু দূরে দূরে লেগেছে।'

মুখ তুলল রানা টার্গেট থেকে। চোখে প্রশ্ন। দ্রুত মাথা দোলাল ইনস্ট্রাক্টর। 'ভাল। খুব ভাল করেছেন আপনি।'

ওয়ালথার হোলস্টারে পুরল মাসুদ রানা। 'চলি, কাল দেখা হবে আবার।'

'নিশ্চই, নিশ্চই!' ওর সঙ্গে বেজমেন্ট গ্যালারির সাউণ্ডপ্রুফ দরজা পর্যন্ত এল লোকটা। 'সম্ভব হলে কাল আরেকটু তাড়াতাড়ি আসবেন, রানা সাহেব। আরেকটু বেশি সময় দিলে ভাল হয়। আজকাল তো আপনার দেখা পাওয়াই মুশকিল।'

ঘুরে হ্যাণ্ডশেক করল রানা ইনস্ট্রাক্টরের সঙ্গে। 'চেষ্টা করব। স্লামালেকুম।'

'ওয়ালেকুম আসসালাম।' মাসুদ রানার প্রশস্ত পিঠে চোখ রেখে হাসিমুখে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। পুরো সত্যি কথা বলেনি সে রানাকে, চেপে গেছে। খুব ভালই নয় কেবল, সবচেয়ে ভাল ফল করেছে রানা টার্গেট প্র্যাকটিসে। বেশ অনেক দিন পর গ্যালারিতে এলেও আগের মতই নির্ভুল, অব্যর্থ-লক্ষ্য আছে মাসুদ

রানা। বরাবর যেমন ছিল। কিন্তু সে কথা ওকে বলা যাবে না। নিয়ম নেই। এ সব জানবেন কেবল বি.সি.আই কর্ণধার, মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। আর কেউ নয়। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে মাসুদ রানার স্কোর রেকর্ড ফাইল বের করল টেকো। ওর আজকের স্কোর তুলে রাখতে হবে।

একই জিনিস নির্ধারিত ফর্মে লিখে পৌঁছে দিতে হবে রেকর্ড সেকশনে। রাহাত খানের টেবিল ঘুরে দুপুরের আগেই জায়গামত পৌঁছে যাবে তার রিপোর্ট। কাজ শেষ করে ফাইলটা ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দিল ইনস্ট্রাক্টর। বেজমেন্ট থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের লিফট প্যাসেজে পৌঁছল মাসুদ রানা। ব্যস্ততম মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার এক দশ তলা ভবন এটা। এরই নয় তলার পুরোটা নিয়ে রয়েছে ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানি ওরফে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিস। মোট চারটে লিফট আছে এ বিল্ডিঙে। তার একটার মাথায় ঝুলছে একটা নোটিসগুণ রিজার্ভড ফর ন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সি।

মৃদু শিস তুলে খুলে গেল লিফটের দরজা। ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। ওর গায়ে করডাইটের গন্ধ পেয়ে কুঁচকে উঠল লিফটম্যানের নাক। তবে এতে সে অভ্যস্ত। বেজমেন্ট থেকে সরাসরি যারা এসে লিফটে ওঠে, তাদের সবার গায়ে এ গন্ধ থাকে, জানে সে। দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে লিফটের পিছন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ডান তর্জনী ঘুরিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটার মাথা টিপছে ঘন ঘন। ব্যথা করছে আঙুলটা। কম নয়, পুরো পাঁচটা ক্লিপ শেষ করিয়েছে টেকো আজ ওকে দিয়ে। অনেক দিন পর গ্যালারিতে যাওয়ার শাস্তি।

ফলাফল সম্পর্কে টেকোর মন্তব্যে মাসুদ রানা সন্তুষ্ট। কিন্তু তা নিয়ে অহঙ্কার নেই ওর মনে। তবে গ্যালারির আলো আরেকটু

বেশি হলে ফলাফল হয়তো আরও ভাল হত, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু রাহাত খানের তাতে ঘোর আপত্তি। তাঁর ধারণা, পরিষ্কার আলোয় টার্গেট ভেদ করা কোন কাজের কাজ নয়। কাজের কাজ হচ্ছে অন্ধকারে সফল হওয়া। কাজেই সেভাবেই চলে বি.সি.আই-এর শূটিং গ্যালারি।

নয় তলায় পা রেখেই মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল মাসুদ রানার। গত দু'মাস ধরে ডেস্ক ওয়ার্ক করতে করতে যাযাবর মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে ওর। নিয়মিত নয়টা-পাঁচটা ফাইলের মধ্যে লাঙল চষা অসহ্য হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি যদি এই রুটিন থেকে মুক্তি না জোটে, দম বন্ধ হয়ে মরেই যাবে মাসুদ রানা। মাঝেমধ্যে ভাবে ও, এখনই এই অবস্থা! কয়েক বছর পর যখন ফিল্ড থেকে অবসর নিতে হবে, বাধ্যতামূলক অফিস ডিউটিতে যোগ দিতে হবে, তখন কি হবে?

নিজের অফিস রূমে ঢুকল মাসুদ রানা। ঢুকতেই ডান পাশে সুন্দর সাজানো-গোছানো ফ্রন্ট অফিস। রানার সুন্দরী ব্যক্তিগত সচিবের অফিস। ওকে দেখে মধুর হাসি উপহার দিল মেয়েটি। পরক্ষণেই হোঁচট খেলো তার হাসি, মাধুর্য দশ ডিগ্রী নেমে গেল। 'দাঁড়াও দাঁড়াও! কোটটা খুলতে দাও,' এগিয়ে এল সে সারা অঙ্গে ঢেউ তুলে। 'কি বিচ্ছিরি গন্ধ! এ মা!'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝোলানো দেখল তার মাসুদ রানা। 'কোন জরুরী খবর-টবর আছে আজ?'

মাথা দোলাল মেয়েটি হতাশ চেহারা করে। 'নেই। তবে ফাইল আছে একগাদা, রেখে এসেছি সব তোমার টেবিলে।'

'যন্ত্রণা!' গজ গজ করে উঠল মাসুদ রানা। পা বাড়াল নিজের রূমের দিকে। 'চাকরি এবার ছেড়েই দিতে হবে দেখছি!'

'কফি?' হাসি চাপল মেয়েটি।

'হ্যাঁ, দাও।'

নিজের ডেস্কে এসে বসল মাসুদ রানা। বাঁ দিকে পাহাড় হয়ে আছে বাদামী ফোল্ডারের। প্রত্যেকটির ওপরে আঁকা লাল জাতীয় প্রতীক। নিচে লেখাগু টপ সিক্রেট। বিরক্ত চেহারায় ওপরের ফোল্ডারটা খুলল রানা। একটা ডানহিল ধরিয়ে মন দিল ওতে। প্রথমেই বড়সড় একটা ডিটেইলড ম্যাপের ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার, দক্ষিণ পোল্যাণ্ড ও উত্তর-পুব জার্মানির। ওয়ারশ ও বার্লিনের মধ্যেকার একটা রুট লাল কালি দিয়ে আঁকা আছে ম্যাপটায়। তার ওপর লেখাগু মেইনলাইনগু ওয়েল এস্টাবলিশড্ এস্কেপ রুট ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট।

ম্যাপের সঙ্গে স্ট্যাপল করা আছে একটা টাইপ করা মেমোরেণ্ডাম। তার শুরুতেই লেখা 'ফর ইনফরমেশন ওনলি'। দ্রুত মেমোরেণ্ডামে চোখ বুলিয়ে গেল মাসুদ রানা। ওটা শেষ হওয়ার আগে অ্যাশট্রেতে চারটা ফিল্টার টিপ জমা হলো। ইনফরমেশনগুলো গলাধঃকরণ করে পরবর্তী ফাইল টেনে নিল রানা। ন্যাটোর রেডিও ইন্টেলিজেন্স ডিভিশনের 'রেডিও সিগনেচার' বিষয়ক ফাইল এটা, কপালে যথারীতি জ্বলজ্বল করছে 'ফর ইনফরমেশন ওনলি'।

চার আঙুল দিয়ে নিজের কপালে একটা চাঁটি মারল মাসুদ রানা। 'হায় খোদা! আর কত ইনফরমেশন হজম করতে হবে? এইসব ছাইপাঁশ...' থেমে পড়ল ও টেলিফোনের মৃদু কির কির আওয়াজ শুনে। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা। ওর ডেস্কে তিনটে টেলিফোন সেট, তিন রঙের। কালোটা বাইরের জন্যে, সাদাটা ভেতরের। এবং শেষের লাল রঙেরটা সরাসরি রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। স্ক্র্যাম্বলার সংযুক্ত। ওটাই বাজছে।

রিসিভার লক্ষ্য করে থাবা চালাল মাসুদ রানা। 'ইয়েস!'

'তুমি কি ব্যস্ত?' ওপ্রান্ত থেকে প্রশ্ন করল মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের পি.এ. মেয়েটি।

'একশোবার! রোজ এত এত ইনফর্মেশন পাঠাচ্ছ, ওগুলো মুখস্থ করতে হয় না?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

ওপ্রান্তে সুরেলা হাসির আওয়াজ উঠল।

'বোকার মত হি হি কোরো না তো! মুডটা নষ্ট করে দিয়ো না। কি প্রয়োজনে ফোন করেছ অধমকে, জানিয়ে কৃতার্থ করো। তাড়াতাড়ি!'

'মনে হয় অবশেষে শিঁকে ছিঁড়ল তোমার ভাগ্যে।'

'মানে? ডাক পড়েছে?'

'হ্যাঁ। বিশেষ ব্যস্ততা না থাকলে চেম্বারে আসতে বলেছেন বস্।'

কিছুটা হতাশ হলো মাসুদ রানা। শুনে মনে হচ্ছে তেমন বিশেষ কিছু নয়। আবার অকাজে, কেবল খোশগল্প করতে ওকে ডেকেছেন বৃদ্ধ, তা-ও নিশ্চয়ই নয়। কি হতে পারে? 'আমি আসছি।' রিসিভার রেখে দিল মাসুদ রানা। ফোল্ডার বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল।

ও যখন রূমে ঢুকল, রাহাত খান তখন পাইপ ধরাবার কাজে ব্যস্ত। ওরই ফাঁকে চোখ তুলে রানাকে দেখলেন, জ্বলন্ত লাইটার ধরা হাতের আবছা ইঙ্গিতে বসতে বললেন ওকে। নির্দেশটা নীরবে পালন করল মাসুদ রানা। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে দেখলেন বৃদ্ধ, 'ঠুক্' শব্দে লাইটারটা রাখলেন গ্লাসটপ্ ডেস্কের ওপর।

'তারপর? কেমন চলছে তোমার, মাসুদ রানা?'

বিস্মিত হলো রানা খানিকটা। রাহাত খানের মুখে শুধু 'রানা' শুনেই অভ্যস্ত ও, পুরোটা নয়। এ ধরনের ব্যাপার মাঝেমধ্যে ঘটে

অবশ্য, যখন ভেতরে ভেতরে কোন বিষয় নিয়ে খুব বিচলিত থাকেন রাহাত খান, উদ্বিগ্ন থাকেন, কি করতে হবে ভেবে না পান, তখন। তা-ও খুবই কম। 'কোনরকম, স্যার। রুটিন ওয়ার্ক করতে করতে হাঁপ ধরে গেছে।'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'একঘেয়ে কাজ, বিরক্তি লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু কি আর করা, ওটাও তো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!'

ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল ও, 'জ্বি, স্যার।'

নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। টানা ভুলে পাইপের বাউল পরীক্ষা করতে লাগলেন রাহাত খান মন দিয়ে। নিচের রাজপথ থেকে গাড়িঘোড়ার ছোটাছুটি, রিকশার বেল, হকারদের হাঁকডাক ভেসে আসছে। জানালা ঘেঁষে ফড় ফড় ডানার আওয়াজ তুলে উড়ে গেল একটা কাক। ধারেকাছেই কোথাও পটকা ফোটার বিকট আওয়াজ উঠল একটা।

সামনের বহু পোড়খাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল মাসুদ রানা। কি হতে পারে ব্যাপারটা? কেন ডেকেছেন ওকে বৃদ্ধ? অফিশিয়াল কিছু যে নয়, সে ব্যাপারে রানা একশো ভাগ নিশ্চিত। হলে এতক্ষণে অবশ্যই শুরু করে দিতেন রাহাত খান। তার মানে কি ব্যক্তিগত কিছু? কোন ব্যক্তিগত সমস্যায় পড়েছেন বৃদ্ধ? বা তাঁর কোন ঘনিষ্ঠজন? হঠাৎ মনে হলো রানার, বিব্রত বোধ করছেন রাহাত খান। বোধহয় ভেবে পাচ্ছেন না কি ভাবে শুরু করবেন, বা কোত্থেকে শুরু করবেন। ইচ্ছে হলো বৃদ্ধকে সাহায্য করে ও এ ব্যাপারে। কিন্তু বিষয়টা কি নিয়ে, তাই তো ছাই জানে না রানা। যদি বোঝা যেত···বৃদ্ধের খুক্ খুক্ কাশির শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। বৃদ্ধের অন্যমনস্কতার সুযোগে নিভে গেছে পাইপ কখন যেন।

আবার ওটা ধরিয়ে নিলেন তিনি। 'হাতে তাহলে তেমন কোন কাজ নেই তোমার, তাই না?'

'না, স্যার,' সুযোগটা লুফে নিল মাসুদ রানা। 'তেমন কোন কাজ নেই। কোন সমস্যা হয়ে থাকলে···।' লাইনটা ধরিয়ে দিয়ে থেমে গেল ও। কাজ হলো। রানা জানত হবে। গলতে শুরু করল বরফ।

'হ্যাঁ, কঠিন একটা সমস্যায় পড়েছি, রানা। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অফিশিয়াল কিছু নয়। ভাবলাম, তুমি সাহায্য করলে এর একটা সুরাহা হয়।'

'নিশ্চই, স্যার। বলুন, সমস্যাটা কি?'

রাহাত খানের চেহারা দেখে মনে হলো যেন সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন। অফিসের কাউকে কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিলে এমনিই হয় তাঁর চেহারা। কঠোর নীতি পরায়ণ বৃদ্ধ মনে করেন এসব তাঁর অনধিকার চর্চা। নিতান্ত দায় না ঠেকলে এ কাজ করেন না রাহাত খান। কিছু সময় এক মনে পাইপ টানলেন তিনি, তারপর মুখ খুললেন। 'ইরাকের কুয়েত অভিযানের সপ্তাখানেক আগে এক রাতে, পারস্য উপসাগরে এক কুয়েতি ধনকুবের শেখকে খুবই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। জানো কিছু এ ব্যাপারে?'

'ঘটনাটা মনে হয় শুনেছিলাম, স্যার,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তবে বিস্তারিত জানি না।'

আনমনা হয়ে পড়লেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক, রানা। নিহত শেখ জাবের আল উবায়েদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন। কুয়েতি সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ছিলেন তিনি। একসঙ্গে ব্রিটেনের রয়্যাল মিলিটারি

অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিয়েছি আমরা। শুধু ট্রেনিংই নয়, অ্যাকাডেমির হোস্টেলে একই রুমে থেকেছি দু'জন। মৃত্যুর সময় অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন উবায়েদ। আত্মীয় বলতে ছিল কেবল এক নাতনী, নিউ ইয়র্কে পড়াশুনা করে মেয়েটি। নাম নাদিরা। এ ছাড়া ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না উবায়েদের। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন ভদ্রলোক।'

'তারপর?'

'অদ্ভুত এক শখ ছিল ভদ্রলোকের। দুনিয়ার যেখানে যত মূল্যবান হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তার নিলাম হত, সেখানেই গিয়ে হাজির হতেন তিনি। সর্বোচ্চ দর হেঁকে কিনে নিয়ে আসতেন সব। দামী দামী অলঙ্কারও কিনতেন। অল্প বয়স থেকেই এ শখ এক-আধটু ছিল উবায়েদের, পরে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসা ইত্যাদির মালিক বনে যেতে তা আরও বেড়ে যায়। ব্যাপারটা এক সময় ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়ায় উবায়েদের। তাঁর স্ত্রীকে অনেকেই আক্ষেপ করে বলতে শুনেছে, উবায়েদ আমার থেকে তার রত্ন ভাণ্ডারকে বেশি ভালবাসে। আসল কথা তাঁর দিন-রাতের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ওগুলো। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন তিনি ওর পিছনে। এ বিষয়ে উবায়েদ ছিলেন পৃথিবীর সেরা।'

হঠাৎ পাইপের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন রাহাত খান। কাঁচের অ্যাশট্রেতে ঠুকে ঠুকে ফেলে দিলেন পোড়া তামাকটুকু। ওটা মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

'এরপর, ইরাক কুয়েত আক্রমণ করতে যাচ্ছে শুনে ঘাবড়ে যান উবায়েদ। সে সময়ে ব্রিটিশ এমবাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন উইলিয়াম ড্র্যাক্স, তার মুখেই এ সম্ভাবনার কথা জানতে পারেন তিনি। শুনে ভীষণ ঘাবড়ে যান উবায়েদ। দিশে না পেয়ে

তাকেই ধরে বসেন নিজেকে এবং তার ভাণ্ডার রক্ষা করার একটা উপায় বের করে দিতে। ওই সময় কুয়েতের বন্দরে একটা ব্রিটিশ ফ্রেইটার ছিল। উপায় না দেখে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ওতেই উবায়েদকে তুলে দেন ড্র্যাক্স, তাঁর কালেকশনসহ। ইরাকী আগ্রাসনের ছয়দিন আগে সেই ফ্রেইটার, লোড্রি ও মারা ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে কুয়েত ত্যাগ করে। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত কোন খবর ছিল না জাহাজটার।

'যা হোক, পরে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমেরিকান এক গানশীপ জাহাজটিকে উদ্ধার করে টেনে নিয়ে যায় সৌদী আরবে। পরিত্যক্ত অবস্থায় ভাসছিল ওটা ওমান উপসাগরে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'ঘটনাটা পড়েছিলাম পত্রিকায়।'

'উবায়েদকে তাঁর কেবিনে মৃত পাওয়া যায়। জাহাজের অন্যরা, ক্যাপ্টেন থেকে সাধারণ ডেকহ্যান্ড পর্যন্ত সবাইকে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। মৃতদেহগুলো পচে গলে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তবু সৌদী সরকার ওগুলোর ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করে। জানা যায়, বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে উবায়েদকে। আর, বাদবাকিদের কথা তো আগেই বললাম। বড় তিনটে অ্যাটাশে ছিল উবায়েদের সঙ্গে, তাঁর কালেকশন বোঝাই।'

'নিশ্চই পাওয়া যায়নি ওগুলো?'

'ঠিক তাই। যুদ্ধের উত্তেজনায় কিছুদিন চাপা পড়ে ছিল ব্যাপারটা। পরে ঘটনার তদন্তভার ইন্টারপোলের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি ওরা। এগোবার মত সূত্র ছিল না। ছয় মাসের মধ্যে কেস ড্রপ্ করে ওরা। দু'বছরের বেশি চাপা পড়ে ছিল ব্যাপারটা, সবাই প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু···উবায়েদের একমাত্র নাতনী, নাদিরা, নিউ ইয়র্কে পড়াশুনা

করে বলেছি, মাস দেড়েক আগে ওখানকার বড় এক অলঙ্কার বিক্রেতার দোকানে মেয়েটি নানার খুব মূল্যবান কয়েক সেট অলঙ্কার দেখতে পেয়েছে। ওদের শো-কেসে সাজানো।'

বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'ওগুলো চিনল কি করে নাদিরা?'

'নিজের প্রতিটি সংগ্রহের পিছনে বিশেষ এক ধরনের কালি দিয়ে সীল মারা আছে উবায়েদের।'

'সে কি! এখনও সে সীল রেখে দেয়া হয়েছে?'

'ঠিক সীল না। সীল যেখানে যেখানে ছিল, সে সব জায়গায় হালকা ঘষার দাগ আছে। ওই দাগ দেখে চিনেছে সে। তুলে ফেলেছে ওরা সীলের চিহ্ন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে। 'কোন ভুল হয়নি তো নাদিরার?'

না। নানার প্রায় প্রত্যেকটি সংগ্রহ চেনা আছে তার। এ বিষয়ে নানার মত বাতিক না থাকলেও আগ্রহ আছে নাদিরার। শুনে অবশ্য প্রথমে আমারও সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু গোপনে খোঁজ নিয়েছি আমি। প্রমাণ পেয়েছি ওর দাবি সঠিক।'

'দোকানটার মালিক কে?'

'ওখানকার খুব প্রভাবশালী এক মাফিয়া ডনের ছেলে, রবার্টো গার্সিয়ার।'

চিন্তিত মুখে থুতনি ঘষল মাসুদ রানা। 'মাফিয়া এমন কাঁচা কাজ করবে কেন? নিজেদেরই যখন অলঙ্কার বিক্রির ব্যবসা, নিশ্চই ওসব তৈরিও করে ওরা। তাহলে লুটের মাল, বিশেষ করে অলঙ্কারগুলো ভেঙে সহজেই তো নতুন করে তৈরি করতে পারে। ঘষাঘষির কি প্রয়োজন? যে কোন সময় সন্দেহ···'

'ব্যাপারটা আসলে সেরকম নয়, রানা। সীলগুলো ওরা তুলেছে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে। খুব ভাল করে লক্ষ না করলে দেখা

যায় না ঘষার দাগ। তাছাড়া, ওগুলো ভাঙার দরকারটাই বা কি? আমরা ধরে নিতে পারি এ লাইন সম্পর্কে যাদের আগ্রহ একেবারেই নেই, পত্র-পত্রিকার কল্যাণে তারাও উবায়েদকে ভাল করে চেনে তাঁর বিশেষত্বের কারণে। গার্সিয়া তো লাইনের মানুষ। সে নিশ্চই আরও বেশি চেনে। জানে উবায়েদের তেমন কেউ নেই, যে ওগুলো আবিষ্কার করতে পারে। ঝামেলায় ফেলে দিতে পারে তাকে। আর কেউ যদি সে চেষ্টা করেও বসে, তাতেই বা কি? পুলিসী ঝামেলা হবে? পুলিস একটা আঙুলও তুলবে না গার্সিয়ার মত লোকের বিরুদ্ধে, তুমি জানো। বড়জোর কিছু পয়সা খাবে ওরা, তারপর উল্টে গার্সিয়াকেই প্রটেকশন দেবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, সময়মত তাকে সতর্ক করে দেবে। সব মাল সরিয়ে ফেলবে গার্সিয়া, প্রয়োজনে তখন সে ওগুলো ভেঙে নতুন করে বানাবার চিন্তা করবে। তার আগে কেন তা করতে যাবে শুধু শুধু?'

ঠিকই বলেছেন রাহাত খান, ভাবল মাসুদ রানা।

'শুধু পুলিস কেন, লোকটার বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু এফবিআইও করবে না, রানা। কেউ-ই এখন পারতপক্ষে ঘাঁটায় না মাফিয়াকে, অন্তত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাজনিত কিছু না হলে।'

'এ ঘটনা আপনি কি করে জানলেন, স্যার?'

'নাদিরার একটা চিঠি পেয়েছি, তা ধরো, মাসখানেক আগে। খুব ছোট থাকতে দু'য়েকবার দেখেছি ওকে আমি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে উবায়েদ নিশ্চই ওকে আমার কথা বলে থাকবেন। চিঠিতে জানলাম, মেয়েটি আমার পেশা সম্পর্কেও জানে। পুরোটা বিস্তারিত জানিয়েছে নাদিরা। জানতে চেয়েছে এ ব্যাপারে আমার পক্ষে ওকে কোন সাহায্য করা সম্ভব কি না।'

'বিষয়টা ওদেশের পুলিসকে জানিয়েছে নাদিরা?'

'না। কাউকেই কিছু বলেনি ও আমাকে ছাড়া। চিঠি পাওয়ার পর লোক মারফত যোগাযোগ করেছি আমি নাদিরার সঙ্গে। অবশ্য আমি,' আনমনে পাইপ দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ শব্দে টেবিল ঠুকতে লাগলেন বৃদ্ধ, 'প্রসঙ্গটা আকারে ইঙ্গিতে এফবিআই চীফকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু স্রেফ পাশ কাটিয়ে গেল সে।'

কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কারণ?'

তর্জনী দিয়ে ডান চোখের কোণ চুলকালেন বৃদ্ধ। 'তার যুক্তি হচ্ছে, হারলেম নিয়ে ব্যস্ত ওরা, এ সময়ে মাফিয়াকে ঘাঁটানো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে কবে ওদের সুযোগ হবে, সে আশায় বসে থাকাও যায় না। নাদিরার ধারণা, এরই মধ্যে বেশ কিছু গহনা-পাথর বিক্রি করে দিয়েছে গার্সিয়া।'

'আপনি কি নাদিরার নাম উল্লেখ করেছিলেন এফ.বি.আই চীফের সামনে?'

কটমট করে তাকালেন রাহাত খান। ভাবখানা, তুমি কি পাগল মনে করো আমাকে? 'প্রশ্নই আসে না।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। 'আপনি যদি বলেন, আমি যেতে পারি নিউ ইয়র্ক। স্রেফ পথে বসিয়ে দিয়ে আসতে পারি ডনের বাচ্চাকে।'

'কিন্তু একটা সমস্যা আছে, রানা।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ও।

'তোমাকে অফিশিয়ালি কোন সাহায্য করতে পারব না আমি এ ব্যাপারে। অসুবিধে আছে। যা করার ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে তোমার। এবং অবশ্যই আনঅফিশিয়ালি হতে হবে পুরোটা। তোমার এজেন্সির ছেলেদের সাহায্য নিতে পারবে প্রয়োজনে, তবে ফাইল ওপেন করা চলবে না। বি.সি.আই. তো নয়-ই, রানা এজেন্সিও যুক্ত হতে পারবে না এর সঙ্গে।'

আনমনে কয়েক মুহূর্ত কার্পেট দেখল রানা। তারপর মুখ তুলল। 'ঠিক আছে, স্যার। আনঅফিশিয়ালি-ই ঘটবে সব।' একটু ভাবল ও। 'জাহাজ আক্রমণের সময় গার্সিয়া উপস্থিত ছিল?'

'হ্যাঁ। ওই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে ডুসেলডর্ফের বড় এক নিলামে অংশ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন শেখ। এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখেন তাঁর বহুদিনের পুরানো, বিশ্বস্ত শোফারের বদলে অচেনা একজন গাড়ি নিয়ে এসেছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, তাঁর শোফার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার বদলে আপাতত কিছুদিন সে কাজ করবে। দায়িত্বটা উবায়েদের শোফারই তাকে দিয়েছে। সে তার আত্মীয়। শেখের বাড়ির অন্য কাজের লোকেদের দেয়া চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী দেখা গেছে, নতুন শোফারটি গার্সিয়া ছাড়া আর কেউ নয়। উবায়েদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর ড্রাইভারটি ছিল ইটালিয়ান।'

'অর্থাৎ আগে থেকেই তাঁর পিছনে লেগে ছিল গার্সিয়া?'

'নিশ্চই! হয়তো অন্য কোন উপায়ে শেখের সংগ্রহ আত্মসাৎ করার ধান্ধায় ছিল লোকটা। হঠাৎ করে রাজনৈতিক হাওয়া বদলে গিয়ে কাজটা সহজ করে দিয়েছে তার।'

'সেই অসুস্থ শোফার কোথায়?'

'যেদিন লোট্টি ও মারা রওনা হয়, তার তিনদিন আগেই মারা গেছে। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাকেও।' আবার নতুন করে পাইপে তামাক ভরলেন রাহাত খান। 'বিষয়টা যুদ্ধের কারণে তেমন প্রচার পায়নি প্রথমে। পরে অবশ্য পত্রপত্রিকা এ নিয়ে লেখালেখি করেছে। তবে কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

'ক্লিক্' শব্দে জ্বলে উঠল বৃদ্ধের লাইটার। পাইপ ধরিয়ে আনমনে কিছুক্ষণ ধোঁয়া গিললেন তিনি। 'দেশে ফিরে নাদিরা এ

নিয়ে সরকারের উঁচু মহলে দেন দরবার করেছে সাধ্যমত। কুয়েত সরকার শেখ উবায়েদের পুরানো শোফারের দেশের ঠিকানা ইটালিয়ান সরকারকে জানিয়ে তার আত্মীয়টির খোঁজ বের করার অনুরোধও জানিয়েছিল। কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে রোম কয়েক পা এগিয়েই।'

আনমনে মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'গার্সিয়ার গোড়া খুব শক্ত, বোঝাই যায়। কাজেই ভুলেও আণ্ডার-এস্টিমেট করবে না ওকে। ভাল করে আটঘাট বেঁধে তবে মাঠে নামবে।'

'জ্বি।'

'অফিসে থেকো। কিছুক্ষণের মধ্যে নাদিরা আসছে, ওর সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'নাদিরা!' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'ও এখানে, মানে ঢাকায়?'

মুচকে হাসলেন রাহাত খান। 'আমার বাসায় আছে ও। তিনদিন আগে এসেছে।'

তিন

নিউ ইয়র্ক।

ওয়েস্ট এইটিসেভেনথ স্ট্রীট। সকাল এগারোটা। একটি ট্যাক্সিক্যাব এসে দাঁড়াল পেভমেন্ট ঘেঁষে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক যুবক। চোখা চেহারা। গাল দুটো সামান্য চাপা। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, সিঁথি করে আঁচড়ানো। নাকের নিচে চওড়া গোঁফ। বাঁ গালে বড় একটা লাল আঁচিল। চোখ দেখলে নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর মনে হয় যুবককে। ক্রীম রঙের ট্রাউজার ও

টকটকে লাল স্পোর্টস শার্টে দারুণ লাগছে। মাসুদ রানা তার নাম। কাঁধে ছোট একটা ট্র্যাভেলিং ব্যাগ ঝুলছে ওর।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল, মনে হলো কিছু খুঁজছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এ-গলি ও-গলি করে বেড়াল ও। অবশেষে ব্রডওয়ে এবং ওয়েস্ট এণ্ডের মাঝামাঝি ওয়েস্ট নাইনটি ফোর্থ স্ট্রীটে পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। বড় রাস্তা থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ পুরানো একটা চোদ্দ তলা ভবন। হোটেল। হোটেল হার্ডিং।

ভেতরে ঢোকার মুখে দেয়ালে ছোট করে লেখা হোটেলের নামটা কোন এককালে নিশ্চয়ই তাই ছিল। এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। শেষের আইএনজি তুলে ছোট্ট একটা ড্যাস দিয়ে ওএন লিখে রেখেছে কে যেন। হবে হয়তো দুষ্ট ছেলেপিলের কাজ। দেখলে বোঝা যায় অতীতে ভালই চলত হার্ডিং ওরফে হার্ড-অন। দৃঢ় পায়ে লবিতে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। ভেতরের নানান তরল ও কঠিন পদার্থের মিলিত দুর্গন্ধে মুহূর্তে চোখে পানি এসে গেল ওর। অতিথিদের জন্যে লবিতে একটা চেয়ারও রাখা নেই। আছে কেবল কলম্বাস আমলের একটা লম্বা ডেস্ক, তার পিছনে একটা চেয়ার, এবং পাখির খাঁচার মত একটা খাঁচা, যা দেখে মাসুদ রানাকে অনেক কষ্টে বুঝে নিতে হলো ওটা আসলে এলিভেটর। সেলফ সার্ভিস এলিভেটর।

ডেস্কের ওপাশে বসা মানুষটির দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। জীবন্ত এক কঙ্কাল যেন। কাগজের মত পাতলা চামড়া লেপটে আছে হাড়ের সঙ্গে। এত শুকনো মানুষ জীবনে এই প্রথম দেখল ও। ঘাড় নিচু করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে লোকটা। এমনভাবে গ্লাসটা ধরেছে সে, দেখলে মনে হয় জিনিসটার ওজন মনখানেক হবে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে আশ্চর্যরকম চড়া কণ্ঠে আউড়ে গেল জিন্দা লাশ, 'ফাইভ আ ডে, থার্টি আ উইক, আ হাণ্ড্রেড আ মানথ। থার্টি শোনাল, 'থোয়িটি', হাণ্ড্রেড 'আনডার্ট' আর মানথ 'মানট'।

'অ্যাটাচড্ বাথ হতে হবে কিন্তু।'

কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার দৃষ্টিতে মাসুদ রানাকে দেখল মানুষটা। 'সে কথা আগে বলতে বেধেছিল কোথায়? সাত ডলার রোজ, হাপ্তা চল্লিশ, মাস একশো ত্রিশ, চলবে?'

'রুমটা দেখতে চাই।'

পিছনের দেয়ালে ঝোলানো হুক বোর্ড থেকে একটা চাবি খসিয়ে নিল জিন্দালাশ, কাউন্টারের ওপর দিয়ে জোর এক ঠেলায় পাঠিয়ে দিল রানার দিকে। সময় মত রানা ক্যাচ না ধরলে নির্ঘাত লবির মাঝ পর্যন্ত উড়ে যেত চাবি। 'রুম সাতশো তিন। ক্রস ভেন্টিলেশন। ধোয়া চাদর আর তোয়ালে সরবরাহ করা হবে প্রতি হপ্তায় একবার করে।'

কাউন্টারে কনুইয়ের ভর চাপিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মাসুদ রানা। একটু আগে মহাশূন্য অভিযানে গেছে এলিভেটর, ওটার সফল প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। এক সময় নামল ওটা, দুরু দুরু বুকে পায়ে পায়ে এগোল রানা। অস্ফুটে দোয়া-দরূদ পড়ছে। নানা রকম অশ্রুতপূর্ব কাতর ধ্বনি, সামনে-পিছনে দোল আর ক্রমাগত ঝাঁকি খেতে খেতে ওকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল খাঁচা।

তিন তলা অতিক্রম করার সময় করিডর দিয়ে ভেসে আসা নারীকণ্ঠের বিকট এক চিৎকার শুনে চমকে উঠল মাসুদ রানা। মনে হলো নিশ্চয়ই কেউ ছুরি মেরেছে মেয়েটিকে, নয়তো তার প্রসব বেদনা উঠেছে। পাঁচ তলায় ফুল ভল্যুম দিয়ে অ্যাসিড রক শুনছে কেউ সিডি প্লেয়ারে। এত প্রচণ্ড আওয়াজ উঠছে ড্রাম

বিটের যে শক্ ওয়েভের ঠেলায় খাঁচার কাঁপাকাঁপি আরও বেড়ে গেল।

সাতশো তিন নম্বর রূমটা সাত তলার করিডরের একেবারে পুব মাথায়। আয়তন পনেরো স্কয়ার ফুট। সিঙ্গল খাট, ড্রেসিং টেবিল, একটা গদিমোড়া আর্মচেয়ার। একটা খুদে নড়বড়ে রাইটিং টেবিল, সঙ্গে কাঠের চেয়ার এবং একটা ক্লজিট, এই হলো আসবাব এ রূমের। বিছানায় চাদর নেই, চিমসে মার্কা ম্যাট্রেস যেটা আছে, নিচের জিন্দালাশের মতই প্রায় স্বাস্থ্য তার। আয়নায় চেহারা দেখা দুষ্কর, অসংখ্যবার রং করার ফলে বাথরূমের দরজা এত পুরু হয়ে গেছে যে সর্বশক্তি ব্যয় করেও লাগানো যায় না। কমোড, ওয়াশ বেসিন ইত্যাদির অবস্থা অবর্ণনীয়।

চার দেয়ালে মাকড়সার জালের মত ফাটল। খাবলা খাবলা চলটা উঠে গেছে রঙের। পায়ের তলায় কার্পেট আছে ঠিকই, তবে ওপরদিকের লোম প্রায় উজাড়। সর্বত্র দাঁত বের হয়ে আছে বাদামী রঙের চটের ব্যাকিং। অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাল মাসুদ রানা। এত দুঃখও ছিল কপালে! নিচে নেমে এল ও।

'রূমটা নিচ্ছি আমি।'

'কতদিনের জন্যে?'

'ঠিক নেই। এক হপ্তা, এক মাস বা এক বছর,' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'আগে থেকে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।'

গভীর সন্দেহ ফুটল জিন্দালাশের কোটরাগত কুতকুতে চোখে। 'কি করা হয়?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'পকেট কাটা হয়।' রানাও গম্ভীর।

'পুলিসী ঝামেলার কোন আশঙ্কা আছে?'

'পাগল! আমি পুলিসের বাবা! বারো বছর পকেট কাটছি, ধরা

পড়িনি একদিনও। পড়বও না।'

'ভাল। এক হপ্তার ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে পকেটে হাত ভরে দিল মাসুদ রানা।

'মেয়ে নিয়ে রাত কাটানো যাবে না। জোরে জোরে গান-বাজনা শোনা নিষেধ। পার্টি দেয়া চলবে না। ড্রাগস, হার্ড বা পট স্মোকিং, কোনটাই চলবে না।' আরেক দিকে তাকিয়ে রীডিং পড়ে গেল লোকটা।

'আমি রাজি।' গুণে গুণে চল্লিশ ডলার বের করে দিল মাসুদ রানা। মানি রিসিট চাইল। আবার কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার চাউনি দিল জিন্দালাশ। ও-ও পাল্টা চোখ দেখাল এবার। ফলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও দু'মিনিট পর একটা রসিদ ধরিয়ে দিল লোকটা রানার হাতে। হার্ড-অনের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে সই করল রানা। নাম লিখল প্যাট্রিক কার্নি।

বেরিয়ে এল ও হোটেল ছেড়ে। ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো হাইওয়ে সুপার মার্কেট। সেখান থেকে দুই ক্যান অ্যারোসল, র‍্যাট রিপেলেন্ট পাউডার, সাবান-শ্যাম্পু, চাদর-তোয়ালে, এক হালি করে শার্ট-প্যান্ট, আণ্ডারওয়্যারসহ টুকিটাকি আরও অনেক কিছু কিনল মাসুদ রানা। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে ততক্ষণে। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না ও। ফিরে এল হোটেলে।

প্রায় এক ঘণ্টা খরচ করে রূমটাকে মোটামুটি বাসযোগ্য করে তুলল মাসুদ রানা। সারা ঘরে, বাথরূমে অকৃপণ হাতে অ্যারোসল স্প্রে করল। দরজার সামনে ছড়িয়ে রাখল বেশ খানিকটা র‍্যাট রিপেলেন্ট। যদিও এ পর্যন্ত ইঁদুর চোখে পড়েনি, কিন্তু ওর বদ্ধমূল ধারণা, এত সুন্দর উপযুক্ত জায়গায় ইঁদুর না থেকেই পারে না। কাজ সেরে আচ্ছাসে সাবান-শ্যাম্পু মেখে গোসল করল সে।

তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল পেট ঠাণ্ডা করতে। ব্রডওয়ের এক পরিচিত রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পাট চুকাল ও। তারপর এক কাপ কফি নিয়ে ভাবতে বসল।

তিনদিন আগে নাদিরাকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছে মাসুদ রানা। আসার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, পথে বসাবে ও গার্সিয়াকে। চোরের ওপর বাটপারি করবে, স্রেফ ডাকাতি করবে ওর দোকানে। ঢিলের বদলে পাটকেল খেতে হবে মাফিয়া বাবাজীকে। সম্পদ হারানোর ব্যথা হাড়ে হাড়ে তাকে টের পাওয়াবে মাসুদ রানা। কিন্তু কাজটা ছেলেখেলা নয়, তাই খুব সাবধানে এগোচ্ছে ও।

পৌঁছেই এখানকার এক ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক বন্ধুর সাহায্যে গত কয়েক বছরে আমেরিকায় যত বড় ধরনের জুয়েল রবারির ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় সবগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জোগাড় করেছে মাসুদ রানা। এক কুড়ি বিস্তারিত রিপোর্ট। সব মিলিয়ে ফাইলটা হয়েছে দশাসই। একবার করে পড়েছে ও সবগুলো। একটা ব্যাপার কেমন সন্দেহজনক মনে হয়েছে রানার ওগুলো পড়ে। প্রায় সব ক'টা ডাকাতিই একই কায়দায় সংঘটিত হয়েছে, প্রায় একই টেকনিক ব্যবহার করেছে ডাকাতরা।

এখানকার রানা এজেন্সির চীফ শওকত জানে কেন নিউ ইয়র্ক এসেছে মাসুদ রানা। আর জানে শেখ জাবের আল উবায়েদের নাতনী নাদিরা। অন্যরা জানে না। প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শেষ, এবার সবাইকে জানাবে মাসুদ রানা। এবং আগামীকাল গার্সিয়ার দোকানটা দেখতে যাবে নাদিরাকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর হাত দেবে মূল কাজে। কফি শেষ করে উঠল মাসুদ রানা। মাফিয়াকে আণ্ডার এস্টিমেট করে না ও, তাই রানা এজেন্সিতে থাকার ঝুঁকি এড়াবার জন্যে হোটেলে এসে উঠেছে। গত তিনদিন ছিল

হিলটনে। আজ চেহারা পাল্টে এসে উঠেছে হার্ড-অনে। অপারেশন শেষ না করা পর্যন্ত এখানেই থাকবে ও।

লবিতে আরও তিন বোর্ডারের সঙ্গে এলিভেটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, এমন সময় বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে এসে দলে যোগ দিল। লালচে সোনালী রঙের চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা তার। পরনে খাটো স্কার্ট। টাইট ব্লাউজ। পায়ে তিন ইঞ্চি উঁচু হিল। মুখে কড়া মেকআপ। তাকে অহেতুক এর-ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে সবাই বুঝল, মেয়েটি বারবণিতা। দেহের তুলনায় তার বুক আর নিতম্ব বেশ ভারি।

মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, ফিক্ করে হেসে উঠল মেয়েটি ওর চোখে চোখ রেখে। 'জাস্ট মুভ ইন?'

মাথা দোলাল ও।

'ওয়েল কাম টু হার্ডিং,' আবারও অহেতুক গা দুলিয়ে হাসল সে। সম্ভবত ওর চেহারা, পোশাক আকর্ষণ করেছে তাকে। 'কোন ফ্লোর?'

'সেভেনথ।'

'সত্যি? আমিও। সাতশো পাঁচ নম্বর রুম। কোন প্রয়োজন পড়লে দ্বিধা করবেন না, সরাসরি চলে আসবেন।'

'নিশ্চই!' সৌজন্যের হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। 'ধন্যবাদ।'

পাশ থেকে কে যেন কনুই চালাল ওর পাঁজরে। ঘুরে তাকাল রানা। এক নিগ্রো যুবক। চোখাচোখি হতে একটা চোখ টিপল যুবক। 'আমাকে আমন্ত্রণ করলে প্রয়োজন পড়ার অপেক্ষায় থাকতাম না, একটা বানিয়ে হাজির হয়ে যেতাম ওর ঘরে,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। এতই নিচু কণ্ঠে যে অন্যরাও পরিষ্কার শুনতে পেল।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল মাসুদ রানার। কিন্তু সামলে নিল। মুখ ঘুরিয়েই খাঁচাটাকে হাঁ করে থাকতে দেখে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অন্যদের সঙ্গে মেয়েটিও উঠল। থেকে থেকেই রানাকে দেখছে সে, হাসছে মুখ টিপে। সাত তলায় নামল ওরা, নিগ্রো যুবকটিও নামল। হাত নেড়ে মাসুদ রানাকে টা-টা জানাল মেয়েটি, নিতম্বে ঢেউ তুলে চলে গেল নিজের রুমের দিকে।

সেদিকে খেয়াল নেই মাসুদ রানার। করিডরে পা রেখেই থেমে পড়েছে। বাঁয়ে করিডরের প্রান্তে ওর রুমের দরজা হাঁ করে খোলা। আশ্চর্য! পরিষ্কার মনে আছে বেরোবার সময় দরজায় তালা মেরে গিয়েছিল রানা। তাড়াতাড়ি এগোল ও। মোটা, বয়স্ক এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে রুমের মাঝে। চোখে হতভম্ব দৃষ্টি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। 'হ্যালো!'

চমকে ঘুরে তাকাল মহিলা। 'ওহ্! মিস্টার কার্নি, স্যার?'

'হ্যাঁ!'

'আমি ক্লারা, হাউসকীপার। এসেছিলাম রুম গোছাব বলে, কিন্তু··· ।'

পাঁচ ডলারের একটা নোট মহিলার হাতে গুঁজে দিল মাসুদ রানা। 'অনেক ধন্যবাদ, ক্লারা। ও কাজ আমি নিজেই সেরে ফেলেছি।'

নোটটা দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্লারার। 'থ্যাঙ্কস, সানি। গড ব্লেস। যখন যা লাগবে আমাকে বলবে, কেমন?'

'বলব।'

আরেক পশলা চওড়া হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেল মহিলা। দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ছিটকিনি লাগিয়ে সিকিউরিটি চেইনের দিকে হাত বাড়াল। আবিষ্কার করল, চেইন আছে ঠিকই, কিন্তু যার ভেতর ঢোকানো হয় তার প্রান্ত, সেই পট নেই। কি আর করা!

হার্ড-অন যখন। কাপড় পাল্টাল মাসুদ রানা, তারপর পেপার কাটিঙের ফাইলটা ব্যাগ থেকে বের করে উঠে পড়ল বিছানায়।

চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল কাহিনীগুলোর ওপর। প্রথমবার শুধুই চোখ বোলাল মাসুদ রানা, তারপর ছেড়ে ছেড়ে পড়ে গেল সবগুলো। এরপর আরও আধ ঘণ্টা ব্যয় করল কোনটা কোনটা ওর বিশেষ কাজে আসবে, তা বাছাইয়ের পিছনে। সবশেষে পাঁচ-ছয়টা ঘটনার পেপার কাটিং বাতিল করে দিল রানা। বাকি রইল চোদ্দটা।

চোদ্দটা জুয়েলারি স্টোর ডাকাতির রোমহর্ষক কাহিনী। গত তিন বছরের মধ্যে ঘটেছে ডাকাতিগুলো, এর মধ্যে দুটো ঘটেছে নিউ ইয়র্কের ডায়মণ্ড ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটে। এ দুটোই সবচেয়ে বড় ঘটনা, কয়েক কোটি ডলারের জুয়েলারি লুটে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। অন্যগুলো ঘটেছে শিকাগো, বিভারলি হিলস্, ডালাস, আটলান্টা, মায়ামি, ডেনভার প্রভৃতি জায়গায়।

এগুলোর মধ্যে মাত্র একটার মোকাবেলা করতে পেরেছে পুলিস। পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে অপরাধীদের। অন্যগুলোর সত্যিই কি কোন সুরাহা করতে পারেনি? আনমনে ভাবল মাসুদ রানা। একটা সিগারেট ধরাল। হয়তো পেরেছে, অনেক দেরিতে। যখন ঘটনাটার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে পত্রিকাওয়ালারা, কেউ ধরা পড়ে থাকলে আগের মত গুরুত্ব দিয়ে প্রথম পাতায় ছাপেনি। ছেপেছে হয়তো চল্লিশ কি পঞ্চাশ পাতায়, ছোট্ট করে। যে কারণে সেগুলো সংগ্রহ করতে পারেনি মাসুদ রানা। পারার কথাও নয়।

আবার ফাইলে মন দিল ও। আবিষ্কার করল, চোদ্দটা ডাকাতির এগারোটাই সংঘটিত হয়েছে প্রকাশ্য দিনের আলোয়, বাকি তিনটে রাতে। রাতে কম হওয়ার কারণও অবশ্য আছে।

রাতে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বভাবতই খুব কঠোর। নিকটস্থ পুলিস স্টেশন বা কোন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির সঙ্গে ইলেক্ট্রনিক অ্যালার্মিং ব্যবস্থা থাকে এদের। দরজা ভেঙে বা আর কোন উপায়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করা হলে মুহূর্তে খবর পৌঁছে যায় জায়গামত। যে কারণে দিনেই সুবিধে।

যে একটা ঘটনার কিনারা করতে পেরেছে পুলিস, সেটি ছিল রাতের, দিনের নয়। দিনে সংঘঠিত সবগুলোতেই শতকরা একশো ভাগ সফল হয়েছে অপরাধীরা। স্কি মাস্ক অথবা মোজা মাথায় পরে নানান রকম ছদ্মবেশ নিয়ে কাজে নামে ওরা। মাথায় পরচুলা, মুখে দাড়ি-গোঁফ থাকে। আরও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে ওরা যাতে কেউ চিনে ফেলতে না পারে।

আবার পড়তে শুরু করল রানা বিবরণগুলো। এবার ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দরজায় নকের শব্দে মুখ তুলল ও, 'কে?'

'আমি। আপনার প্রতিবেশী,' বলল একটা মেয়ে কণ্ঠ।

মুচকে হেসে বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা। তাড়াতাড়ি খুলে দিল দরজা।

ভেতরে ঢুকল সেই মেয়েটি। হাসছে, তবে আগের মত গা দুলিয়ে নয়।

হাসল রানাও। দেখল তাকে আপাদমস্তক। 'একদম নিখুঁত হয়েছে। প্রথমে চিনতেই পারিনি।'

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল নাদিরা। 'পাস করেছি তাহলে!'

'বোসো।'

আর্ম চেয়ারটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে এসে বসল মেয়েটি। মাসুদ রানা বসল খাটে। 'কি করছিলেন?'

'পেপার কাটিংগুলোয় চোখ বোলাচ্ছি।'

'জুয়েল রবারি?'

'হ্যাঁ।'

আনমনা হয়ে পড়ল নাদিরা। 'আপনাকে বোধহয় বড় রকম ঝামেলায় ফেলে দিলাম।'

'মোটেই না। তোমার নানা আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কাজেই তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং জিনিসগুলোর একটা বিহিত করা আমি কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছি।'

'কিন্তু গার্সিয়ার যে পরিচয় আপনার মুখে শুনেছি, তাতে ভয় ধরে গেছে। যদি কোন ঝামেলা হয়ে যায়?'

'হবে না। মনে জোর রাখো।'

'কবে কাজ সারবেন ঠিক করেছেন?'

'এখনই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না। অনেক কিছু জানতে বাকি এখনও, অনেক কিছু বোঝা বাকি রয়ে গেছে।'

চার

ইস্ট ফিফটি ফিফথ স্ট্রীট। জুয়েলারি বিক্রেতা অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স। সামনের পুরোটা আর্মার্ড কাঁচ ঘেরা। আমেরিকার প্রথম সারির টিফানি বা কার্টারের পর্যায়ে পড়ে না দোকানটা, তবে ডায়মণ্ডসহ অন্যান্য মূল্যবান রত্নের মজুত ও চাকচিক্যের দিক থেকে একেবারে কমও যায় না।

ভেতরের সাজ-সজ্জা ও অভিজাত আড়ম্বর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ভেতরে গ্রাহকদের বসার জন্যে রয়েছে পঞ্চদশ লুই আমলের ডিজাইনের পুরু গদি মোড়া চেয়ার। মেঝেতে তুলোর মত নরম কার্পেট, পা রাখলে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যায়।

এল-প্যাটার্নের পুরু কাঁচের তৈরি শো কেসটাও চেয়ে দেখার মত। ভেতরে সাজিয়ে রাখা আছে অজস্র চোখ ঝলসানো অলঙ্কার। বেশিরভাগই ডায়মণ্ডের। ওদিকে সামনের আর্মার্ড গ্লাসের ভেতর দিকে রয়েছে উইণ্ডো ডিসপ্লে কেস। সব মিলিয়ে চমৎকার সাজানো-গোছানো ছিমছাম একটা দোকান।

'এল'-এর খাটো মাথার অর্ধেকটা জুড়ে আছে আলাদা একটা কাউন্টার। পুরানো আমলের হাত ঘড়ি ও অ্যান্টিক জুয়েলারি কেনাবেচা হয় ওখানে। ব্যাপারটা পুরোপুরি বেমানান লাগল মাসুদ রানার। এই কাউন্টারের পিছনের দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড এক আয়না ঝুলছে। চারদিকে যথাসম্ভব দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও ভেতরে পা দিয়েই। গাঢ় বাদামী রঙের দামী কাপড়ের কমপ্লিট সুট পরেছে রানা। সাদা শার্ট, সাদা বুটিওয়ালা টকটকে লাল টাই। পায়ে চেহারা দেখা যায় এমন চকচকে কালো জুতো।

নাদিরা পরেছে নীল জিনস্, কেডস এবং ডিমের কুসুম রঙের মোটা পুলওভার। এ মুহূর্তে স্বরূপে আছে নাদিরা। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয়। সাদা জমিনে গাঢ় নীল বড় বড় চোখ। নাকটা খাড়া। থুত্‌নিতে গভীর খাঁজ। হাসলে টোল পড়ে গালে। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং নাদিরার। ঘাড়ের কাছে ইউ-র মত করে কাটা একরাশ ঘন কালো চুল। সব মিলিয়ে অপূর্ব লাগছে দেখতে।

ছয়জন সেলসম্যান, গুণে দেখল মাসুদ রানা। এল-এর দীর্ঘ বাহুর পিছনদিকে সেলসম্যানদের অবস্থান। এদের পিছনের দেয়ালে কোমর সমান উঁচুতে আছে লম্বা একটা স্টীলের রেইল, এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত। সেলসম্যান প্রত্যেকেই অল্পবয়সী, দীর্ঘদেহী, স্মার্ট এবং পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। চলনে চিতার ক্ষিপ্রতা, বলনে কেতাদুরস্ত। চেহারা বলে, এদের একজনও এদেশী নয়। ইউরোপীয়ান। এবং অবশ্যই ইটালিয়ান। গেটের

গার্ডটিও তাই। লোকটাকে দেখে নিরস্ত্র মনে হলেও মাসুদ রানার অভিজ্ঞ চোখ তার বাঁ বগলের নিচে শোল্ডার হোলস্টারের উপস্থিতি টের পেয়েছে পয়লা দর্শনেই। দোকানটা আয়তাকার। পিছন দিকে, কাউন্টারের ওপাশে, প্রকাণ্ড আয়নাটার পাশে পুরু আর্মার্ড স্টীলের ছয় বাই চার একটা দরজা। খোলা আছে ওটা এ মুহূর্তে। ভেতরে বড়সড় একটা রুম, সম্ভবত স্টোর রুম। প্রকাণ্ড একটা সেফ দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে এদিকে মুখ করে।

বড় শক্ত চীজ ওটা, ভাবল মাসুদ রানা। প্রয়োজন দেখা দিলে দাঁত ফোটানো খুব কঠিন হবে। ভেতরে কোন টিভি ক্যামেরা নেই, নিশ্চিত হলো রানা, তবে অ্যালার্ম বাটন আছে নিঃসন্দেহে। যদিও তেমন কিছু নজরে পড়ল না। লুকোনো আছে। সামনের কাঁচের দেয়ালের ওপাশে আছে স্টীলের শাটার। নিরাপত্তার আয়োজনে কোথাও কোন কমতি রাখেনি গার্সিয়া।

ভেতরে কয়েকজন খদ্দের আছে। সেলসম্যানরা তাদের সামাল দিতে ব্যস্ত। এতে সুবিধেই হলো মাসুদ রানার, কয়েক মুহূর্ত বাড়তি সময় পেয়েছে ও চারদিকে নজর বোলাবার। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা স্বাস্থ্যের এক লোক নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। দেখেই বুঝল রানা এ-ই সেই। রবার্টো গার্সিয়া। দোকানের ভেতরটা এয়ারকণ্ডিশণ্ড, তাই কোট খুলে রেখেছে লোকটা। শার্টের নিচে কিলবিল করছে তার থোক্ থোক্ পেশী।

ভাল করে দেখল রানা গার্সিয়াকে। পাঁচ ফুট সাড়ে ছয়ের বেশি হবে না লোকটা। বুকের ছাতি ব্যারেলের মত। ট্রাউজারের নিচে ব্যাটার উরু কলা গাছের মত মোটা। স্রেফ ষাঁড় একটা। চেহারা অবশ্য ভাল মানুষের মত। রীতিমত ভদ্র, গোবেচারা চাউনি। দেহের তুলনায় মাথা কিছুটা বড়, চৌকো চোয়াল। নাক খাড়া। আটাশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে বয়স। সব মিলিয়ে

মানুষটিকে বেশ অবিশ্বাসী মনে হলো মাসুদ রানার। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল গার্সিয়া হাসি মুখে।

'গুড্ আফটারনুন,' ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে অভিবাদন জানাল সে। বো করল মাথা ঝুঁকিয়ে, মুখে মধুর হাসি। 'আপনাদের কোন সাহায্যে লাগতে পারি?' নজর সেঁটে আছে তার নাদিরার ওপর।

'একটা এনগেজমেন্ট রিং খুঁজছি,' বলল মাসুদ রানা। হাসি মুখে নাদিরাকে দেখল এক পলক। 'ডায়মণ্ড রিং অবশ্যই।'

'হোয়াই, ইয়েস!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। এনগেজমেন্ট রিং কিনতে আসা দুই যুবক-যুবতীর সম্পর্কের ব্যাপারে চট্ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল গার্সিয়া। 'আসুন, আসুন! প্রচুর ডায়মণ্ড রিং আছে আমাদের। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমাদের মত এত চমৎকার আংটি নিউ ইয়র্কে আর কেউ দিতে পারবে না। কাম, দিস ওয়ে, প্লীজ!'

গোটা চারেক ডায়মণ্ড আংটি বের করে ওদের দেখতে দিল গার্সিয়া। পরক্ষণে তার এক মন্তব্যে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল নাদিরা। 'আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে, ম্যাডাম। আগে কোথাও দেখেছি নিশ্চই?'

'আমাকে?' শক্ত হয়ে গেল মেয়েটি। মাসুদ রানারও একই অবস্থা। 'কি জানি! হতে পারে।'

'আগে সম্ভবত বান্ধবীর জন্যে নেকলেস কিনতে এসেছিলেন আপনি একবার।' হাসি আরও চওড়া হলো গার্সিয়ার। 'হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, সত্যিই এসেছিলেন। ভুলে গেলেন?'

হারামজাদার স্মরণশক্তি তো সাংঘাতিক, ভাবল মাসুদ রানা। মনে মনে প্রার্থনা করল সব গুবলেট করে না ফেলে মেয়েটা। কিন্তু না, চমৎকার ম্যানেজ করে নিল সে। 'ও-ও, আচ্ছা! এটাই সেই দোকান? কি আশ্চর্য, খেয়ালই করিনি আমি।' ভেতরে যা-ই

চলুক, মুখে খানিকটা হাসিও ফোটাতে পারল নাদিরা শেষ পর্যন্ত।

'দেখলেন?' বিজয়ীর হাসি দিল গার্সিয়া। 'ঠি-ক মনে রেখেছি! কোন চেহারা একবার দেখলে জীবনেও ভুলি না আমি।'

সেরেছে! মনে মনে বলল মাসুদ রানা, শ্বশুরের ছেলে দেখছি ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী। এরপরও কিছু মন্তব্য না করলে খারাপ দেখায়, তাই নাদিরার দিকে তাকাল রানা কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে। 'বলো কি! এখনই এত ভুলোমন? বিয়ের পর আমাকে চিনতে ভুল করে বসবে না তো?'

'যাহ্!' কনুই চালাল নাদিরা। হা হা করে হেসে উঠল গার্সিয়া, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল অন্য খদ্দের, সেলসম্যানদের অবাক চোখে ঘুরে তাকাতে দেখে। ব্যস্ততার ভান করে ঝুঁকে পড়ল শো কেসের ওপর।

সাড়ে চার হাজার ডলারের একটা আংটি পছন্দ করল মাসুদ রানা। কিনে নিল ওটা। সুন্দর মোড়কে পেঁচিয়ে বাক্সসহ আংটিটা প্যাক করে দিল গার্সিয়া। 'আবার আসবেন, ম্যাডাম।'

'আসব। ও হ্যাঁ, আপনি দেখছি পুরনো হাতঘড়িও কেনা-বেচা করেন।'

'করি। কেন? আছে নাকি আপনার? বিক্রি করবেন?'

'আছে একটা।'

'কত পুরনো?'

'তা আশি-নব্বই বছর তো হবেই।'

'নিয়ে আসুন একদিন। ভাল দাম পাবেন।'

'আচ্ছা, নিয়ে আসব। ধন্যবাদ।'

মাসুদ রানার উদ্দেশে লম্বা বো করল এবার গার্সিয়া। বিদায় জানাচ্ছে। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করল ও। 'ভেতরটা ঘুরে দেখতে পারি আমরা?'

'বাট অফকোর্স, একশোবার! দেখুন না। আমি আছি এখানেই। আর কোন আইটেম দেখতে চাইলে বলবেন।'

শো-কেস দেখায় মন দিল ওরা। গার্সিয়ার কাছ থেকে কয়েক পা সরে এসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল নাদিরা, 'কী সাংঘাতিক মানুষ। সেই কবে দেখেছে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যে। এখনও ভোলেনি!'

'হুম্‌ম্!' মাসুদ রানা গম্ভীর। চিন্তায় ডুবে আছে।

মিনিট পাঁচেক ঘুরল ওরা। ডায়মণ্ড, রুবি, স্যাফায়ার, এমারেল্ড, ক্রিস্টাল, টোপাজ, গার্নেট ইত্যাদি পাথরের তৈরি হাজারো নকশার অলঙ্কার সেট দেখল। হাঁটতে হাঁটতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল নাদিরা এক জায়গায়। ডায়মণ্ড বসানো নেকলেস, ব্রেসলেট ও ইয়ার রিঙের একটা সেটের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক।

চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'কি হলো?'

'এই আরেকটা! সাতাশি সালে ডুসেলডফের এক নীলাম থেকে কিনেছিলেন নানা।'

'কিছু বললেন, ম্যাডাম?' আচমকা ওদের মাঝখানে ঢুকে পড়ল গার্সিয়া।

'এই সেটটা দেখতে পারি?' আঙুল তুলে দেখাল মাসুদ রানা।

'নিশ্চই!' নিজেই শো কেস থেকে ওগুলো বের করল লোকটা।

যেন মুগ্ধ হয়েছে খুব, এমন দৃষ্টিতে উল্টেপাল্টে দেখল রানা সেটটা। নাদিরা স্পর্শ করল না। মুখে বহু কষ্টে জোগাড় করা এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকল শুধু। 'চমৎকার সেট!' বলল রানা। 'আপনাদের তৈরি?' যা দেখার দেখে নিয়েছে।

'না, স্যার। বাইরে থেকে কেনা।'

'কত দাম?'

'দুইশো আশি হাজার ডলার।'

'আই সী! সত্যি চমৎকার।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

যেটা যেমন ছিল, বাক্সে ভরে এগিয়ে দিল ও গার্সিয়ার দিকে। 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ঘড়িটা আনতে ভুলবেন না, ম্যাডাম।'

'না, ভুলব না।'

বেরিয়ে এল ওরা রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স থেকে। 'তিনটেরই পিছনে ঘষার দাগ ছিল,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল নাদিরা।

'দেখেছি। দাগগুলো প্রায় বোঝাই যায় না।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'এটা নিয়ে দুই দফায় গোটা দশেক দেখলাম, রানা। দেখলেই বলে দিতে পারি আমি কোনটা আমাদের।' একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মেয়েটি। 'এতদিনে নিশ্চই অনেকগুলো বিক্রি করে ফেলেছে লোকটা।'

'আজ ওই একটা সেটই দেখেছ?'

'হ্যাঁ। আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো আরও দু'চারটে আইডেন্টিফাই করতে পারতাম।'

চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা। ও জানে, এখানকার মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে রবার্টো গার্সিয়ার বাবা ডন পাওলো গার্সিয়া যথেষ্ট প্রভাবশালী। তার ছেলের বিরুদ্ধে বলতে গেলে একাই লাগতে হবে রানাকে, কারও কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কাজেই যা করার খুব সুচারুভাবে করতে হবে, যাতে রবার্টো ধাওয়া করার মত কোন সূত্র না পায়।

ভেতরে রবার্টো আর সেলসম্যানসহ সাতজন, আর গেটের গার্ড, মোট আট জনকে দেখেছে মাসুদ রানা। ভেতরের রুমে আরও কেউ আছে হয়তো। থাক না থাক, আছে ধরে হিসেব করা ভাল, কমপক্ষে দু'জন। মোট দশজন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, ঘটনাটা দিনের বেলাতেই ঘটাতে হবে। রাতের চেয়ে দিনেই সুবিধে, অতীতের ডাকাতির রিপোর্টগুলোও তাই বলে। অর্থাৎ চার-পাঁচ জন খদ্দেরের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

কিন্তু দিনে কখন? সকালেই, লাঞ্চ আওয়ারে, না বিকেলের দিকে? উত্তরটা পেতে হলে কয়েক দিন রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। অন্তত এক সপ্তাহ। ভাবতে ভাবতেই এ কাজের উপযুক্ত, পছন্দসই একটা জায়গা পেয়ে গেল মাসুদ রানা। দোকানটার উল্টোদিকে একটা বড় রেস্তোরাঁ আছে, ওখানে বসেই কাজটা সারা যাবে।

লক্ষ রাখতে হবে, কখন খোলে দোকানটা, কখন বন্ধ হয়। কয়জন কর্মচারী রিপোর্ট করে সকালে, কোন সময় খদ্দেরের উপস্থিতি কি রকম থাকে ইত্যাদি। হঠাৎ কি খেয়াল হতে নাদিরার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'পুরনো কোন ঘড়ি সত্যিই আছে নাকি তোমার কাছে?'

'আছে।'

'গুড আইডিয়া।'

'মানে?'

'পরে বলব।'

পরদিন থেকে সকালের নাশতা এবং দুপুর ও রাতের খাওয়ার জন্যে নিয়মিত ওই রেস্টুরেন্টে আসা-যাওয়া শুরু করল মাসুদ

রানা। এক টেবিলে বসে না ও ইচ্ছে করেই, খালি থাকলেও না।

সকালে একটায় বসে তো দুপুরে আরেকটায়। রাতে অন্যটায়। তবে সবগুলোই জানালা ঘেঁষা। পরিষ্কার দেখা যায় রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের প্রবেশ পথ। আরও সুবিধে যে রেস্টুরেন্টটা প্রায় সব সময়ই খদ্দেরে পূর্ণ থাকে। কাজেই একজনকে রোজ তিনবেলা হাজিরা দিতে দেখলেও খুব একটা লক্ষ করে না কেউ। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে কি করছে, সেদিকে তাকানোর তো প্রশ্নই আসে না।

তবু মাসুদ রানা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। তাই তিন দিন পর রুটিন পরিবর্তন করল। সকালে কোন কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে সারাদিনের জন্যে গাড়ি ভাড়া করে। দূর থেকে রবার্টো গার্সিয়ার প্রবেশপথ মোটামুটি দেখা যায়, এমন জায়গা বেছে নিয়ে গাড়ি ডবল পার্ক করে বসে থাকে। এভাবে পাঁচদিনেই যা জানার ছিল জেনে নিল ও।

দোকান খোলে ঠিক দশটায়। তবে কর্মচারীরা ভেতরে ঢোকে আটটা পঁয়তাল্লিশ থেকে নয়টার মধ্যে। নয়টায় আসে কমার্শিয়াল ক্লিনারের গাড়ি। ভেতরটা ঝাড়-মোছ ইত্যাদি করে ইউনিফর্ম পরা দুই ক্লিনার। তারা পৌঁছুলে স্বয়ং মালিক-কাম-ম্যানেজার খুলে দেয় আর্মার্ড গ্লাস ডোর। এবং লোক দুটো ঢোকামাত্র ফের বন্ধ করে দেয়। বাইরের স্টীল শাটার নামানো থাকে তখন, কাজেই ভেতরে কি হয় বোঝার উপায় থাকে না।

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ভেতরে থাকে ক্লিনাররা, তারপর ভ্যাকিউম ক্লিনার, ঝাড়ন ইত্যাদিসহ বেরিয়ে আসে। তাদের বের করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেয় গার্সিয়া। রানার অনুমান, পরের পনেরো মিনিট উইণ্ডো কেসগুলো সাজাতে ব্যস্ত থাকে কর্মচারীরা।

অবশেষে ঠিক দশটায় খুলে যায় ওটার প্রবেশ পথ, সিকিউরিটি গার্ড অবস্থান নেয় দরজার সামনে, ঘড় ঘড় শব্দে উঠে যায় শাটার। শুরু হয় দিনের কাজ। একদিনও এই নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রমও চোখে পড়েনি মাসুদ রানার। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের কার্যক্রম।

ওদিকে, কর্মচারীর সংখ্যা হিসেব করার সময় রানা যে দু'জনকে বাড়তি ধরেছিল, দেখা গেল হিসেবটা একদম সঠিক ছিল। পরের দু'জন সম্ভবত কারিগর হবে। পিছনের রূমে বসে কাজ করে বলে দেখতে পায়নি সেদিন ওরা। লাঞ্চ ব্রেকে এক সঙ্গে দু'জনের বেশি কর্মচারী বের হতে দেখেনি রানা কখনও। প্রথম জোড়া ফিরলে আরেক জোড়া বের হয়। সবার শেষে বের হয় গার্সিয়া। মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরই ফিরে আসে।

সন্ধে পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায় দোকান। শাটার নেমে যায়, ফলে ভেতরে কি ভাবে কি করা হয় দেখার উপায় থাকে না। রানার অনুমান, দামী দামী সব অলঙ্কার ইত্যাদি পিছনের সেফে ঢোকানো হয় ওই সময়। এবং ভেতরের বার্গলার অ্যালার্ম সিস্টেম অ্যাকটিভেট করা হয়।

সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে আসে সবাই। সবার শেষে থাকে গার্সিয়া। বেরোবার আগে ডান হাত উঁচু করে দরজার প্যানেলে কিছু একটা করে সে। সম্ভবত দ্বিতীয় অ্যালার্ম সিস্টেম অ্যাকটিভেট করে। যখন বেরোয়, গেটের গার্ড এবং আরও দুই সেলসম্যান থাকে তার সঙ্গে। অন্যদের এক হাত থাকে পকেটে, গার্সিয়ার দুই হাতই।

গাড়ি নিয়ে দ্রুত পার্ক অ্যাভিনিউ যায় দলটা প্রথমে, ওখান থেকে এক ব্লক দক্ষিণে। ওখানে পকেট থেকে ডিকশনারি সাইজের একটা প্যাকেট বের করে গার্সিয়া, একটা ব্যাঙ্কের নাইট

ডিপোজিট বক্সের পট দিয়ে গলিয়ে দেয় ওটা। তারপর গার্ড ছাড়া অন্য দু'জনকে বিদেয় করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। গাড়ি চালায় গার্ড। অর্থাৎ লোকটা তার বডিগার্ড।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রানা এই ক'দিনে। গার্সিয়ার যারা খদ্দের, তারা প্রায় প্রত্যেকেই শোফার চালিত লিমুজিনে আসে। ছোট-মোট গাড়ি তেমন একটা আসে না। অর্থাৎ তার কারবার সব পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে। আরেক ধরনের লোকও আসা যাওয়া করে ওর দোকানে। প্রত্যেকে তারা তরুণ, বডি বিল্ডার। পরনে থাকে দামী কাপড়ের কনজারভেটিভ সুট, হাতে কালো ব্রিফকেস।

বাঁ হাতের কব্জির সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে আটকে রাখা থাকে ব্রিফকেস। একেকদিন একেক জন আসে তারা। কোন সঠিক সময় নেই, সকালে দুপুরে বিকেলে যে কোন সময় এসে হাজির হয়। তবে রোজ একজনের বেশি আসে না। রানা ধরে নিয়েছে ওরা রবার্টো গার্সিয়ার সেলসম্যান, অথবা হোলসেল জুয়েলারি মার্চেন্টের কুরিয়ার। অর্ডার মাফিক তৈরি মাল ক্রেতার বাসায় পৌঁছে দিতে যায়, নয়তো আর কিছু।

তবে লোকগুলো যা-ই হোক, এক-দেড় ঘণ্টার বেশি ভেতরে থাকে না। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে আরও দু'দিন দোকানটার ওপর নজর রাখল রানা। আট দিনের দিন সকাল এগারোটার দিকে হাজির হলো নাদিরা রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে।

'সেনিয়র গার্সিয়া?' ওর প্রশ্নের উত্তরে বলল এক সেলসম্যান। 'উনি এ মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন।'

'আমি ওঁর জন্যে অপেক্ষা করতে চাই।'

'নিশ্চই, বসুন,' একটা চেয়ার ইঙ্গিত করল সে।

বসে পড়ল নাদিরা। এই সময় আরেক মহিলা খদ্দের ঢুকল

ভেতরে। ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে সেদিকে এগোল যুবক। চারদিকে ভাল করে নজর বোলাবার চমৎকার একটা সুযোগ জুটে গেল নাদিরার।

পিছনদিকের ভল্ট রুমের মুখোমুখি বসেছে ও। দরজাটা বন্ধ এ মুহূর্তে। গার্সিয়া লোকটা হয়তো ভেতরে আছে। নিজের চারদিকে নজর দিল নাদিরা। দোকানটা লম্বায় ষাট ফুট, পাশে ত্রিশ ফুট মত হবে, অনুমান করল ও। গেটের গার্ড এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ রাস্তায়। ছয়জন সেলসম্যানের সবাই ব্যস্ত খদ্দের সামলাতে।

বেশ নিচু গলায় কথা বলছে খদ্দের-কর্মচারী। শো-কেসের পাইডিং ডোর খুলে এটা-ওটা বের করছে সেলসম্যানরা, বিন্দুমাত্র শব্দ হচ্ছে না। ফ্লোরে জুতোর ঠুক্ ঠাক্ নেই, পুরু কার্পেট শুষে নিচ্ছে সব আওয়াজ। বাইরের কোন আওয়াজও আসছে না। সুনসান পরিবেশ।

সেলসম্যানদের দিকে নজর দিল এবার নাদিরা। লোকগুলো সবাই সমান দীর্ঘ। স্বাস্থ্যও একইরকম। নেভি ব্লু ব্লেজার আর গ্রে ফ্লানেল প্যাকসে একইরকম লাগছে ওদের দেখতে। নাদিরার মনে হলো, ওদের চেহারায় অশুভ কি যেন একটা আছে। অভিব্যক্তিহীন, কঠোর। দৃষ্টি সতর্ক। দম দেয়া পুতুলের মত কাজ করে চলেছে। হাঁটা চলায় চটপটে।

পিছনের দরজা খুলে যেতে মনোযোগ হারিয়ে ফেলল নাদিরা। ঘুরে তাকাল। ভল্ট রুম থেকে বেরিয়ে এল গার্সিয়া ও আরেক যুবক, তার বাঁ হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো একটা ব্রিফকেস। এদিকে তাকাল না গার্সিয়া, যুবককে নিয়ে সরাসরি প্রবেশ পথের দিকে এগোল। নিচু গলায় কথা বলছে।

যুবক বেরিয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। এদিক ওদিক

একবারও না তাকিয়ে সরাসরি এসে দাঁড়াল ওর সামনে। তাজ্জব হয়ে গেল নাদিরা লোকটা ওর আসার খবর কি করে পেল ভেবে। যে সেলসম্যান ওকে বসিয়েছে এখানে, সে এখনও খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। তাহলে? ব্যাপারটা ভাবনায় ফেলে দিল।

'আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হলো বলে খুব দুঃখিত আমি, ম্যাম,' অমায়িক হেসে বলল গার্সিয়া। 'ঘড়িটা নিয়ে এসেছেন নিশ্চই?'

চেষ্টা করেও চেহারায় ফুটে ওঠা বিস্ময় গোপন করতে পারল না নাদিরা। দ্বিতীয় দফা লোকটা ওকে দেখেছে সাত আটদিন আগে। ও কেন এসেছে, মনে করতে এক সেকেণ্ড সময়ও লাগল না তার!

ব্যাপার টের পেয়ে হাসিটা আরও প্রশস্ত হলো গার্সিয়ার। 'বলেছি না, কোন মুখ একবার দেখলে জীবনেও ভুলি না আমি? বিশেষ করে সে যদি আপনার মত অপূর্ব সুন্দরী হয়!'

হাত ব্যাগ থেকে একটা পুরানো সোনার হাত ঘড়ি বের করল নাদিরা। মুখে লজ্জা পাওয়া হাসি। বেশ ভারি জিনিসটা। 'এই যে।'

হাতের তালুতে ওটা নাচাল খানিক গার্সিয়া। 'ভেতরে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি?' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে কাঁধের ওপর দিয়ে ভল্ট রুমের বন্ধ দরজা দেখাল সে।

'অবশ্যই।'

'আপনি বসুন, প্লীজ।' ঢুকে পড়ল লোকটা ভল্ট রুমে, লাগিয়ে দিল দরজা।

বসে আবার চারদিক নজর বোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাদিরা। জিনিসটা চোখে আগেও পড়েছে, আবারও দেখল ভাল করে। ওর বাঁ দিকে প্রায় পুরো দেয়াল জোড়া বিশাল এক আয়না। কি ওটা?

ওয়ান ওয়ে উইণ্ডো? ওপাশ থেকে এপাশের সব দেখা যায়? ওর আচরণ কি লক্ষ করছে গার্সিয়া আড়ালে বসে? অস্বস্তিতে পড়ে গেল নাদিরা। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল গার্সিয়া। ঘড়িটা দোলাচ্ছে হাতে। 'দারুণ জিনিস। এটার ন্যায্য দাম হয় পাঁচশো, মিথ্যে বলব না আপনাকে। যদি এই দামে বেচতে রাজি থাকেন আপনি···।'

'আমি রাজি।'

'একসেলেন্ট। আসুন আমার সঙ্গে।'

ক্যাশ থেকে দশটা পঞ্চাশ ডলারের নোট বের করে ওর হাতে তুলে দিল গার্সিয়া। তারপর একটা মানি রিসিপ্টে ঘড়িটার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখে তাতে ওর সই করিয়ে নিল। নাম-ঠিকানা লেখার প্রয়োজন হলে ছদ্ম নাম-পরিচয় দেবে কি না, আসার আগে ভেবেছিল একবার নাদিরা। কিন্তু মাসুদ রানা বাতিল করে দিয়েছে সে আইডিয়া। বিপদ হতে পারে তাতে। গার্সিয়া যদি ওর আইডেন্টিফিকেশন চেয়ে বসে, ঝামেলা হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইডেন্টিফিকেশন চাইল না লোকটা।

এরপর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে নাদিরাকে। হ্যাণ্ডশেক করল। নাদিরার মনে হলো গার্সিয়া বেশি সময় নিচ্ছে কাজটা করতে গিয়ে। ও মুঠি ছেড়ে দেয়ার পরও নিজের মুঠি খোলেনি ইচ্ছেকৃতভাবেই।

ওর মুখে ঘটনা বিস্তারিত শুনল মাসুদ রানা। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। মনে হলো কোন ভাবনায় পড়ে গেছে।

'কি হলো? কোথাও কোন ভুল করে ফেলেছি?'

'না। তবে দুটো বিষয় ভাবাচ্ছে আমাকে।'

'কি?'

'এক. লোকটা তোমার আইডেন্টিফিকেশন চায়নি।'

কপাল কোঁচকাল মেয়েটি। 'তাতে কি?'

'কি করে সে নিশ্চিত হলো যে জিনিসটা তোমারই?'

'বুঝলাম না।' কুঞ্চন আরও বাড়ল তার।

'জিনিসটা চোরাই মালও তো হতে পারত।'

'কি যা তা বকছ! আমাকে দেখে কি চোর মনে হয়?'

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। 'আমি চোর না ডাকাত, লেখা আছে আমার গায়ে? না কারও থাকে?'

'ওহ্! কামন, রানা। আমি মিস্ক পরে···'

'ওটাও তো চোরাই হতে পারে। তা-ও নয়, আমি আসলে অন্য কথা ভাবছি। রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের মত নামকরা জুয়েলারি বিক্রেতা কেন পুরনো জিনিস কেনা-বেচা করবে? ব্যাপারটা বেখাপ্পা লাগছে আমার।'

'হয়তো ওসব জমানো লোকটার হবি। হতে পারে না?'

চুপ করে গালে হাত বোলাতে লাগল মাসুদ রানা।

'জিনিসটার অ্যান্টিক ভ্যালুও তো কম নয়,' আবার বলল নাদিরা।

'তাই বলে পাঁচশো ডলার? একটু বেশি হয়ে গেল না?'

'হ্যাঁ···,' আমতা আমতা করতে লাগল ও। 'দাম একটু বেশিই দিয়ে ফেলেছে লোকটা।'

'সেটাই তো প্রশ্ন, বেশি কেন দেবে? পুরনো জিনিস কেনা-বেচা যখন করে সে, কোনটার কি দাম হতে পারে, অবশ্যই তার জানার কথা। কাজেই বেশি কেন দেবে?'

আরও আছে। মাফিয়ার ডনের ছেলে, ব্যবসা যত বড়ই হোক, সারাক্ষণ দোকান আগলে বসে থাকবে কর্মচারীর মত, ব্যাপারটা একেবারেই বেমানান। ব্যাটা নড়েই না দোকান ছেড়ে,

কেন? আর কোন কাজ নেই নাকি গার্সিয়ার? শুধুই গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের ব্যবসা? উঁহুঁ! মানায় না।'

খানিক ভাবল নাদিরা প্রশ্নটা নিয়ে। তারপর মাথা দোলাল। 'কি জানি!'

দু'দিন পরের কথা।

সন্ধে পাঁচটা পঁচিশ। অ্যাভিনিউ ফিফটি ফিফথ্। দূর থেকে গার্সিয়া এবং তার সঙ্গীদের বেরিয়ে আসতে দেখে প্যাসেঞ্জারস ডোর মেলে ধরল রানা। 'জলদি যাও। বেরিয়ে পড়েছে।'

গাড়ি থেকে নামল নাদিরা। রানার দিকে তাকিয়ে এক টুকরো আড়ষ্ট হাসি দিল। তারপর পা বাড়াল রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের দিকে। ঠিক সময়মতই বেরিয়েছিল ও গাড়ি থেকে। অ্যালার্ম সুইচ টিপে নিজের গাড়িতে উঠতে যাবে গার্সিয়া, তখনই নাদিরার ওপর চোখ পড়ল তার। মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে সে। অন্যমনস্ক।

'আরে! মিস্ নাদিরা?' খুশি খুশি গলায় বলল লোকটা। সঙ্গীদের প্রত্যেকে ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'আপনি? কোথায় চললেন একা একা?'

থেমে দাঁড়িয়ে গার্সিয়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকল নাদিরা। যেন চিনতে পারেনি।

অবাক হলো মানুষটা। 'আমি গার্সিয়া! রবার্টো গার্সিয়া!'

মৃদু হাসি ফুটল নাদিরার ঠোঁটের কোণে। 'দুঃখিত। চিনতে পারিনি।'

'ব্যাপার কি?' একটু যেন হোঁচট খেলো গার্সিয়ার হাসি। 'খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে! অবশ্য প্রশ্ন করা যদি অনধিকার চর্চা না হয়ে...'

'না, না, তেমন কিছু নয়।'

'ওদিকে কোথায় চললেন?'

'পার্ক অ্যাভিনিউ।'

'রিয়েলি? আমিও যাচ্ছি ওদিকে। চলুন না, পৌঁছে দিই আপনাকে?' পেভমেন্ট ঘেঁষে অপেক্ষমাণ নিজের প্রকাণ্ড লিমুজিন দেখাল গার্সিয়া।

ইতস্তত করতে লাগল নাদিরা। 'আপনারা... আপনাদের...।'

'কিচ্ছু অসুবিধে নেই, আসুন। উঠুন। এরা সবাই যাচ্ছে না আমার সঙ্গে।' পিছনের দরজা মেলে ধরল সে। সঙ্গী দুই সেলসম্যানের উদ্দেশে ইটালিয়ানে দ্রুত কণ্ঠে কিছু বলল। খানিক দ্বিধায় ভুগল ওরা, তারপর ট্যাক্সি চেপে চলে গেল।

মাঝে ভদ্র দূরত্ব রেখে পিছনের সীটে বসল নাদিরা ও রবার্টো গার্সিয়া। গাড়ি স্টার্ট দিল দোকানের গার্ড-কাম-গার্সিয়ার বডিগার্ড-কাম-শোফার।

'হঠাৎ করে আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি,' বলল ইটালিয়ান। 'মিস্টার কার্নি কেমন আছেন?'

চেহারা গম্ভীর করে তুলল নাদিরা। 'ঠিক জানি না। দেখা নেই বেশ কয়েকদিন।'

'বুঝেছি,' হেসে উঠল লোকটা। 'নিশ্চই ঝগড়া করেছেন দু'জনে?'

উত্তর দিল না ও। তবে মুখের ভাবে বুঝিয়ে দিল তার ধারণাই ঠিক।

'দুঃখিত। না জেনে আপনাকে কষ্ট দিলাম বোধ হয়।'

'না। ঠিক আছে।' এই প্রথম মানুষটাকে ভাল করে লক্ষ করল নাদিরা। গরিলার মত স্বাস্থ্য তার, বুকটা পঞ্চাশ গ্যালনি ব্যারেলের মত। চেহারা আকর্ষণীয়, মোটামুটি। তবে সারা মুখে

অসংখ্য ছোট-বড় দাগ কাটাচেরার। দৃঢ় চোয়াল। ঝকঝকে সাদা সুগঠিত দাঁত। আন্তরিক হাসি যখন হাসে, মন্দ লাগে না দেখতে।

'...একটা বার আছে। দু'চার মিনিট জিরিয়ে নেয়া আর কি। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

সচকিত হলো নাদিরা। 'দুঃখিত, কিছু বলছিলেন?'

গভীর দৃষ্টিতে দেখল ওকে গার্সিয়া। 'পার্ক অ্যাভিনিউতে একটা ফান বার আছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, ওখানে বসতে চাই কয়েক মিনিটের জন্যে।'

একটু চিন্তার ভান করে রাজি হয়ে গেল নাদিরা। 'ঠিক আছে। তবে বেশিক্ষণ বসতে পারব না।'

'ধন্যবাদ।'

প্রথমে সঙ্গে আনা প্যাকেটটা ব্যাঙ্কের নাইট ডিপোজিটে ঢোকাল গার্সিয়া, তারপর একটা বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে নিয়ে এল নাদিরাকে। খুদে একটা কেবিনে বসল মুখোমুখি। চোখের কোণ দিয়ে নাদিরা লক্ষ করেছে, গার্সিয়ার শোফারও এসেছে পিছন পিছন। কেবিনের দরজার চার হাতের মধ্যেই বসেছে সে। নজর রাখছে চারদিক।

'বলুন, কি খাবেন?'

'সফট ড্রিঙ্ক।'

'ওহ্!' একটা ভুরু তুলল গার্সিয়া। বেয়ারা ডেকে নিজের জন্যে মার্টিনি এবং নাদিরার জন্যে ঠাণ্ডা কোকের অর্ডার দিল।

লোকটা যে একজন হেভি ড্রিঙ্কার, ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে খুব একটা সময় লাগল না নাদিরার। ওর কোক অর্ধেকও শেষ হয়নি, অথচ লোকটা এরই মধ্যে তৃতীয় গ্লাসে সিপ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপরও ভেতরে মাতলামির সামান্যতম আভাস নেই। যেন পানি খাচ্ছে। তবে অল্প হলেও টের পাওয়া যায়,

একটু একটু করে বাচাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে সে।

এটা-ওটা নানান প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প করে যাচ্ছে। বেশ গল্পবাজ মানুষ, সমান ওস্তাদ চুট্‌কি বলায়। খেয়াল রেখেছে নাদিরা, লোকটার তরফ থেকে কোন নোংরা ইঙ্গিত আসে কি না। কিন্তু না, সেরকম কোন আভাস নেই। টেবিলের তলায় ইচ্ছে করে হাঁটুতে হাঁটুতে ঘষা লাগানো, কোন কারণ তৈরি করে হাত স্পর্শ করা, বা দুর্ঘটনাবশত হুমড়ি খেয়ে গায়ের ওপর পড়া, কিচ্ছু না। জাতে মাতাল হলেও ব্যাটা তালে ঠিক আছে।

আরও কয়েক মিনিট সময় নিল নাদিরা, তারপর তার ব্যবসার প্রসঙ্গ তুলল আলগোছে। মনে হলো যেন খুশিই হয়েছে লোকটা। প্রফেসরী ভঙ্গীতে জ্ঞানদান করতে শুরু করল ওকে। কি করে ডায়মণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, কোথায় ডায়মণ্ড কাটিঙের মূল সেন্টার, ডায়মণ্ড ব্যবসায়ে ইসরাইলীদের গুরুত্ব কতখানি, স্যাফায়ার, রুবি আর এমারেল্ডের তুলনায় ডায়মণ্ডে লাভ কত পার্সেন্ট বেশি ইত্যাদি একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল গার্সিয়া।

'ডায়মণ্ডের ওপর আপনার আগ্রহ খুব বেশি মনে হচ্ছে!'

'উঁম...ওয়েল, হ্যাঁ। তা বলতে পারেন। ওই জিনিসের অ্যান্টিক ভ্যালু বেশ চড়া। ঐতিহাসিক মূল্যও আছে ডায়মণ্ডের। এটা অমুক দেশের রানীর, ওটা অমুক ডাচেসের বা হয়তো কোন আরব শেখের স্ত্রীর,' একটা চোখ টিপল গার্সিয়া। 'সে সব সংগ্রহের মজাই আলাদা। আপনি যদি সংগ্রাহক না হন, বললেও বুঝবেন না। ডায়মণ্ডের কাটিং, রং, ওজন, ব্রিলিয়ান্স ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আছে, যা চিনতে সামান্য ভুল হলেই বারোটা বেজে যাবে।'

চতুর্থ রাউণ্ড শুরু করল ইটালিয়ান। 'তবে ইনডিভিজ্যুয়াল স্টোনও মন্দ নয়। ওগুলো হয় খুব ছোট, সহজেই লুকিয়ে রাখা

যায়। নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা কম ঘামালেও চলে। হয়তো তড়িঘড়ি কোন কারণে দেশত্যাগ করতে হলো আপনাকে, ওগুলো সঙ্গে নিতে কোন বেগ পেতে হবে না। এখন আবার নতুন কায়দা শুরু হয়েছে। লাখ লাখ ডলার দামের পাথর সোনা বা রূপোর কম দামী চেইনের সঙ্গে জুড়ে বিক্রি হচ্ছে। দেখলে কেউ কল্পনাই করতে পারবে না ওরকম সস্তা চেইনে কেউ এত দামী পাথর সেট করতে পারে। এই তো, গতকালই নাম করা এক নায়িকার কাছে এরকম একটা পেনড্যান্ট বিক্রি করেছি আমি। তার নাম অবশ্য বলব না, বিজনেস সিক্রেট। চেইনের দাম পড়েছে মাত্র তিনশো, সঙ্গে সেট করা ডায়মণ্ডের দাম দুই মিলিয়ন।'

'মাই গড!'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এতে লাভ কি?'

'লাভ একটাই, চোরকে নিরুৎসাহিত করা। একটা ড্যাম চীপ চেইনে অমন মূল্যবান পাথর সেট করা হয়েছে, তা বোঝার ক্ষমতা ওদের নেই। অবশ্য সে যদি সত্যি চোর হয়ে থাকে। পাথর বিশেষজ্ঞ হলে অন্য কথা।' থামল গার্সিয়া। বুঝল, ওর ভাষণ শুনছে না মেয়েটি, অন্য কোন ভাবনায় ডুবে আছে সে। 'আপনার মনটা বোধ হয় ভাল নেই আজ,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল ইটালিয়ান।

এবারও সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেল নাদিরা। 'যদি কিছু মনে না করেন, এবার উঠব আমি।'

'নিশ্চই নিশ্চই! কোথায় যাবেন, বলেন তো পৌঁছে দিয়ে আসি?'

'না, ধন্যবাদ। একাই যেতে পারব আমি।'

'অল্ রাইট।'

পাঁচ

ম্যানহাটনের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ সামনে বিছিয়ে নিয়ে বসে আছে মাসুদ রানা। তার ওপর সাদা কাগজে লাল কালিতে আরেকটা হাতে আঁকা ম্যাপ–ইস্ট ফিফটি ফিফথ্ স্ট্রীটের, নিজ হাতে এঁকেছে রানা।

ব্লকের সবকিছু বিস্তারিত দেখিয়েছে ও এটায়। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড, বাস স্টপেজ, নো-পার্কিং জোন, নির্মাণাধীন একটা বহুতল ভবন, ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্ট, দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। অনেক সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপটা পর্যবেক্ষণ করল মাসুদ রানা। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট মনে। আরেকটা কাগজ টেনে নিয়ে শিডিউল তৈরি করতে বসল এবার।

কখন শুরু করবে, এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ও। সেটা অবশ্য পরে করলেও চলবে। তবে পুরো অপারেশন যেহেতু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে হতে হবে, তাই শিডিউল একটা এখনই না করলেই নয়। জায়গা মত পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, কোথায় গাড়ি দাঁড় করাতে হবে, কাজ সারতে কত সময় ব্যয় করা যাবে, তারপর পিঠটান ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল মাসুদ রানা।

চার ভাগে ভাগ করল ও অপারেশনটাকে। প্রিপারেশন, অ্যাডভান্স, অ্যাসল্ট এবং উইথড্রল। সকাল দশটায় অ্যাডভান্স ধরে গাড়ি পার্ক করার সময়, গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে পৌঁছতে

স্বাভাবিকভাবে যে সময় লাগে, তার সঙ্গে ট্রাফিক জ্যাম বা আর কোন কারণে কিছুটা দেরি হয়ে যেতে পারে ধরে আরও পাঁচ মিনিট যোগ করে সময় নির্ধারণ করল ও। বাকি থাকল অ্যাসল্ট ও উইথড্রল। অ্যাসল্টের জন্যে চল্লিশ মিনিট ধরে নিল রানা। তারপর···।

রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স।

কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল নাদিরা। এক সেলসম্যানের সঙ্গে কিছু আলাপ করছিল গার্সিয়া, ওকে দেখে বিস্মিত হলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে। 'ওয়েলকাম!' বলেই চোখ কোঁচকাল সে। 'আপনার মুখ শুকনো কেন লাগছে? কোন সমস্যা?'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মেয়েটি। 'বসতে পারি?'

'এ কোন প্রশ্ন হলো? একশোবার বসতে পারেন। আসুন।' কাস্টমারদের জন্যে নির্ধারিত স্থানে তাকে নিয়ে বসাল লোকটা সাদরে। নিজেও বসল পাশে। 'বলুন, কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

হাত ব্যাগ থেকে কয়েকদিন আগে কেনা এনগেজমেন্ট রিংটা বের করল নাদিরা। 'এটা বিক্রি করব আমি।'

'সে কি!' চমকে উঠল গার্সিয়া। 'কেন? এটা তো···'

'ওর কোন স্মৃতি রাখতে চাই না আমি,' গলায় কাঠিন্য ফুটিয়ে বলল নাদিরা। 'সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে আমাদের।'

কয়েক মুহূর্ত থ মেরে থাকল গার্সিয়া। চোখ বড় বড় করে নাদিরাকে দেখল। 'শুনে খুব দুঃখ পেলাম। সেদিনই বুঝেছিলাম, কিছু একটা ঘটেছে আপনাদের মধ্যে। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে কল্পনাই করিনি আমি। আপনি···আপনি শিওর? বিক্রি

করবেনই?'

'মোর দ্যান শিওর। প্লীজ! এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করবেন না।' মুখের ভাব দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে ফেলবে নাদিরা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল গার্সিয়া। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! সরি, আর কোন প্রশ্ন করব না আমি।' হাত পাতল সে। 'দিন ওটা।' জিনিসটা এক সেলসম্যানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিছু বলল লোকটা নিজের ভাষায়। তারপর নাদিরার কাছে ক্ষমা চেয়ে পিছনের রূমে গিয়ে ঢুকল। এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল টাকা নিয়ে। 'গুণে নিন। পুরো সাড়ে চার হাজার আছে।'

'প্রয়োজন নেই।' টাকাটা ব্যাগে রেখে আসন ছাড়ল নাদিরা। 'চলি। ধন্যবাদ।'

'সে কি! এখনই?'

'কাজ আছে,' ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিল নাদিরা।

'নিশ্চই আছে। কিন্তু তাই বলে এখনই যাবেন? অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যান।' বলতে বলতে কোট গায়ে চাপাল লোকটা। 'চলুন, রাস্তার ওপারে একটা রেস্তোরাঁ আছে, ওখানে গিয়ে বসা যাক।' নাদিরাকে আর কথা বাড়াবার সুযোগ দিল না সে, প্রায় জোর করেই নিয়ে এল রাস্তার এপারে। অন্তত গার্সিয়ার সেরকমই ধারণা।

রাস্তার দিকের জানালা ঘেঁষা একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। 'বলুন, কফির আগে কি?'

'আর কিছু না। শুধু কফি, প্লীজ!'

পর পর দু'কাপ করে কফি খেল ওরা। এর মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে গার্সিয়া দু'জনের আসর। নানান চটুল গল্পে মনের 'বোঝা হালকা' করে দিয়েছে নাদিরার অনেকটা। এক ঘণ্টা কাটাল ওরা রেস্তোরাঁয়। এর মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে

দু'জনে। ওঠার আগে নাদিরার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল গার্সিয়া, আগামী বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে ডিনার করবে সে।

রানা এজেন্সি।

গভীর রাত। ভেতরের এক কক্ষে জরুরি মীটিং বসেছে। তাতে উপস্থিত আছে মাসুদ রানা, নাদিরা, এজেন্সির নিউ ইয়র্ক চীফ শওকত, এবং রানার বাছাই করা পাঁচজন এজেন্ট। মুত্তাকিম বিল্লাহ, ফয়েজ আহমেদ, সবুজ, বিপুল ও হাসান। আধ ঘণ্টা আগে সবার অলক্ষে, পিছনের গেট দিয়ে গোপনে এসেছে রানা ও নাদিরা।

শেষ পাঁচজনের প্রথমজন ছয় ফুট দু'ইঞ্চি দীর্ঘ ছোটখাট এক দানব। বয়স বত্রিশ। মুখটা লম্বাটে, চেহারা হাবাগোবা গোছের। অসুরের শক্তি বিল্লাহর দেহে। কারাতের ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার সে। শূটিঙেও সমান ওস্তাদ। পরিস্থিতি যা-ই হোক, ভয় কি বস্তু জানে না মুত্তাকিম বিল্লাহ।

ফয়েজ আহমেদ ঠিক তার উল্টো। দৈর্ঘ্য বড়জোর পাঁচ ফুট ছয়। ঘাটতিটা প্রস্থে পুষিয়ে দিয়েছে প্রকৃতি। বুকের ছাতি পুরো বেয়াল্লিশ ইঞ্চি। ঘন কালো লোমে ভর্তি ফয়েজের সারা শরীর। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মুখ। বিজেএমসির হেভিওয়েট বক্সার ছিল এক সময়। গলার স্বর চিকন, প্রায় মেয়েলী। গল্পবাজ মানুষ। বয়স পঁয়ত্রিশ। অন্য তিনজন কম বয়সী, বিশ থেকে বাইশের মধ্যে। হালকা-পাতলা গড়ন প্রত্যেকের। হাসান লাজুক চেহারার ছেলে, কথা বলে কম। কাজে ওস্তাদ এবং দুঃসাহসী। বিপুল করিৎকর্মা। এখানকার অপরাধ জগতের সবাইকে মোটামুটি চেনে সে। নাম শুনেই বলে দিতে পারে কে কোন ক্ষেত্রে হাফেজ। সবুজ নির্ভীক, 'কথা কম, কাজ বেশি' নীতিতে বিশ্বাসী। তুলনামূলক কম বয়সী

বলে এদের তিনটির গলায় গলায় সম্পর্ক। ফয়েজ ঠাট্টা করে নাম রেখেছে এদের ত্রিরত্ন। চীফ শওকত মাঝারি গড়নের মানুষ। চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত। গালে চাপদাড়ি। পুরু কাঁচের চশমা পরে। ইন্টেলেকচুয়ালদের মত চেহারা। বয়স আটাশ।

একে নিজের অপারেশন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করেনি মাসুদ রানা। তবু মীটিঙে থাকতে বলেছে, কারণ লোকাল চীফ হিসেবে পুরোটা তার জানা প্রয়োজন। হোক তা আনঅফিশিয়াল।

আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিল মাসুদ রানা। শেখ জাবের আল উবায়েদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর হবি, উপসাগরীয় যুদ্ধের পটভূমিতে লোট্টি ও মারা চড়ে তাঁর পালাবার প্রচেষ্টা, জাহাজ আক্রমণ এবং সবশেষে তাঁর মৃত্যু ও উধাও হয়ে যাওয়া রত্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে জানাল রানা ওদের। প্রতিকার হিসেবে কি করতে চায় সেটাও বলল।

এক সময় বক্তৃতা শেষ হলো মাসুদ রানার। নীরবতা পাথরের মত চেপে বসল রূমের ভেতর। দীর্ঘ সময় কথা বলল না কেউ। সবাই চুপ।

'কারা করেছে এ কাজ?' প্রথম প্রশ্ন করল দানব, মুত্তাকিম বিল্লাহ।

'মাফিয়া।'

'মাফিয়া!' বিস্ময় প্রকাশ করল গরিলা, ফয়েজ আহমেদ।

'হ্যাঁ। পাওলো গার্সিয়ার সুপুত্র রবার্টো গার্সিয়া ঘটিয়েছে এ কাজ। নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

সোজা হয়ে গেল হাফেজ বিপুল। 'ডন গার্সিয়া?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'রবার্টো গার্সিয়া, মানে ইস্ট ফিফটি ফিফথ স্ট্রীটে যার জুয়েলারি শপ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা!' ঘোঁৎ করে উঠল বিল্লাহ।

কি ভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে লোকটা, জানাল রানা ওদের। ঘটনাটা কি ভাবে ফাঁস হয়েছে, ও জানতে পেরেছে, তাও ব্যাখ্যা করল। সবশেষে যোগ করল, 'ওগুলোর কিছু কিছু এর মধ্যে বিক্রি করে ফেলেছে গার্সিয়া। বাকিগুলো আছে তার দোকানের ভল্টে। জিনিসগুলো উদ্ধার করতে হবে যে কোন মূল্যে।'

নীরবে নাদিরার দিকে হাত বাড়াল মাসুদ রানা। হাতব্যাগ থেকে একটা নেকলেস আর এক জোড়া ইয়ার রিঙ বের করল মেয়েটি, তুলে দিল ওর হাতে। 'শেখ জাবেরের সংগ্রহের মধ্যে এই সেটটাও ছিল। তাঁর হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পর এক বান্ধবীর চাপাচাপিতে পড়ে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে যেতে হয়েছিল নাদিরাকে, বান্ধবীর জন্যে নেকলেস আর ইয়ার রিঙের একটা সেট পছন্দ করে দেয়ার জন্যে।

'তখনই জানা যায় যে ওই দোকানেই রয়েছে শেখ জাবেরের ছিনতাই হওয়া অমূল্য সংগ্রহের অনেকগুলো। এই সেট তার মধ্যে একটা।' ওই দোকান থেকেই কেনা হয়েছে। সেটটা প্রথমে মুত্তাকিম বিল্লাহর হাতে তুলে দিল রানা। 'উল্টোদিকে খুব সূক্ষ্ম একটা ঘষার দাগ আছে দেখো। ভাল করে না তাকালে বোঝা যায় না।'

নেকলেসের মাঝামাঝি জায়গায়, যেখান থেকে বড় এক খণ্ড আঠারো ক্যারেটের নাশপাতি আকারের ডায়মণ্ড ঝুলছে, তার ঠিক পিছনেই চেইনের গায়ে একটা দাগ দেখতে পেল বিল্লাহ। ঘষাঘষির কোন চিহ্ন যাতে না থাকে, সে জন্যে চেষ্টা করা হয়েছে বোঝা যায়। তারপরও সামান্য দাগ রয়েই গেছে। অবশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকালে ঠাহর করা মুশকিল।

মাথা দোলাল বিল্লাহ। 'দাগটা কিসের, মাসুদ ভাই?' জিনিস দুটো ফয়েজের হাতে দিল সে। এক পলক দেখে ওটা শওকতের হাতে তুলে দিল ফয়েজ।

'নিজের প্রতিটি সংগ্রহে বিশেষ এক ধরনের অমোচনীয় কালি দিয়ে সীল বসিয়ে দিতেন শেখ জাবের, তার দাগ। দাগটা তুলে ফেলা হয়েছে।'

'হুঁম!' বলল ফয়েজ।

'নানার সংগ্রহের প্রায় সব অলঙ্কার সেটই চেনা আছে নাদিরার। বান্ধবীর জন্যে যেদিন ওই দোকানে গিয়েছিল, সেদিন এরকম মোট নয়টা সেট দেখেছে ও। প্রত্যেকটার সীল তুলে ফেলা হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমিও গিয়েছিলাম রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে, আমিও দেখেছি এক সেট।

'প্রশ্ন উঠতে পারে প্রমাণ যখন পাওয়াই গেছে, পুলিসকে কেন জানানো হচ্ছে না? উত্তরটাও সোজা। এখানকার মাফিয়া পরিবারগুলোর মধ্যে গার্সিয়া পরিবার অত্যন্ত প্রভাবশালী। ডন পাওলো গার্সিয়ার ব্যক্তিগত প্রভাবও প্রচুর। পুলিস, এফবিআই নিয়মিত পয়সা পায় তার কাছ থেকে। অতএব ওদের জানানো হলে খবরটা লিক আউট হতে পারে, জেনে যেতে পারে রবার্টো। সে ক্ষেত্রে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে সে। হানা দিলে পাওয়া যাবে না কিছুই। বরং মাঝখান থেকে নাদিরার প্রাণের নিরাপত্তা থাকবে না কোন। কাজেই...'

'চোরের ওপর বাটপারি করতে হবে,' বক্তব্য শেষ করল হেভিওয়েট বক্সার।

'ঠিক। ওই দোকানের ভল্ট খালি করে ফেলতে চাই আমি।'

'গুড!' সন্তুষ্ট দেখাল বিল্লাহকে। কাজটা পছন্দ হয়েছে ওর।

'তবে এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা,' বলল মাসুদ রানা।

'অফিশিয়াল কোন অ্যাসাইনমেন্ট নয় এটা। আগেই বলেছি ভদ্রলোক আমার বসের বন্ধু ছিলেন, যে কারণে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করার দায়িত্ব আমি কাঁধে নিয়েছি। আপাতদৃষ্টিতে সিরিয়াস মনে না হলেও পরে সিরিয়াস হয়ে উঠতে পারে ব্যাপারটা। ঘটে যেতে পারে অনেক কিছু। কাজেই তোমরা কেউ যদি জড়িত হতে না চাও এর সঙ্গে, কোন অসুবিধে নেই। সরে পড়তে পারো। বাধ্যবাধকতা নেই কোন রকম।'

পুরো এক মিনিট কেটে গেল নীরবে। কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে মুখ খুলল সবুজ, 'কখন চড়াও হচ্ছি আমরা গার্সিয়ার বাচ্চার ঘাড়ে?'

'দেরি করা ঠিক হবে না তাহলে,' বলল ফয়েজ। 'মাসুদ ভাই, প্ল্যান-ট্যান করে ফেলা ভাল।'

মুত্তাকিম কোন কথা বলছে না দেখে তার দিকে তাকাল রানা। নিজের মুখের ওপর বসের সন্ধানী দৃষ্টি অনুভব করল সে। তবু মুখ তুলল না। নেকলেসটা সবুজের হাত ঘুরে তার কাছে ফিরে এসেছে আবার। ওটা দোলাতে দোলাতে বলল সে, 'অনেকদিন ধরে প্রায় বসে বসে অকাজে বেতন নিচ্ছি, মাসুদ ভাই। হাত-পায়ে শিকড় গজিয়ে যাওয়ার অবস্থা। এইবার মনে হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশন কিছুটা বাড়বে।'

'তোমরা? বিপুল, হাসান?'

'অ্যাকশনের গন্ধ পাচ্ছি আমি, মাসুদ ভাই,' বলল বিপুল। 'রোমাঞ্চ অনুভব করছি।'

'আমিও,' বলল হাসান।

'অল রাইট,' মুচকে হাসল রানা। জানত, পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা নয় এরা কেউ। 'এবার তাহলে প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করা যায়,' বিল্লাহর বাড়ানো হাত থেকে সেটটা নিয়ে নাদিরাকে দিল

মাসুদ রানা। 'গত এক সপ্তা ধরে দোকানটার ওপর চোখ রেখেছি আমি। ওটা কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়, কতজন স্টাফ আছে দোকানের, মোট কথা খুঁটিনাটি সবকিছু সতর্কতার সাথে লক্ষ করেছি। প্রথমে প্ল্যান করেছিলাম সকাল দশটার সময়, ঠিক যখন খোলে ওটা, তখনই অপারেশন শুরু করব। কিন্তু পরে সে ভাবনা বাতিল করে দিয়েছি। ঝুঁকি আছে ওতে। হঠাৎ যদি কোন স্কোয়াড কার হাজির হয়, বা কোন টহল পুলিস এসে পড়ে অথবা যদি দোকান খোলার সাথে সাথেই ঢুকে পড়ে এক দল খদ্দের, বরবাদ হয়ে যাবে সব।

'মানুষ আমরা মাত্র ছয়জন। ভল্ট খালি করা, কর্মচারীদের পাহারা দেয়া, সঙ্গে যদি দুয়েকজন খদ্দের থাকে, তাদেরকে সামাল দেয়া, অসম্ভব। তাই পরে ঠিক করেছি, সকাল ন'টায় শুরু করব আমরা অভিযান।'

'গভীর রাতে...' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সবুজ।

'রাতে কিছু করতে যাওয়া একেবারেই ঠিক হবে না। কারণ এ ধরনের স্টোরের নাইট সিকিউরিটির ব্যবস্থা খুব কঠোর থাকে। সাইলেন্ট অ্যালার্ম থাকে, দোকানের ভেতর হয়তো বাজবে না, বেজে উঠবে পুলিস স্টেশনে অথবা প্রাইভেট কোন সিকিউরিটি এজেন্সির অফিসে। কিছু টের পাওয়ার আগেই বাইরে থেকে ঘেরাও হয়ে যাব আমরা, ধরা পড়ে যাব।'

'তাহলে?' নড়েচড়ে বসল ফয়েজ।

'এমন এক জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি, যার সাহায্যে দিনের বেলাতেই নিশ্চিত সাফল্য আসবে। আসবেই।'

'জিনিস?' গলা সামনে বাড়াল বিল্লাহ ইঞ্চি তিনেক।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'জিনিস। ক্লিনিং ট্রাক।'

বিহ্বল দেখাল সব ক'টা মুখ। 'ক্লিনিং ট্রাক?' বলল সবুজ। 'ওটা কিভাবে সাহায্যে লাগবে আমাদের?'

'ওটাই করবে আসল কাজ। এক নাগাড়ে পাঁচ দিন লক্ষ করেছি আমি, সকাল ঠিক ন'টায় একটা প্রাইভেট ক্লিনিং এজেন্সির গাড়ি এসে দাঁড়ায় গার্সিয়ার দোকানের সামনে। ভ্যাকিউম ক্লিনার, ঝাড়ন ইত্যাদি নিয়ে ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক নামে ওটা থেকে, ভেতরে গিয়ে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সাফ-সুতরো করে।

'গাড়িটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে গার্সিয়া নিজে গেট খুলে ওদের ভেতরে ঢোকায়। এবং লোক দুটো ঢোকামাত্র আবার লাগিয়ে দেয় গেট।'

'রোজ সকালে?' টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসল শওকত। অতি আগ্রহে চকচক করছে দু'চোখ। অন্যদের অবস্থাও একই রকম মনে হলো রানার।

'হ্যাঁ, রোজ সকালে। একদিনও বাদ যেতে দেখিনি।'

'কোন কোম্পানির ট্রাক, মাসুদ ভাই?' বলল সবুজ।

'বনোমো ক্লিনিং সার্ভিস। দোকানের সামনে ডবল পার্ক করে ট্রাকটা। পিছনের পাল্লা খুলে নেমে আসে দুই ক্লিনার। ওদিকে গাড়ির অপেক্ষায় গ্লাস ডোরের ওপাশে নিজে দাঁড়িয়ে থাকে গার্সিয়া। ওদের ভেতরে ঢুকিয়েই আবার লক্ করে দেয় দরজা।'

'ওই ট্রাক হাইজ্যাক করতে হবে!' উল্লসিত হয়ে উঠল মুত্তাকিম। 'ইয়াল্লা! ব্লাড সার্কুলেশন দেখছি এখনই বেড়ে গেছে।'

'দেখো!' সতর্ক চোখে ওকে দেখল হেভিওয়েট, 'আনন্দের ঠেলায় প্রেশার হাই করে বোসো না যেন সময়মত। পালাবার সময় এমনিতেই বোঝা কম থাকবে না, তার ওপর যদি···' দানবকে কটমট করে তাকাতে দেখে থেমে গেল সে। 'দুঃখিত।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, গাড়ির ব্যবস্থা না হয় করা গেল, কিন্তু

ক্লিনার? যতই ইউনিফর্ম পরা হোক, চেহারা দেখলেই তো গার্সিয়া টের পেয়ে যাবে গোলমালটা,' বলল বিল্লাহ।

'না, তা হবে না। সেদিকেও লক্ষ ছিল আমার। ক্লিনারদের চেহারা দেখে না গার্সিয়া, দেখে শুধু ট্রাকটা পার্ক করেছে কি না। ওটাকে দাঁড়াতে দেখলেই গেট খুলে দেয়। আমিও চিন্তা করেছি বিষয়টা নিয়ে। শুধু গাড়িই দেখে সে, তা থেকে কে নামল দেখে না। মনে হয় নিয়মটা অনেক দিন থেকে চলে আসছে বলে একঘেঁয়েমিতে পেয়ে বসেছে লোকটাকে। বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে ওর যে বনোমোর গাড়ি মানেই ওদের রেগুলার ক্রু-রা এসেছে। তাই তেমন পাত্তা দেয় না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা এরকম নিয়মিত হয়ে পড়লে প্রত্যেকে কিছু না কিছু ঢিল দিয়েই থাকে।'

'তাহলে আর চিন্তা কি!' বলল ফয়েজ আহমেদ।

'ক্লিনিং ট্রাকটা মাঝারি আকারের,' বলল রানা, 'একটা ফুটবল টীম অনায়াসে এঁটে যাবে। অর্থাৎ লোক বেশি হলেও ভাবনা নেই। গার্সিয়া যখন টের পাবে তার রেগুলার ক্লিনিং ক্রু-র পরিবর্তে অন্য কেউ এসেছে, তখন দোকানের ভেতরে থাকব আমরা। ভেতরে যদি তখন এক ডজন মানুষও থাকে, অসুবিধে নেই। গেট লকড্, শাটার নামানো, তার ওপর সময়টাও অসময়। খদ্দেররা জানে দোকান ক'টায় খোলে, কাজেই তখন তাদের হাজির হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতএব···প্রায় পুরো এক ঘণ্টা সময় পাব আমরা।'

'এক ঘণ্টা,' বলে মাথা দোলাল মুত্তাকিম। 'ভল্ট তো কিছুই নয়, এর মধ্যে দোকানের ফার্নিচার থেকে শুরু করে ওয়ালপেপার পর্যন্ত গায়েব করে দেয়া সম্ভব।'

'হ্যাঁ। খুব সম্ভব।'

‘কিন্তু ধরুন,’ বলল ফয়েজ, ‘যদি এমন হয় অপরিচিত ক্রু দেখে গেট খুলল না হারামজাদা গার্সিয়া, তখন?’

‘সে সম্ভাবনা নেই। বললাম না, ও কারও চেহারা দেখে না। কেবল দেখে ট্রাকটা পার্ক করল কি না। ওটা পার্ক করার সঙ্গে সঙ্গে গেট আনলক্ করে সে। তারপরও, যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে গার্সিয়া ক্রু-দের দিকে তাকায়, মানলাম তাকায়। কিন্তু কোনদিকে? ওদের চেহারার দিকে?’ এদিক-ওদিক মাথা দোলাল মাসুদ রানা। ‘না। তাকায় ওদের ইউনিফর্মের দিকে। সবাই তাই-ই করে, আগে দেখে ইউনিফর্ম, পরে চেহারা।’

মাথা দোলাল ফয়েজ। মেনে নিয়েছে রানার যুক্তি।

‘তারপর,’ আবার শুরু করল রানা। ‘যেই মুহূর্তে গেট খোলা হবে, ফ্রন্ট সীটে যারা থাকবে ট্রাকের, ঝটপট ঢুকে পড়বে ভেতরে। তাদের ঠিক পিছন পিছন ঢুকবে ব্যাক ক্যারিয়ারের অন্যরা। স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা ফাস্ট হতে হবে আমাদের, ওতেই চলবে।’

‘ক’টায় সাধারণত আসে ওই ট্রাক?’ জানতে চাইল ফয়েজ।

‘ঠিক ন’টায়। রাস্তায় প্রচুর মানুষ থাকে ওই সময়। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কিছুই নেই। তারা দেখবে আমাদের, অবশ্যই। তবে ঠিক আমাদের নয়। বনোমো ক্লিনিং সার্ভিসের কভারলস পরা কয়েকজন ক্লিনিং ক্রু-কে দেখবে। সবার চোখের সামনে দিয়ে রবার্টো গার্সিয়ায় ঢুকব আমরা, সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। কেউ ভাবতেই পারবে না কিছু। ভাববেই বা কেন? রোজই তো একই ব্যাপার ঘটে আসছে ওখানে।

‘কাজেই কোন ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কা নেই। স্বাভাবিক ক্লিনিং ক্রু-দের মত আমাদের হাতেও টুলস্ থাকবে, গারবেজ ব্যাগ থাকবে। ভেতরে সময় পাওয়া যাবে এক ঘণ্টা, প্রচুর সময়।

গার্সিয়া সহ অন্যদের প্রথমেই অস্ত্রের মুখে শুয়ে পড়তে বাধ্য করা হবে, কেউ যাতে নায়ক হওয়ার চেষ্টা না করে সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হবে।

‘কাজ সেরে বেরিয়ে আসার আগে সবাইকে হাত-পা বেঁধে, মুখে রুমাল গুঁজে ফেলে রেখে আসব আমরা। গেটের নিচে বাইরে থেকে রাবারের গোঁজ ঠেসে দেব যাতে অন্তত দু’চার মিনিট সময় ব্যয় হয় দরজা খুলতে। ততক্ষণে ভাগ ভাগ হয়ে দু’দিকে রওনা হয়ে যাব আমরা, একদল ট্রাকে করে, অন্যদল কারে।’

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অন্যদেরও অফার করল। ‘এটা হচ্ছে খসড়া প্ল্যান। তবে···আরও কয়েকদিন সময় লাগবে সবকিছু চূড়ান্ত করতে। এবার বলো, প্ল্যান সম্পর্কে কারও কোন দ্বিমত আছে? অথবা কোন পরামর্শ?’

‘বনোমো ট্রাক না হয় হাইজ্যাক করা গেল,’ বলল সবুজ। ‘কিন্তু ওদের কভারলস্? কিভাবে জোগাড় হবে ওগুলো?’

‘হয়ে যাবে,’ মুচকে হাসল মাসুদ রানা। ‘ওরাই সরবরাহ করবে।’

বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকল সবাই ওর দিকে।

‘আগে ওদের অফিসটা কোথায় খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমি বলে দেব কিভাবে জোগাড় করতে হবে বনোমোর ইউনিফর্ম। তার আগে অবশ্য তোমাদের কাউকে ড্রাই ক্লিনারসের ব্যবসায় নাম লেখাতে হবে।’

‘ড্রাই ক্লিনার্স!’ চোখ কোঁচকাল বিল্লাহ্। ‘কেন?’

উত্তর পাশ কাটিয়ে গেল মাসুদ রানা। ‘কোথাও একটা শো-রুম খুলে বসতে হবে তোমাকে।’

‘আমাকে?’ নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকাল সে। তারপর

বোকার মত এর ওর দিকে তাকাতে লাগল। 'মাসুদ ভাই, আমি...'

'আমি হব তোমার সেলস্ প্রমোশন অফিসার,' অমায়িক হাসি দিল রানা। 'আচ্ছা, সেসব পরে হবে। আগে ওদের অফিসের সন্ধান, তারপর চোদ্দ নম্বর ক্লিনিং ভ্যানের সন্ধান। ক্যারিয়ারের দুই দিকে বড় করে লেখা আছে নম্বরটা। ওই একটা গাড়িই রোজ রবার্টো গার্সিয়ায় আসে। অন্তত আমি যতদিন ওয়াচ করেছি, অন্য কোন গাড়ি দেখিনি। কাল থেকে গাড়িটাকে ফলো করবে তুমি, সবুজ। অফিসটা খুঁজে বের করবে।'

'ফোন বুকে পাওয়া যাবে না ওদের ঠিকানা?' বলল ফয়েজ।

'যাবে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি, সেটা হলো ওটার নির্দিষ্ট কোনও রুট আছে কি না, কোন প্যাটার্ন আছে কি না। অফিস থেকে সরাসরি ওই দোকানেই যায় ওটা, না আরও কোথাও যায়। কম করেও দুই তিনদিন ফলো করতে হবে। যদি কোন প্যাটার্ন থেকে থাকে, তাহলে জানতে হবে, গার্সিয়ার দোকানে আসার আগের স্টপেজ কোথায় ওটার। সেক্ষেত্রে অপারেশনের দিন গার্সিয়ার আগের হল্টেজ ত্যাগ করার পর পরই গাড়িটা হাইজ্যাক করব আমরা।'

'ওটার ড্রাইভার আর ক্লিনারদের ছেড়ে দিলে...' থেমে গেল সবুজ রানাকে মুখ খুলতে দেখে।

'আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই আসে না। সবাইকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হবে পিছনে। কাজ হয়ে গেলে ওদের আর প্রয়োজন হবে না আমাদের, তখন ছেড়ে দেব।'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, মাসুদ ভাই,' বলল ফয়েজ আহমেদ।

'হ্যাঁ, বলো।'

'আপনি বলেছেন, গাড়ি দেখেই গেট খুলে দেয় গার্সিয়া। কিন্তু ধরুন, আমরা যেদিন যাব, সেদিন সে কে এসেছে না দেখে যদি গেট না খোলে? আফটার অল, প্রথমবার বলে একটা কথা আছে।'

'ভাল প্রশ্ন করেছ। ধরা যাক, গেট খোলার আগে তার দেখার ইচ্ছে হলো কে বা কারা এসেছে। দেখবে অপরিচিত দুটো মুখ। সে ক্ষেত্রে কি করবে সে? গেট না খুলেই জানতে চাইবে, তারা কেন এসেছে? তার রেগুলার ক্রু-রা কোথায়?' মাথা দোলাল রানা। 'না। জানতে যদি ইচ্ছে হয়ই গার্সিয়ার, জানতে চাইবে গেট খুলে। কারণ চোখের সামনে সে বনোমোর ট্রাক দেখতে পাচ্ছে, অপরিচিত হলেও খুব চেনা কভারলস্ পরা দুইজন ক্লিনার দেখতে পাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে কী এমন সন্দেহ জাগতে পারে তার মনে? এমন কিছু নিশ্চই নয় যে তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বনোমোয় ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে তাকে।'

একটু থামল মাসুদ রানা। ভাবল। 'তবু, সন্দেহ যখন জেগেছে, এ ব্যাপারে আরও খোঁজ করে শিওর হয়ে নিতে হবে আমাদের। এই পর্যায়ে এসে কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না। কাল থেকে আরও কয়েকদিন বিশেষভাবে এই ব্যাপারটার ওপর লক্ষ রাখতে হবে। যদি দেখি গেট খোলার আগে ক্রু-দের তেমন লক্ষ করে না লোকটা, তাহলে এই প্ল্যানই কার্যকর করা হবে। তা না হলে অন্য পথ বের করতে হবে। এ কাজে এমনিতেই প্রচুর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা, কাজেই নতুন আর কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না।'

উসখুস করল খানিক বিল্লাহ। 'তখন ক্লিনার্সের ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন, মাসুদ ভাই?'

হাসল ও। 'এখনই সব গোমর ফাঁক করতে চাই না। পরে শুনো।'

বৃহস্পতিবার।

গার্সিয়ার টেলিফোন পেয়ে ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল নাদিরা। ওকে নিয়ে নাইনথ ও টেনথ অ্যাভিনিউর মাঝামাঝি জায়গার এক বিখ্যাত ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে এল লোকটা। রেস্টুরেন্টের ভেতরের দেয়াল একেবারে সিলিং পর্যন্ত ধবধবে সাদা টাইলে মোড়া। তার ওপর চমৎকার কাঠের প্যানেলিং।

আজ দু'জন বডিগার্ড রয়েছে তার সঙ্গে। শোফার আর আরেকজন সেলসম্যান। ওদের কাছাকাছি বসল লোক দুটো। গার্সিয়ার ভাব চক্কর দেখে মনে হলো, সে-ই বুঝি মালিক এই ইটালিয়ান জয়েন্টের। ম্যানেজার থেকে শুরু করে বয় বেয়ারা প্রত্যেকে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওদের দেখে। ম্যানেজার নিজে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে কোনটার স্বাদ কেমন, কোনটা সেনিয়রিটার জন্যে ভাল হবে ইত্যাদি পরামর্শ দিল গার্সিয়াকে।

অর্ডার দেয়ার সময় কোনদিক তাকাল না ইটালিয়ান। বোঝাই যায়, নাদিরা তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে বলে খুশিতে আটখানা সে। খেতেও পারে মানুষটা রাক্ষসের মত। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গপাগপ খেলো সে। নাদিরা হাত গুটিয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। এমনিতেই রাতে কম খায় ও, তারওপর সবগুলো আইটেমই চর্বিতে ঠাসা। পেটের অর্ধেকটা ভরতেই ক্ষ্যান্ত দিয়েছে সে।

'রোজ রাতে এত খান আপনি?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইল ও।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ন্যাপকিনে মুখ মুছল গার্সিয়া। হাসল।

'হ্যাঁ।'

'মাই গড!'

খাওয়া শেষে আধ ঘণ্টা মত গল্প করল ওরা বিভিন্ন হালকা প্রসঙ্গ নিয়ে। খাওয়ার ফাঁকে আস্ত এক বোতল ওয়াইন সাবাড় করেছে গার্সিয়া। এবার ব্র্যাণ্ডি নিয়ে পড়ল। রাত ন'টা বাজতে ওঠার আয়োজন করতে লাগল সে। বিল আনতে বলল হেড ওয়েটারকে। হেসে মাথা দোলাল লোকটা। জানাল, বিল নিয়ে ভাবতে হবে না। টাকা দেয়া হয়ে গেছে। 'কার্টসি অভ মিস্টার পিটারসন,' বলল সে।

'পিটারসন কে?' জানতে চাইল নাদিরা।

'আমার এক বন্ধু। ভাল মানুষ। ওয়েল, মাই ডিয়ার,' হাত ঘড়ি দেখল গার্সিয়া। 'রাত কম হলো না, উঠতে হয় এবার। বলো, কোনটা ভাল লাগে তোমার? ডিসকো? পিয়ানো বার? নাকি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিতে চাও?'

'এ মুহূর্তে শেষেরটাই পছন্দ আমার। তুমিও কাজের মানুষ, সকালে ঘর ছাড়তে হবে। বেশি রাত করা ঠিক হবে না।'

'একসেলেন্ট,' দুই কানে গিয়ে ঠেকল ইটালিয়ানের হাসি। 'আমার সঙ্গে যদি যেতে বলি তোমাকে, মাইণ্ড করবে?'

খুশি হয়ে উঠল নাদিরা। ওটাই চাইছিল ও। 'কোথায়, তোমার অ্যাপার্টমেন্টে?'

উত্তর দিল না গার্সিয়া, চকচকে চোখে চেয়ে থাকল ওর দিকে।

'না, মাইণ্ড করব না।'

'থ্যাঙ্কস, আয়্যাম অনার্ড।'

টোয়েন্টি ফার্স্ট স্ট্রীটে গ্রামারসি পার্কের কাছে গার্সিয়ার অ্যাপার্টমেন্ট। ভেতরে ঢুকে নাদিরার মনে হলো ঘরে প্রতিটি

জিনিস থেকে যেন প্রাচুর্য ঠিকরে পড়ছে। দুই বেড, দুই বাথ, লাউঞ্জের মত বিশাল লিভিংরুম, দুই বারান্দার বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট। প্রাচুর্যের সঙ্গে রুচিরও সমন্বয় ঘটিয়েছে লোকটা। ভেলভেট মোড়া সোফা-আর্মচেয়ার, ড্রেপার, কার্পেট, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিংস, সব চেয়ে চেয়ে দেখার মত।

'তুমি একা থাকো কেন? পরিবারের আর সবাই কোথায়?' জানতে চাইল নাদিরা।

'একা থাকি এই জন্যে যে আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পরিবারের অন্যরা থাকে ম্যানহাটনে।'

প্রতিটি রুম নাদিরাকে ঘুরিয়ে দেখাল গার্সিয়া। মুগ্ধ হলো ও লোকটার বেডরুম দেখে। চিকচিকে পিংক রঙের দেয়ালের পটভূমিতে হালকা আকাশি পর্দা ও বিছানার চাদর মোহময় করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ। ভেতরের বিস্ময় চেপে রাখার কোন চেষ্টা করল না নাদিরা, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগল তার রুচির। সবশেষে কিচেনে নিয়ে আসা হলো ওকে।

এত সুন্দর ঝকঝকে কিচেন আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না নাদিরা। 'বাহ্!'

'আমি নিজ হাতে ধোয়ামোছা, গোছগাছ করি সব,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল ইটালিয়ান।

'রান্না?'

'ওটাও আমি করি। ইন ফ্যাক্ট, রান্না আমার সবচে' পছন্দের কাজ। আশা করি একদিন তোমাকে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াবার সুযোগ পাব।'

হাসল নাদিরা। 'আমি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকলাম।'

লিভিংরুমে এসে বসল ওরা। বাইরে গার্সিয়ার দুই বডিগার্ড অপেক্ষা করছে। একটু পর সেনিয়রিটাকে তাঁর বাসায় পৌঁছে

দিয়ে আসতে হবে একজনকে, মনিবের হুকুম।

জুতো খুলে বসল নাদিরা। মাখনের মত নরম কার্পেটের স্পর্শ দারুণ লাগছে। 'ড্রিঙ্কস?' বলল গার্সিয়া।

মাথা নাড়ল ও। 'না, ধন্যবাদ।'

নিজের জন্যে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে বসল সে। বাচাল হয়ে উঠেছে আবার, একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে। এক সময় উঠল লোকটা, আবার ভরে নিয়ে এল গ্লাস। ফের শুরু হলো তার পান আর গল্প। তৃতীয় গ্লাস শেষ হওয়ার পর মনে হলো যেন খানিকটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে লোকটা।

'এক্সকিউজ মি,' বলে উঠে গেল সে।

বুঝল নাদিরা, তলপেটের চাপ কমাতে গেছে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, খবর নেই। তারপর আরও কয়েক মিনিট। বিস্মিত হলো ও, করছে কি লোকটা? এত সময় লাগে নাকি? 'রবার্টো!' ডাকল নাদিরা।

উত্তর নেই।

'রবার্টো!' গলা খানিকটা চড়াল এবার ও।

উত্তর নেই।

আসন ছাড়ল নাদিরা। জুতো পায়ে গলাল। তারপর ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা করে এগোল মাস্টার বেডরুমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে উঁকি দিল গলা বাড়িয়ে। কিং সাইজ বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে লোকটা। কাপড় পাল্টাবার সময়ও পায়নি, ঘুমিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে একটু একটু।

কাছে এসে আরও দু'বার তার নাম ধরে ডাকল ও। উত্তর দিল না লোকটা। এবার আস্তে কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল সে তার। তথৈবচ। না, ভান নয়, বুঝল নাদিরা, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। প্রচুর পান করেছে লোকটা আজ।

দ্রুত পায়ে লিভিংরূমে চলে এল নাদিরা। ভেতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা, বাইরের দুই গার্ড যেন হঠাৎ করে এসে পড়তে না পারে। আবার যখন বেডরূমে ফিরে এল ও, আগের মতই পড়ে থাকতে দেখা গেল গার্সিয়াকে। নড়েনি এক চুল।

এদিক ওদিক তাকাল নাদিরা। ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ওয়াক-ইন ক্লজিটটা পছন্দ হলো প্রথম। খুলল সে ওটা, কিন্তু পনেরো মিনিট পর হতাশ হলো পুরোপুরি, গার্সিয়ার পরিধেয় কাপড়-চোপড়ের বড়সড় এক মজুত ছাড়া কিছুই নেই ওটায়।

অসংখ্য সুট, জ্যাকেট, কোট, হ্যাট, জুতো, টাই। কয়েক কুড়ি দামী শার্ট, মোজা এবং এক রেজিমেন্ট আর্মির জন্যে পর্যাপ্ত স্কার্ফ। দ্বিতীয় ড্রেসারের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারে ঢিবি দিয়ে রাখা আছে রাজ্যের জুয়েলারি। কাফলিঙ্ক, আংটি, ব্রেসলেট, গলার চেইন, স্টিক পিন, হাতঘড়ি ইত্যাদি। সবগুলোই অত্যন্ত দামী।

নিচের ড্রয়ারে আছে গার্সিয়ার শীতকালীন পোশাক। মোটা ফ্লানেল শার্ট, সোয়েটার, ওয়েস্টকোট, ওভারকোট এইসব। প্রচুর সোয়েড ও দস্তানা–উলের, চামড়ার। দেখা হতে যেটা যেভাবে সাজানো ছিল, ঠিক সেভাবে রেখে ড্রয়ারগুলো বন্ধ করল নাদিরা। মন কিছুটা দমে গেল, যার আশায় এই তৎপরতা তার কোন আভাস পাওয়া যায়নি বলে।

ক্লজিটের সর্বশেষ ড্রয়ার খুলল এবার ও। অসংখ্য পুরু নিটেড সোয়েটার, প্রতিটি আলাদা আলাদা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা। ওগুলো বের করার প্রয়োজন মনে করল না নাদিরা, সাইড দিয়ে হাত গলিয়ে দিল তলার দিকে। হাতে বাধল কিছু। শক্ত, বইয়ের মত। দম বন্ধ হয়ে এল ওর আপনাআপনি, কি ওটা? মুখ ঘুরিয়ে

গার্সিয়ার দিকে তাকাল সে, একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মানুষটা এদিকে পিছন ফিরে।

আলতো করে জিনিসটা বের করে আনল নাদিরা। একটা পাসপোর্ট। ছবিটা দেখল ও, গার্সিয়ার ছবি। একটা একটা করে পাতা উল্টে চলল ও দ্রুত। বেশ কয়েক দেশে আসা-যাওয়া করেছে লোকটা। হল্যাণ্ড, ইতালি, সুইটজারল্যাণ্ড, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম, জার্মানি, এবং সবশেষে কুয়েত। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও, যা দেখার দেখা হয়ে গেছে।

আবার প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে এল। এবার নতুন একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। ছবি আর বিছানার মানুষটা এক হলেও পাসপোর্টে রয়েছে অন্য নাম। আলবার্তো রোসি। সবশেষে গার্সিয়া ওরফে রোসির কুয়েত সফরের সময়টা দেখল নাদিরা আরেকবার। তারপর জায়গামত রেখে দিল বই। উঠে দাঁড়াল ড্রয়ার বন্ধ করে।

খাটের ওপাশে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল ঘুমন্ত লোকটার মুখের দিকে। চোখেমুখে ফুটে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। পিছিয়ে এল নাদিরা। বেডরূমের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এল। সামনের দরজা খুলে ফেলল আস্তে করে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল দুই গার্ড। সামনের ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়েছিল ওরা এতক্ষণ। সেলসম্যান লোকটা উঁকি দিল ঘরের ভেতর। মালিকের দেখা না পেয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ওর দিকে।

'ঘুমিয়ে পড়েছেন,' বলল সে।

'তাই?' নাদিরার পাশ ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। হন হন করে এগিয়ে গেল বেডরূমের দিকে। এক মিনিট পরই বেরিয়ে এল সে। নিশ্চিন্ত। ইটালিয়ান ভাষায় শোফারের উদ্দেশে দ্রুত বলল কিছু। মাথা ঝাঁকাল শোফার। 'চলুন, সেনিয়রিটা,'

বলল সে। 'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

লিফটের দিকে পা চালাল নাদিরা। পিছন পিছন এগোল শোফার। অন্যজন থেকে গেল ঘুমন্ত মনিবের পাহারায়।

ছয়

আরও পাঁচ সকাল কাটাল রানা ইস্ট ফিফটি ফিফথ্ স্ট্রীটে। আরও ভাল করে লক্ষ করল বনোমো ট্রাকের পৌঁছার সময়, রবার্টো গার্সিয়ার গেট খোলা ইত্যাদি।

একদিন পর পর তিন দিন ভাড়া করা গাড়িতে, বাকি দু'দিন উল্টোদিকের রেস্টুরেন্টে বসে। প্রথম দুই দিন আগের রুটিন অনুযায়ীই চলল সবকিছু। নয়টা থেকে নয়টা পাঁচের মধ্যে পৌঁছে যায় বনোমো ট্রাক, ডবল পার্ক করে দাঁড়ায় পেভমেন্ট ঘেঁষে।

হাতে-ঘাড়ে ঘর পরিষ্কারের এটা ওটা সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসে দুই ইউনিফর্ম পরা ক্লিনার। পেভমেন্ট পেরিয়ে জায়গামত পৌঁছার আগেই গেট খুলে দেয় গার্সিয়া। কাজটা এমনভাবে করে সে, পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা যায়, কারা এল সেদিকে মোটেই নজর দেয় না। ঠিক যেমন বলেছিল রানা, ট্রাক দেখেই নিশ্চিন্ত মনে খুলে দেয় গেট।

ভাব দেখে মনে হয় ওই ট্রাকের অপেক্ষায় ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকে গার্সিয়া। ওটা এসে দাঁড়ালে গেট খোলে, তারপর ক্রু দু'জনকে ভেতরে ঢুকিয়ে আবার বন্ধ করে দেয়। তারপর অন্য কোন কাজে যায়। কিন্তু চতুর্থ দিন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা গেল।

ট্রাক এসে থামল, ক্রু-রা নেমে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকল, অধৈর্যের মত পা ঠুকতে লাগল রাস্তায়, কিন্তু গেট খোলে না। দু'তিনবার নকও করল তারা গেটে, তবু দেখা নেই গার্সিয়ার। অবশেষে এল সে, প্রায় এক মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর। কেন দেরি হলো লোকটার ভেবে পেল না মাসুদ রানা। শেষ দুইদিন আবার যে কে সেই। ট্রাক দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল সে দরজা।

বোধহয় বাথরুম সারতে গিয়েছিল ব্যাটা সেদিন, ভেবেছে রানা। অথবা পিছনের রুমে ব্যস্ত ছিল। নইলে আর কি হতে পারে? ব্যাপারটা নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবু খুঁত খুঁত করতে লাগল মন। রানা ভালই বোঝে, ওই গেট খোলার ওপরই নির্ভর করছে সব।

ওদিকে বনোমো ক্লিনিং সার্ভিসের গ্যারেজ খুঁজে বের করেছে সবুজ। গ্যারেজটা ফিফটি ফোর্থ অ্যাভিনিউর ইলেভেনথ্ স্ট্রীটে। কিন্তু চোদ্দ নম্বর ট্রাকটা স্পট্ করতে লেগেছে ওর তিন দিন। রোজ রাত বারোটায় শিফট বদল হয় ক্লিনারদের, এবং রাত একটায় পথে নামে ওদের গাড়ির বহর। সবুজের অনুমান, পঞ্চাশ থেকে ষাটটা গাড়ি কাজে বের হয়।

ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয় ওরা। একই রঙের একই আকারের গাড়ি। চোখ দিয়ে অনুসরণ করা মুশকিল। চোদ্দ নম্বরের সর্বশেষ শিডিউলড্ হল্টেজ রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স। সারারাত শহরের এখানে ওখানে অফিস-দোকান পরিষ্কার করে ওটা। তারপর ঠিক গ্যারেজে ফিরে যাওয়ার আগে আসে ইস্ট ফিফটি ফিফথ। তার ঠিক আগের হল্টেজ ওটার পার্ক অ্যাভিনিউ।

আরও কয়েকদিন ভ্যানটার পিছনে সবুজকে লেগে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল মাসুদ রানা। একই প্যাটার্নে কাজ করে কি না ওটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে সে, কোন হেরফের হয় না চোদ্দ নম্বরের প্যাটার্নের।

পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা, পরবর্তী শুক্রবারই চালাবে অপারেশন। তিনদিন পর। তবে সেদিন গার্সিয়ার গেট খুলতে দেরি করার ঘটনাটা মাথায় রেখে পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন এনেছে ও। আগে ভেবেছিল নিজেরাই সব করবে। এখন ঠিক করেছে, ছিনতাই করার পর ওদের ড্রাইভারকে দিয়েই চালানো হবে ভ্যান। লোকটার পাশে বনোমোর হেলপারের ইউনিফর্ম পরে বসা থাকবে রানা, তার পাঁজরে ঠেকে থাকবে ওর ওয়ালথার।

অন্যদের হাত-পা বেঁধে পিছনে ফেলে রাখা হবে। জায়গামত পৌঁছে জিনিস-পত্র নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে সঙ্গে গেটের কাছে পৌঁছাবে রানা। যাতে ওকে দেখে কিছু যদি সন্দেহ করেই বসে গার্সিয়া, পরিচিত ড্রাইভারকে দেখে তা মুহূর্তে দূর হয়ে যায়।

ভ্যান সমস্যার সমাধান হয়ে যেতেই অন্য সমস্যা নিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। বনোমোর ইউনিফর্ম সমস্যা। অপারেশনের আরও তিন দিন বাকি। কাজেই এই ক'দিন সকাল-বিকেল দোকানটার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব চাপাল রানা ফয়েজ আহমেদের ওপর। রানা যাবে ইউনিফর্ম সমস্যা সমাধান করতে।

ওয়াল স্ট্রীট।

নির্দিষ্ট ভবনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা। ভবনটা এত উঁচু যে চুড়ো দেখতে গেলে টুপি খসে পড়ে।

এর ছত্রিশ তলার এক প্রতিষ্ঠানে এসেছে রানা। আজব কাজ-কারবার এদের। মূল ব্যবসা আন্তঃরাজ্য মালামাল বহনকারী ট্রাক লুট করা এবং আর কারও লুট বা চুরির মাল নিরাপদে তার পছন্দমত জায়গায় পৌঁছে দেয়া। সে পৃথিবীর যেখানেই হোক। সঙ্গে চোরাই ট্র্যাভেলার্স চেক, এয়ারলাইন টিকেট, স্টক

সার্টিফিকেট, বিয়ারার বণ্ড ইত্যাদি বেচাকেনাও করে। লক্ষ লক্ষ ডলারের ব্যবসা এদের, অথচ অফিস দেখলে কিছুই বোঝার উপায় নেই। এতই সাধারণ যে চিন্তাই করা যায় না।

প্রতিষ্ঠানের নাম মার্চেন্টস প্রভিশনস, ইনকর্পোরেশন। জেস হ্যামিলটন, প্রেসিডেন্ট। সামনের আউটার অফিসে টাইপ রাইটার নিয়ে বসে আছে ভীষণ মোটা, খাটো, মাঝবয়সী এক মহিলা। ঘন, কুচকুচে কালো চুল মাথায়। ওগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অদ্ভুত এক চুড়ো খোঁপা বেঁধেছে মহিলা। ফলে বড়সড় একটা গামলার আকার ধারণ করেছে তার মাথা।

দুই কানে ঝুলছে সাইকেলের রিমের চেয়ে সামান্য ছোট সাইজের রিং। আট আঙুলে আট আংটি। পোশাকের বাহারও তেমনি। মহিলা জিপসি। পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকাল সে। 'ইয়েস?' শীতল চোখে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল কয়েকবার।

'আমার নাম উডওয়ার্ড,' বলল রানা। 'মিস্টার হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমি জানাচ্ছি তাঁকে,' সামনের ছোট টেবিলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রীতিমত ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়াল জিপসি। ভয় হলো রানার এখনই না মড়াৎ করে ভেঙে পড়ে ওটা। হেলেদুলে একটা বন্ধ দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল মহিলা। ওপাশ থেকে কেউ হাউমাউ শব্দে কি যেন বলল। ফিরে এল জিপসি।

'যান ভেতরে,' আরেকবার চোখ বোলাল সে রানার ওপর। মাপা, হিসেবী চাউনি।

দরজা ঠেলে ইনার অফিসে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। সামনে যাকে দেখল, তার বয়স স্বয়ং বিধাতাও জানেন কি না সন্দেহ। সত্তর, আশি, নব্বইও হতে পারে। আবার একশো-দেড়শো

হওয়াও অসম্ভব নয়। যেন জীবন্ত মমি একটা। ঘর ঠাণ্ডা রাখার কোন ব্যবস্থা নেই, ফলে গরম তাওয়ার মত তেতে আছে ভেতরটা।

অথচ মমির পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে যেন নর্থ পোলে আছে। উলের প্লেইড শার্ট পরেছে সে, গলা পর্যন্ত সবগুলো বোতাম আঁটা। তার ওপর কার্ডিগান এবং জ্যাকেট। গলায় পেঁচিয়েছে উলের ইয়া মোটা মাফলার। দু'হাতে একটা ট্যাপ খাওয়া মগ ধরে আছে লোকটা শক্ত করে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওটা থেকে।

ঝরঝরে একটা কাঠের ডেস্কের ওপাশে এ রুমের একমাত্র চেয়ারটায় বসে আছে লোকটা। ঘরের ফার্নিচার বলতে আছে কেবল এই টেবিল, তার ওপাশের চেয়ার এবং চার দেয়াল। কোন ফাইল কেবিনেট নেই, ভিজিটরদের বসার কোন ব্যবস্থা নেই। দেয়ালে কোন ছবি নেই। টেবিলে একটা খবরের কাগজ পর্যন্ত নেই। দেখেশুনে মনে হয় মাত্র মিনিট পাঁচেক আগে নতুন অফিস খুলেছে লোকটা, আসবাবপত্র পৌঁছার অপেক্ষায় আছে। অথবা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। সার্ভিস বয়দের জন্যে বসে আছে, ওরা এসে চেয়ার-টেবিলসহ বের করে নিয়ে যাবে তাকে।

'মিস্টার হ্যামিলটন?'

চোখ তুলল মমি। মুখটা যেন তার আফগানিস্তানের রুট ম্যাপ। কপাল, গাল, দুই চোখের নিচে মাকড়সার জালের মত অজস্র সরু সরু স্থায়ী দাগ। পিছনের দেয়াল আর হ্যামিলটনের গায়ের রঙে কোন পার্থক্য নেই, এই প্রথম লক্ষ করল মাসুদ রানা। দুটোই সমান ফ্যাকাসে। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, ভাল করে না তাকালে ঠাহর করা কঠিন।

নড করল হ্যামিলটন। স্পেশাল নড। প্রথমে ধীরে, তারপর

দ্রুত কয়েকবার ওপর-নিচ করল সে মাথাটা। ভয় হলো রানার সারাদিনে ওই নড থামবে কি না ভেবে। না, মাথার দোল কমে এল আস্তে আস্তে, তারপর থেমে গেল আচমকা।

'ইয়েস?' ফিসফিস করে বলল মমি। রানা শুনল যেন 'স্‌স্‌স্‌!'

'আপনার সঙ্গে কাল টেলিফোনে কথা হয়েছিল আমার।'

'ইয়েস!'

'আমি একটা শিপমেন্ট আশা করছি, আগামীকাল। জিনিসগুলো খুবই মূল্যবান। ওগুলো আমেরিকার বাইরে পাচারের ব্যবস্থা করে দিলে উপকৃত হব। আপনার খরচ ক্যাশে মেটাব আমি।'

তখনই উত্তর দিল না মমি। ফড়াৎ ফড়াৎ করে চায়ে চুমুক দিল কয়েকবার। নিজেকে রানার দুষ্টু ছাত্র মনে হলো, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় ধরে আনা হয়েছে প্রিন্সিপালের চেম্বারে, দাঁড় করিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

'আগে কখনও একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা?'

'না,' মাথা দোলাল রানা।

'পরিচয় ছিল আমাদের?'

'না।'

'তাহলে আমার রেফারেন্স কোথায় পেলেন আপনি? কে দিল?'

'আপনার খুব পুরনো এক বন্ধু।'

'নাম?'

'ভিনসেন্ট গগল।'

চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গেল মমি। অবাক চোখে তাকাল রানার দিকে। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। মালটা কি?'

'দামী পাথর। ডায়মণ্ড, রুবি এইসব। সঙ্গে কিছু অলঙ্কার।'

'বড় শিপমেন্ট?'

'তেমন বড় নয়, মোটামুটি।'

'কোথায় যাবে মাল?'

'মিডল ইস্ট।'

আরও কুঁচকে গেল ম্যাপটা। 'মিডল ইস্ট! কোন দেশ?'

'কুয়েত।'

'চার্জ অনেক বেশি পড়বে।'

'পারবেন তো কাজটা করে দিতে? কোন অসুবিধে...'

'চার্জ অনেক বেশি পড়বে,' একঘেঁয়ে সুরে বলল মমি। চুমুক দিল মগে কয়েকবার।

'কত?'

'মালের যা দাম, তার বিশ পার্সেন্ট।'

'পাবেন। কিন্তু মালটা যাতে নির্বিঘ্নে পৌঁছায় জায়গামত, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা চাই আমার।'

মাথা দোলাল লোকটা। 'এসব কাজে কোন গ্যারান্টি হয় না, মিস্টার,' তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল সে, 'কেউ দেবে না আপনাকে গ্যারান্টি।'

'কিন্তু...'

'বাজারে খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোন কাজেই গ্যারান্টি দেয় না মার্চেন্টস প্রভিশন্‌স্। আবার কোন কাজ নিয়ে ব্যর্থও হয় না।'

একটু চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল মাসুদ রানা। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। গগলের কাছে শুনেছে ও, এ ধরনের কাজে এর চেয়ে যোগ্য মানুষ আমেরিকায় দ্বিতীয়টি নেই। এর সাহায্য না পাওয়া গেলে ওর একার পক্ষে মালগুলো এ দেশ থেকে বের

করা বড় এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। এরা বনেদি চোর। নীতি মেনে চলে কঠোরভাবে। অন্যের চোরাই মাল হাতে পেলেও আত্মসাৎ করে না কখনও।

'ঠিক আছে। আমি রাজি।'

'মাল হাতে আসামাত্র ফোন করবেন।'

'নিশ্চই। নাইস টু মিট ইউ।'

বেরিয়ে এল রানা ঘর ছেড়ে। ট্যাক্সি চেপে হোটেলে ফেরার পথে জেস হ্যামিলটনের কথা ভাবল। রেফারেন্স না থাকলে কারও কাজ হাতে নেয় না লোকটা। যারটা নেয়, শেষ না করে ছাড়ে না। লোকটার অফিস নিয়ে ভাবল ও। এক নম্বরি আর দুই নম্বরি, যা-ই হোক, ব্যাটার অফিসটা কেমন যেন। কোন ফাইলপত্র নেই, কিচ্ছু নেই। অন্তত লোক দেখানো কিছু তো থাকবে। তা-ও নেই।

অবশ্য যে ধরনের কাজ তার, তাতে...তাছাড়া গগল যখন দিয়েছে নামটা, তার চিন্তার কিছুই নেই। এই জগৎটাকে অনেক অনেক ভাল চেনে গগল। দুপুরের খাওয়া সেরে একবারে হোটেলে ফিরল মাসুদ রানা। কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল। এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দুই মিনিটের মধ্যে। অ্যাকশনে নামার আগে যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়া ভাল। পরে আর কখন বিশ্রাম নেয়ার সময় জুটবে কে জানে।

ওদিকে সারা দুপুর ম্যানহাটনে টো-টো করে ঘুরে বেড়াল ফয়েজ পছন্দসই একটা জায়গার খোঁজে। যেখানে অপারেশন সেরে জড়ো হবে ওরা, মালপত্র জেস হ্যামিলটনের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে প্যাকেট করবে। অবশেষে ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটের নাইনথ অ্যাভিনিউতে পছন্দসই একটা জায়গা পাওয়া গেল।

একসার পরিত্যক্ত দোকানঘর, ওয়্যারহাউস ইত্যাদির মাঝে

একটা প্যাডলক গ্যারেজ। পুরো ব্লকটা জনহীন। পরিত্যক্ত। প্রত্যেকটা ঘরের জানালা-দরজা মেটাল শীট দিয়ে ঢেকে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। খুব শিগ্‌গিরই ভেঙে ফেলা হবে এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তি, তার জায়গায় উঠবে নতুন হাই রাইজ হাউজিং কমপ্লেক্স। এলাকাটা ঘিরে অসংখ্য 'নো ট্রেস্‌পাসিং' বোর্ড টাঙানো রয়েছে।

গ্যারেজটা ব্লকের মাঝামাঝি জায়গায়। বড় দুই পাল্লার দরজা। গাড়ি রেখে নেমে এল ফয়েজ আহমেদ। গেটের তালা পরখ করল—ফাইভ অ্যাণ্ড টেন প্যাডলক। ওই তালা খোলা এক মিনিটেরও কাজ নয়। গ্যারেজের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে এল সে। পছন্দ হয়ে গেল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কাজ সেরে বেরোবার দশ থেকে পনেরো মিনিটের ভেতর পৌঁছে যেতে পারবে ওরা।

এবার খুঁজেপেতে একটা সরু স্টীলের তার বের করল ফয়েজ। ওটার একমাথা তালায় ঢুকিয়ে সামান্য খোঁচাখুঁচি করতেই খুলে গেল পুরনো প্যাডলক। ভেতরটা প্রায় টেনিস কোর্টের মত বড়। খুশি হয়ে উঠল সে। জায়গাটা যেমন দারুণ, তেমনি গ্যারেজ।

শেষ বিকেলে জায়গাটা রানাকে দেখাতে নিয়ে এল ফয়েজ। দূর থেকে গ্যারেজটা দেখল রানা প্রথমে, তারপর গাড়ি নিয়ে পুরো ব্লকটা চক্কর দিয়ে এল একবার ধীরগতিতে। থামল এসে গ্যারেজের সামনে।

নেমে পড়ল মাসুদ রানা। ওটার ভেতর-বার দেখল ভাল করে। তারপর বলল, 'মনে হয় ভালই চলবে কাজ। লোকেশনটা চমৎকার।'

সকাল সাড়ে সাতটা।

গাড়ি চালাচ্ছে মাসুদ রানা। পাশে নাদিরা। পিছনে মুত্তাকিম বিল্লাহ ও ফয়েজ আহমেদ। গাড়িটা ভাড়া করা একটা ফোর্ড।

মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চোদ্দ নম্বর বনোমো ক্লিনিং ভ্যানকে অনুসরণ করছে ওরা। কথা নেই কারও মুখে। সামনে তাকিয়ে বসে আছে রানা মূর্তির মত। উইণ্ডশীল্ডে নিজের আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছে ও, স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ চওড়া ওটা। ভিউ মিররে তাকাল রানা এক পলক। চোখ পড়ল দানবের ওপর। ধ্যানমগ্নের মত বসে আছে সে, নজর শিকারী বাজের মত স্থির।

'আর দুটো হল্টেজ,' বলল নাদিরা। 'তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা।

আরও পাঁচ মিনিট চলার পর পিছনের ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল ভ্যানের। থেমে দাঁড়াতে যাচ্ছে। চট্ করে গতি কমাল রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল একটা পার্কিং সাইনের নিচে। ফিফটিয়েথ ও মেডিসনের মাঝামাঝি একটা কম্বলের দোকানের সামনে ডবল পার্ক করল বনোমো ভ্যান।

ড্রাইভার এবং পাশে বসা তার হেলপার নেমে এল রাস্তায়। ঘুরে ভ্যানের পিছনে চলে এল ওরা, পিছনের পাল্লা খুলে বাঁদরের মত লাফিয়ে ক্যারিয়ারে উঠে পড়ল হেলপার। সরঞ্জাম নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। পাল্লা বন্ধ করে পেভমেন্টে উঠল তারা, ঢুকে পড়ল নির্দিষ্ট দোকানে। ঠিক আধঘণ্টা পর আবার দেখা দিল লোক দুটো, ব্যস্ত পায়ে গাড়িতে ফিরে এল, পরমুহূর্তে রওয়ানা হয়ে গেল ভ্যান।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। আটটা দশ। টাইম শিডিউল খুব কঠোরভাবে মেনে চলে ব্যাটারা। ওদের এবারের গন্তব্য একটা

অ্যান্টিক স্টোর, রবার্টো গার্সিয়ার আগের শেষ হল্টেজ। ভ্যানের পিছন পিছন ফিফটি থার্ড এবং ফিফটি ফিফথের মাঝামাঝি পর্যন্ত এল ওরা, তারপর আবার পার্ক করল রানা। সামনে ভ্যানটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে অ্যান্টিক স্টোরের সামনে।

আরেকবার ঘড়ির ওপর চোখ বোলাল রানা–সোয়া আট। পেভমেন্টে পিল্ পিল্ করছে মানুষ। অফিসে চলেছে নানান বয়সী মেয়ে-পুরুষ। যারা দূরে যাবে, বাস স্টপেজে সুশৃঙ্খলভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। অন্যরা প্রায় ছোটার গতিতে হাঁটছে। কোনদিকে তাকাবার সময় নেই কারও।

আকাশে মাথা ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা ভবনগুলোর মাঝের অসংখ্য সরু ফাঁক গলে তির্যকভাবে রাস্তায় এসে পড়েছে সকালের ফালি ফালি মিষ্টি রোদ। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। ভেজা রাস্তা চকচক করছে রোদ মেখে। দিনটা আজ ভালই কাটবে মনে হচ্ছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবল মাসুদ রানা। মেঘ নেই কোথাও এক বিন্দুও, চকচক করছে ফিকে নীল আকাশ। ততক্ষণে অ্যান্টিক স্টোরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে দুই ক্লিনিং ক্রু।

'চল্লিশ মিনিট মত থাকবে ওরা এখানে,' বলল রানা। 'এরপর কোথায় যাবে জানা আছে আমাদের। কাজেই এখানে বসে না থেকে জায়গামত গিয়ে অপেক্ষা করি, কি বলো?'

'কিন্তু···।' থেমে গেল ফয়েজ বক্তব্য শেষ না করে।

'কি?' বলল রানা।

'এই দুই স্টপেজের মধ্যেই কোথাও ভ্যানটার দখল নিতে হবে আমাদের, মাসুদ ভাই। কাজটা কোথায় সারা যায় এই বেলা চেক করে রাখা গেলে ভাল হত না?'

মুচকি হাসি ফুটল রানার মুখে। গীয়ার দিল ও। 'ভেব না,

ঠিক করে ফেলেছি সে জায়গা।'

'তাই নাকি?' বলল বিল্লাহ।

মাথা দোলাল রানা। গাড়ি ছাড়ল। 'হ্যাঁ। কেউ খেয়াল করেছ, ওরা যখন গাড়ি পার্ক করে রেখে কাজে যায়, সাজ-সরঞ্জাম বের করার পর পিছনের দরজা যে লক্ করে না? আমি করেছি। যত জায়গায় থামে, কেবল ইগনিশন চাবি পকেটে নিয়েই নেমে আসে ড্রাইভার। পিছনের পাল্লা দুটো খোলাই থাকে। ভিড়িয়ে রেখে যায় কেবল।'

'আরে! তাই নাকি? দেখিনি তো!' বিস্ময় প্রকাশ করল ফয়েজ।

বিল্লাহ বলল, 'আমিও না।'

'ওই সুযোগটাই কাজে লাগাব আমরা। অপারেশনের দিন ওরা যখন অ্যান্টিক শপে ঢুকবে···'

রানাকে কথা শেষ করতে দিল না বিল্লাহ, 'আমাদের অন্য সঙ্গীরা তখন ভ্যানে উঠে বসে থাকবে।'

'তাদের পরনে থাকবে বনোমো কভারলস্,' যোগ করল ফয়েজ উচ্ছ্বসিত গলায়। 'বাহ্! যার খুশি দেখুক, বুঝতেই পারবে না কিছু।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'ওরা যখন কাজ সেরে বেরিয়ে এসে ভ্যানের পিছন দরজা খুলবে···'

আবারও বাধা দিল বিল্লাহ, 'দেখবে, ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ব্রুকলিন-ম্যানহাটন টানেলের মত লম্বা পিস্তলের মাজল।'

পাশে তাকাল মাসুদ রানা। ওর দিকে চেয়ে আছে নাদিরা জিজ্ঞাসু চোখে। ব্যাপারটা ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলল তাকে রানা। হেসে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'ফ্যানটাস্টিক!'

ঠিক নয়টা তিন মিনিটে রবার্টো গার্সিয়ার সামনে ডবল পার্ক

করল বনোমো ভ্যান। পিছন থেকে ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার, প্লাস্টিকের বালতি, কাপড়ের ডাস্টার, পালকের ডাস্টার ইত্যাদি বের করে পেভমেন্টে উঠে এল হেলপার। তার পিছনে ভ্যানের দুই পাল্লা ঠেলে ভিড়িয়ে রাখল ড্রাইভার। তারপর দু'জনে মিলে পা বাড়াল রবার্টো গার্সিয়ার দিকে। গেটের ব্যাপারটা সবাই লক্ষ করেছে এবার।

পিছনে ফয়েজ হেসে হেসে কী যেন বলল বিল্লাহকে। সে-ও হেসে উঠল। কিন্তু সেদিকে মন নেই মাসুদ রানার। হঠাৎ করেই ঘামতে শুরু করেছে ও। মনের মাঝে বারবার উঁকি দিচ্ছে অশুভ চিন্তা। রানা ভালই বোঝে, ঠিক কি করতে যাচ্ছে ও। দিনের পরিষ্কার আলোয় স্রেফ ডাকাতি করতে যাচ্ছে ও আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ততম শহরের বুকের ওপর।

কাজটা নির্বিঘ্নে সারতে পারবে তো ও? নাকি জড়িয়ে পড়বে কোন কঠিন ঝামেলায়? রবার্টো গার্সিয়াকে আণ্ডার এস্টিমেট করছে না তো রানা? মাফিয়ার লেজে পা দিয়ে নিজের মরণ ডেকে আনছে না তো?

সাত

বড়দিন এসে পড়েছে। তাকে বরণ করার তোড়জোড় চলছে। যেদিকেই চোখ যায়, ধপধপে সাদা নকল দাড়িওয়ালা সান্তা ক্লজ চোখে পড়ে কেবল। রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে সান্তা ক্লজ আর সান্তা ক্লজ। হাতে তাদের সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজছে। চোখে বিস্ময় নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে শিশুরা। বিস্ময়ের সঙ্গে কিছু না কিছু পাওয়ার আশাও ফুটে থাকে ওদের চাউনিতে।

প্যাচপ্যাচে বৃষ্টিভেজা দিন। আকাশ মেঘলা থাকে সারাক্ষণ। প্রচণ্ড শীত। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না শহরবাসীর। এসবে তারা অভ্যস্ত। কোলেরটা-কাঁখেরটা নিয়ে মহানন্দে কেনাকাটা করে বেড়াচ্ছে সবাই। এক হাতে তাদের কড়কড়ে নোট, অন্য হাতে ব্লুমিংডেলের শপিং ব্যাগ। চোখে-মুখে টাকা খরচ করার উন্মাদনা।

সব দোকানেই ঢোকা চাই তাদের, যেন তা না হলে মাটি হয়ে যাবে বড়দিনের আনন্দ। কিছু না কিছু কিনতেই হবে প্রতিটা থেকে, যার বেশিরভাগই রংচঙে কাগজ আর লাল ফিতে দিয়ে প্যাকেট করা থাকে। ওপরে লেখা থাকে, ডু নট ওপেন আনটিল ক্রিসমাস। সকাল আটটা থেকে আরম্ভ হয় তাদের দোকানের পর দোকান চষা, চলে মাঝরাত পর্যন্ত।

ওদের জন্যে বাড়তি সুবিধে হয়ে দেখা দিয়েছে সময়টা। এমন সার্বক্ষণিক হাটের মধ্যে কে খেয়াল করবে কোন এক ক্লিনিং এজেন্সির ইউনিফর্ম পরা একদল ক্রুকে, কে দেখতে যাবে কোত্থেকে কি করে এসেছে তারা?

ভোর ছ'টায় ঘুম ভেঙেছে মাসুদ রানার। শাওয়ার শেভ সেরে বাইরে থেকে নাস্তা করে হোটেলে ফিরে এসেছে ও আবার। জানালায় দাঁড়িয়ে নিচের জনস্রোত দেখতে দেখতে নতুন করে প্ল্যানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিছানায় মাথার কাছে টিভি চলছে। এখানে ওঠার পরদিন বাড়তি পয়সা দিয়ে টিভিটা আনিয়ে নিয়েছে ও কঙ্কালের কাছ থেকে। পরে জেনেছে রানা, ওই লোকই মালিক হার্ড-অনের।

হঠাৎ কি একটা কানে যেতে সচকিত হলো মাসুদ রানা। খবর হচ্ছে টিভিতে। কি যেন বলছে পাঠক, শব্দগুলো অস্বাভাবিক ঠেকেছে। ঘুরে দাঁড়াল ও। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল

পর্দার দিকে। সান ফ্রান্সিসকোর বড় এক জুয়েলারি শপে ডাকাতি হয়েছে গতকাল, সেই খবর পড়ছে পাঠক।

তাড়াতাড়ি বিছানায় এসে বসল ও, একটা শব্দও যেন মিস না হয়। ওখানকার অন্যতম বৃহৎ জুয়েলারি শপ, ডিভোল্ট ব্রাদার্সে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে কাল দুপুরে, লাঞ্চ আওয়ারে। দলে পাঁচ অথবা ছয়জন মুখোশ পরা গানম্যান ছিল। কর্মচারীদের জিম্মি করে দামী দামী সব জিনিস নিয়ে গেছে তারা। এতই দ্রুত এবং আচমকা ঘটেছে ব্যাপারটা যে অ্যালার্ম বাজানোর সময় পায়নি কেউ। পুলিসও টের পায়নি কিছু। আধঘণ্টা ধরে নিশ্চিন্তমনে কাজ সেরেছে ডাকাতরা। প্রায় চার মিলিয়ন ডলারের সম্পদ হারিয়েছে ডিভোল্ট ব্রাদার্স।

পুরো খবর শুনে তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা। বসে থাকল বজ্রাহতের মত। শুধু সময়ের ব্যাপারটা ছাড়া প্ল্যানের আর সব হুবহু যেন ওরই করা রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স ডাকাতির প্র্যাকটিকাল রিহার্সেল ছিল। কেউ ধরা পড়েনি, আহতও হয়নি। ভেতরে ঢুকেছে এবং টপাটপ মাল হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে নির্বিঘ্নে।

খুশি হওয়ার মত ব্যাপার হলেও উল্টে ভাবনায় পড়ে গেল রানা। এই ঘটনায় সতর্ক হয়ে যেতে পারে গার্সিয়া, ওদের সহজ কাজটা জটিল হয়ে উঠতে পারে। হারামজাদারা কাজটা করার আর সময় পেল না? চোখের সামনে কাল্পনিক সব ব্যানার হেডিং নেচে বেড়াতে লাগল রানারগু ডাকাতির অভিযোগে মাসুদ রানাকে খুঁজছে পুলিস, বা এফবিআই মাসুদ রানার সন্ধান চায় অথবা রানা এজেন্সির চীফ নিরুদ্দেশ।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল মাসুদ রানা। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার রূমে ফিরে এল একগাদা খবরের কাগজ বগলদাবা

করে। খবরটা বিস্তারিত পড়তে হবে। সবগুলো পত্রিকাতেই খবরটা ছাপা হয়েছে, এবং সবগুলোই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল রানা।

ছয়জন অস্ত্রধারী লাঞ্চের সময় আচমকা ঢুকে পড়ে ডিভোল্ট ব্রাদার্সে। তাদের দু'জন দোকানের কর্মচারী এবং উপস্থিত ক্রেতাদের গুলি করার হুমকি দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়তে বাধ্য করে। এই ফাঁকে অন্য চারজন ডিসপ্লে শোকেস ও পিছনের ভল্টরূমে লুটপাট চালায়। পরে সমস্ত মালামাল বালিশের কভারে ভরে দ্রুত চম্পট দেয় ডাকাতদল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দলনেতা দোকানের ফ্রন্ট ডোরের নিচে একটা রাবারের গোঁজ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। ফলে পুলিস এসে উদ্ধার না করা পর্যন্ত ভেতরের কারও পক্ষে বের হওয়া সম্ভব হয়নি। এই ফাঁকে দুটো গাড়িতে করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ডাকাতদল।

আবার দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসল মাসুদ রানাকে। গার্সিয়াও নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছে এ খবর। কি প্রতিক্রিয়া হবে লোকটার মধ্যে? নিজের দোকানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নতুন কোন পদক্ষেপ নেবে সে? নিলে কি হতে পারে সেটা? মেজাজ তেতো হয়ে গেল। না চাইলেও প্ল্যান কার্যকর করার দিন অন্তত কয়েক দিন পিছিয়ে দিতে হবে ওকে। গার্সিয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওপথে পা বাড়ানো হবে চরম গাধামি।

ওইদিনই সকালে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল নাদিরার। কয়েকদিন হলো হোটেল ছেড়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে থাকার অনুমতি দিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। ব্যস্ত না হয়ে আড়মোড়া ভাঙল ও, হাই তুলল, তারপর কানে লাগাল

রিসিভার। 'ইয়েস?'

'গার্সিয়া বলছি।'

তড়াক করে উঠে বসল সে। ঘুমের রেশ পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে। 'গার্সিয়া?'

'কাল সকাল সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত ছিলে কোথায়? ফোন করতে করতে আঙুল খসে পড়ার অবস্থা হয়েছিল আমার।'

'ওহ্‌হো, খুব দুঃখিত। জরুরী একটা কাজে ভোরেই বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।' অম্লান বদনে বলল নাদিরা। কাল ওই সময় বনোমো ভ্যানের পিছু লেগেছিল ওরা। 'তারপর? ব্যবসা কেমন চলছে?'

'ভাল।'

'শুনে খুশি হলাম। তারপর বলো, কেন ফোন করেছ?'

'আজ সন্ধেয় ফ্রী আছ তুমি?'

'কেন?'

'ভেবেছিলাম আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার করব আমরা।'

হাসল নাদিরা। 'তোমার বাসায় নিশ্চই?'

'এগজ্যাক্টলি!'

'আই উড বি ডিলাইটেড।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। সাতটায় তোমাকে নিতে আসব আমি।'

'উঁমম! ঠিক আছে। আমি তৈরি থাকব।'

'ধন্যবাদ।'

'গুড,' নাদিরার মুখে গার্সিয়ার নিমন্ত্রণ করার কথা শুনে খুশি হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ফিফটি সেকেণ্ড অ্যাভিনিউর এক রেস্তোরাঁয় মিলিত হয়েছে ওরা। একান্ত প্রয়োজন না হলে এখন আর এজেন্সি অফিসে যায় না রানা। যদি যেতে হয়, গভীর রাতে খুব

গোপনে যায়। অন্য সময় হার্ড- অনেই থাকে ও। 'ভেরি গুড। অনেক উপকার হবে আমাদের।' মেয়েটিকে ভাল করে শিখিয়ে দিল রানা কিভাবে প্রসঙ্গটা তুলতে হবে। কোন কোন তথ্য জানার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য কোন প্রশ্নের উত্তর যদি সে দিতে আপত্তি করে বা এড়িয়ে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করা ঠিক হবে না বলে সতর্ক করে দিল ও।

'ক্যাজুয়াল প্রশ্ন করবে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে এখন একটা তখন আরেকটা এইভাবে। সতর্ক থাকবে। চেহারায় যেন খুব একটা আগ্রহের ভাব দেখা না যায় তোমার। কোন কিছু সন্দেহ করে বসার সুযোগ যেন না পায় গার্সিয়া।'

'ঠিক আছে। সতর্ক থাকব আমি। আমাদের প্রোগ্রাম পিছিয়ে দেয়া হলো ডিভোল্ট ব্রাদার্সের কারণে?'

'অবশ্যই! লোকটা কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে না জেনে এই অবস্থায় কিছু করতে যাওয়া হবে স্রেফ বোকামি। তাড়াহুড়ো করতে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। এই পর্যায়ে তিল পরিমাণ ঝুঁকিও নেয়া চলবে না। তাতে যদি আরও এক সপ্তাও অপেক্ষা করতে হয় আমাদের, তাও ভাল।'

'ঠিক,' সায় দিল মুত্তাকিম। 'এত কষ্টের প্ল্যান কোনমতেই বরবাদ হতে দেয়া যায় না।'

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল নাদিরা। আজ আর কোন কাজ নেই তার সন্ধের আগে। কাজেই শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিনটা পার করে দিল সে। অপেক্ষার সময় কাটে না। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গেল। অতপর এক সময় শেষ হলো প্রতীক্ষার পালা। আঁধার ঘনিয়ে এল।

ছ'টার দিকে তৈরি হয়ে নেয়ার জন্যে উঠল ও। এই সময় ফোনটা বেজে উঠল। 'ইয়েস!' সাড়া দিল ও তৎক্ষণাৎ, ভেবেছিল

মাসুদ রানা বুঝি। নতুন কোন পরামর্শ দেবে।

'গার্সিয়া।'

'কোত্থেকে?'

'দোকান থেকে।'

'এত জলদি? সবে তো ছ'টা। এখনও তৈরি হইনি আমি।'

'শোনো, নাদিরা। ফোন করেছি আমি অন্য ব্যাপারে।'

'অন্য ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ, আমি খুবই দুঃখিত। এদিকে একটা ঝামেলা··· আজকের ডিনারের প্রোগ্রাম বাতিল করা ছাড়া কোন উপায় নেই আমার। খুব লজ্জিত আমি। কিছু মনে কোরো না, প্লীজ। ক্ষমা চাইছি আমি।'

'না, না, এতে মনে করার কি আছে? কিন্তু হঠাৎ এমন কি ঝামেলা দেখা দিল?'

'দোকানের স্টক চেক করতে হচ্ছে খুব শর্ট নোটিশে। যে কারণে আটকে গেছি।'

'অল রাইট। কোন অসুবিধে নেই। আগে কাজ, তারপর আর সব। পরে আর কোনদিন···'

'না না, পরে নয়। কালই ডিনার করব আমরা।'

'কাল?'

'হ্যাঁ। কাল সন্ধে ঠিক সাতটায় আসছি আমি।'

'অল রাইট।'

'তুমি মাইণ্ড করলে না তো?'

মৃদু হাসি দিল নাদিরা। 'প্রশ্নই আসে না।'

'দ্যাট'স মাই গার্ল। থ্যাঙ্ক ইউ। রাখলাম।'

রিসিভার রেখে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে এসে বসল নাদিরা। একটা ভুরু তুলে বলল, 'মাই গার্ল! ব্যাটা বামন, চাঁদ

ধরার সখ চেপেছে!' অলস ভঙ্গিতে চুলে ব্রাশ বোলাতে আরম্ভ করল ও। কেন যেন হঠাৎ করেই মাসুদ রানার মুখটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সঙ্গী হিসেবে ঠিক ওর মত ছেলেদেরই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে মেয়েরা।

বেশ কয়েকদিন ধরে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে ওরা। মানুষটাকে যতই দেখে, যতই তার তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পায়, ততই অবাক হয় নাদিরা। কেউ আন্দাজও করতে পারবে না, ভেতরে ভেতরে মাসুদ রানার মন পাওয়ার জন্যে সে কতটা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। লোকটা যদি হাত পাতে, নিজেকে উজাড় করে দেবে সে। হাত থেমে গেল। পূর্ণ চোখ মেলে আয়নায় নিজেকে দেখল। মাসুদ রানার পাগল করা হাসি মাখা মুখটা দেখতে পেল নাদিরা নিজের মুখের পাশে।

'দ্যাট'স মাই ম্যান,' আবেশ জড়ানো কণ্ঠে বলল ও। 'দ্যাট'স মাই লাভ।'

উঠল নাদিরা। মাসুদ রানার উদ্দেশে জিভ ভ্যাংচাল। তারপর ওইদিনের নিউ ইয়র্ক পোস্ট নিয়ে উঠে পড়ল বিছানায়। সান ফ্রান্সিসকোর ডাকাতির ঘটনাটা পড়ল আবার নতুন করে। ঠিক যেন রানার প্ল্যানের ট্রু কপি।

মাথার নিচে দু'হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। আকাশ-পাতাল ভাবনা স্থান করে নিল মাথার ভেতর। হঠাৎ উঠে বসল নাদিরা। ফোন করে রানাকে গার্সিয়ার প্রোগ্রাম বাতিলের কথা জানাতে হবে।

'চমৎকার!' নাদিরার দিকে তাকিয়ে হাসল রবার্টো গার্সিয়া। 'দারুণ লাগছে আজ তোমাকে।'

'ধন্যবাদ।'

হাত বাড়াল ইটালিয়ান। 'এসো। দেরি করে লাভ নেই। রওনা হওয়া যাক।'

নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার লেটেস্ট মডেলের ঝকঝকে ক্যাডিলাক। শোফার-কাম-বডিগার্ড দরজা মেলে ধরল, উঠে পড়ল দু'জনে। পথে সারাক্ষণ বক্‌বক্ করে গেল গার্সিয়া, যার বেশিরভাগই কানে যায়নি নাদিরার। বিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে গার্সিয়ার বিলাসবহুল মিউজিয়াম অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছল ওরা।

ঘরটা মোটামুটি ভালই সাজিয়েছে আজ গার্সিয়া। রুমগুলো প্রায় ভরে ফেলা হয়েছে ফুলে ফুলে। ঘরের মালিক নিজেও সাজগোজ কম করেনি। গ্রে ফ্লানেল প্যাকস আর হাউণ্ড'স-টুথ জ্যাকেট পরেছে সে, পায়ে চ্যাপ্টা কালো মোকাসিন। মন্দ লাগছে না দেখতে।

'চলো, কিচেনে যাই একবারে,' নাদিরাকে তার মিঙ্ক খুলতে সাহায্য করল গার্সিয়া। 'আমি রাঁধব, তুমি বসে বসে দেখবে, ওকে?'

'ওকে, স্যার। না, সেনিয়র,' হাসল ও মিষ্টি করে।

লোকটার পিছন পিছন তার কিচেনে এসে ঢুকল। বসে পড়ল একটা উঁচু টুলে। 'কি খাবে, বলো, কোল্ড অর হট?' বলল গার্সিয়া।

'হট।'

ওপাশের সাইড বোর্ডের ওপর রাখা কফি ডিসপেনসার দেখাল সে হাত তুলে। 'হেলপ ইওরসেলফ, প্লীজ!'

বসে বসে লোকটার রান্না দেখতে লাগল নাদিরা, ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিচ্ছে ধূমায়িত কফিতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেলল ও, সত্যিই রাঁধতে জানে গার্সিয়া। ওস্তাদ রাঁধুনি। এবং এ কাজে নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা আছে তার।

গ্লাসে খানিকটা মার্টিনি ঢেলে নিয়েছে সে। থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে তাতে, এটা কুটছে ওটা ধুচ্ছে, অমুকটা নাড়ছে, তমুকটার স্বাদ চেখে দেখছে, মোট কথা সারাক্ষণ ভন্ ভন্ করছে মাছির মত। কখনও চোখ তুলে নাদিরাকে দেখছে, হাসছে ঠোঁট টিপে।

'স্টক চেক করা হয়েছে?' তরল কণ্ঠে প্রশ্ন করল নাদিরা।

'কি?'

'তোমার দোকানের স্টক চেকিং শেষ হয়েছে?'

'ও, হ্যাঁ। হয়ে গেছে। ঠিকই আছে সব, কোন গোলমাল ধরা পড়েনি,' এদিকে না তাকিয়ে বলল লোকটা।

'এটা কি রুটিন চেকিং? বছরে কয়বার স্টক চেক করতে হয় তোমাকে দোকানের?'

'মাসে একবার করে।'

'চুরি-টুরি হয় কি না যাচাই করার জন্যে?'

দ্রুত মাথা দোলাল সে, 'চুরি রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে হয় না কখনও। ওই খাতে বছরে এক পয়সাও লস হয় না আমার।'

'চুরি হয় না?' বিস্মিত হওয়ার ভান করল নাদিরা, 'বলো কি! ঠেকাও কি করে?'

মুচকে হাসল গার্সিয়া। 'তুমি হয়তো লক্ষ করোনি, ক্রেতাদের একসঙ্গে একটার বেশি আইটেম দেখাই না আমরা। একবারে একটা। দেখা শেষ হলে প্রথমটা তুলে রেখে তবে আরেকটা বের করা হয়।'

'তাহলে চেক করার কি প্রয়োজন পড়ল?'

'প্রয়োজনটা ইন্টারনাল।'

তার মানে কর্মচারীরা বিশ্বস্ত নয়?'

হাসল গার্সিয়া। কেমন যেন কঠিন লাগল হাসিটা। 'ওরা প্রত্যেকে খুবই বিশ্বস্ত। তারপরও···বুঝলে না! অনেক ছোট ছোট

দামী পাথরের কারবার। মাঝে মাঝে চেক করা ভাল।'

ঠিকই বলেছে লোকটা, ভাবল সে। কিন্তু মনের ভেতর কেমন যেন খটকা লাগছে। মনে হচ্ছে ওর হাসির আড়ালে কিছু একটা ছিল। অনেকটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ধরনের। তাই কি? না ভুল বুঝছে ও?

রাজকীয় ডিনার খেয়ে মনে মনে গার্সিয়ার প্রশংসা করল নাদিরা পঞ্চমুখে। সত্যিই রাঁধতে জানে ইটালিয়ান। কফি নিয়ে লিভিংরুমে এসে বসল দু'জনে। 'অনেক কষ্ট করেছ তুমি,' বলল নাদিরা। 'এবার যদি বাসন-কোসন ধোয়ার কাজে কিছু সাহায্য না করি তোমাকে, অন্যায় হয়ে যাবে।'

'ননসেন্স। ও জন্যে লোক আছে। কেমন রেঁধেছি, বলো।'

'এত চমৎকার রান্না বহুদিন খাইনি আমি।'

'ও, রিয়েলি?' খুশিতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গার্সিয়ার।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'থ্যাঙ্কস।' কথার ফাঁকে ফাঁকে আধ বোতল মার্টিনি শেষ করে ফেলল মানুষটা দেখতে দেখতে। ফলটাও ফলল তেমনি দ্রুত। কথা জড়িয়ে আসতে শুরু করল তার। ঢুলু ঢুলু করছে চোখ।

'সেই ডাকাতির খবর শুনেছ?' হঠাৎ প্রসঙ্গটা তুলল নাদিরা। 'সান ফ্রান্সিসকোর সেই জুয়েল রবারির ঘটনা? দু দিন আগে...'

'একদিন আগে। ডিভোল্ট ব্রাদার্স...হ্যাঁ, শুনেছি। কাগজেও পড়েছি।' ওঠার জন্যে নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল সে।

'কি হলো?'

'কিচেনে যাব। খানিকটা ব্র্যাণ্ডি...'

'তুমি বোসো, আমি নিয়ে আসছি।' তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল নাদিরা।

'থ্যাঙ্কস, হানি।'

একটু পরই এক বোতল রেমি মার্টিন নিয়ে ফিরে এল সে।

গার্সিয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক আউন্স মত ঢেলে ফিরিয়ে দিল আবার। চোখ বুজে ঝিমাচ্ছে লোকটা। মুখ না তুলেই বলল, 'চিয়ার্স!'

'চিয়ার্স। গার্সিয়া, তোমার ভয় করছে না?'

'ভয়! কেন?'

'তোমার দোকানেও যদি ডাকাতি হয় ডিভোল্টের মত?'

'হবে না,' জোরে জোরে মাথা দোলাল সে। 'অসম্ভব! হতে পারে না।'

'কেন পারে না? অ্যালার্ম আছে বলে? সে তো ওদেরও ছিল।'

অসংলগ্নের মত হাসল গার্সিয়া। 'ওরা বোকা।'

'অ্যাঁ?'

'আমার মত সাইলেন্ট অ্যালার্ম ছিল না ওদের।'

'কি ছিল না?' শক্ত হয়ে গেল নাদিরা। কান খাড়া।

'সাই...সাইলেন্ট অ্যালার্ম।'

'আচ্ছা!'

'ওগুলো অনেক নিরাপদ, ইউ নো?' ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল গার্সিয়া। 'টিপে দেব, সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবে পুলিস বা কোন প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি। ভেতরে যদি অস্ত্রধারী ডাকাত থাকে, কিছুই টের পাবে না। যখন টের পাবে, তখন ঘেরাও অবস্থায় থাকবে তারা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল নাদিরা।

'সাধারণ অ্যালার্ম বেজে উঠলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ওরা, এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু করে দেয়। অনেক নিরীহ মানুষ, আই মীন, কর্মচারী-ক্রেতা মারা যায়, ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? সেই জন্যে...।' গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল ইটালিয়ান।

'যাক,' স্বস্তির ভাব ফুটল ওর চেহারায়। হাই তুলল। 'নিজের

দোকানে সাইলেন্ট অ্যালার্ম সেট করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি। তোমার কোন ক্ষতি হলে আমি কষ্ট পাব।'

'গড ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড। সাইলেন্ট অ্যালার্মই নয় কেবল, তার চেয়েও অনেক আধুনিক ব্যবস্থা নিয়েছি আমি। অনেক আধুনিক।'

'তাই বুঝি?'

সোফা থেকে পিছলে কার্পেটে নেমে পড়ল গার্সিয়া। বেহেড মাতাল হয়ে গেছে। মানসিক প্রতিবন্ধীর মত মাথাটা ঘন ঘন নাড়তে লাগল সে হ্যাঁ সূচক ভঙ্গিতে। থেমে এক চুমুকে শেষ করল গ্লাস। পরক্ষণেই সেটা গলা পর্যন্ত ভরে দিল নাদিরা।

'আমার দোকানের ডিসপ্লে শো-কেসের পিছনে, চেয়ারের ব্যাক সমান উঁচুতে লম্বা স্টীলের রেইল লাগানো আছে দেয়ালে, দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'ওটাই আমার আধুনিক অ্যালার্ম। স্বাভাবিক সময় ওই রেইল থেকে দূরে থাকি আমরা। বিপদ ঘটলে···ওই রেইলের সঙ্গে কোনভাবে দেহের যে কোন অংশের ছোঁয়া লাগাতে পারলেই অ্যাকটিভেট হবে অ্যালার্ম।'

থতমত খেয়ে গেল নাদিরা। মাসুদ রানার পরামর্শ মত লোকটাকে যদি মাতাল করতে না পারত ও, চরম সর্বনাশটা ঘটেই যেত। কোন পথ থাকত না ঠেকানোর। 'মাই গড! দারুণ বুদ্ধি তোমার! কিন্তু···কিন্তু পুলিস পৌঁছতে পৌঁছতে নিশ্চই দশ পনেরো মিনিট লাগবে। ততক্ষণে কাজ সেরে সরে পড়বে না ডাকাতরা?'

'উঁহুঁ!' আবার মাথা দুলতে শুরু করল গার্সিয়ার। 'পারবে না। কিছুতেই পারবে না।'

'কেন পারবে না?'

খালি গ্লাসটা লোকটার শিথিল আঙুলের ফাঁক গলে মাখনের মত নরম কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। শব্দ হলো না মোটেও। থুতনি বুকের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে গার্সিয়ার। যে কোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়বে মানুষটা। বাকিটুকু শোনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল নাদিরা।

'গার্সিয়া!' কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল ও। 'কেন পালাতে পারবে না? আর কি বাধা আছে?'

অনেক কষ্টে মাথা তুলল লোকটা। 'ইউ সী? সাইলেন্ট অ্যালার্ম। পুলিস পৌঁছে যাবে দশ-পনেরো···মিনিটের মধ্যে। ধরা···পড়ে যাবে সবাই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ!' মরীয়া হয়ে উঠল নাদিরা। আস্তে আস্তে কাত হয়ে যাচ্ছে গার্সিয়ার দেহ। ঘুমিয়ে পড়ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ও। কাঁধ ধরে দ্রুত কয়েকটা ঝাঁকি দিল লোকটাকে। মাসুদ রানার পরামর্শ গুলিয়ে গেছে। 'কেমন করে ধরা পড়বে সবাই, বললে না?'

'রেইল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে···গেট···গেটও লক্ হয়ে যাবে, ইলেক্ট্রিক্যালি···হেভি ডবল গ্লাস···বুলেট প্রুফ···ইউ নো? যত চেষ্টাই করা হোক ভেতর থেকে···এক ঘ-ঘণ্টার আগে ওই···গেট ভাঙতে পারবে না কেউ। নো-ও-ও ওয়ে-এ-এ-এ!' মাথা সোফায় এলিয়ে পড়ল লোকটার। মুহূর্তে তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। নাকও ডাকছে একটু একটু। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

জানে শুনতে পাবে না, তবু উঁচু গলায় বলল নাদিরা, 'চমৎকার, গার্সিয়া! দারুণ বুদ্ধি তোমার।'

আট

ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল মাসুদ রানার। দয়া করে ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না হত, সময়মত গার্সিয়া যদি ডিনারের নিমন্ত্রণ না জানাত মেয়েটাকে, পরিণতি কি হত ভেবে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ওর থেকে থেকে।

প্ল্যান যে নিখুঁত ছিল মাসুদ রানার, নিশ্ছিদ্র ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপরও সব ভেস্তে যেত কেবল ওই রেইলের খবর অজানা থাকার কারণে। কেবল অজানাই নয়, অকল্পনীয়ও ছিল ব্যাপারটা। অথচ গত দু'দিন রানা প্রায় নিশ্চিত জেনে বসে ছিল যে হুবহু একই পদ্ধতিতে সানফ্রান্সিসকোর ডিভোল্ট ব্রাদার্সে ঘটে যাওয়া সফল অপারেশনের মত ওদেরটাও সফল হবেই। কত বড় ফাঁড়া কেটে গেছে ভেবে আপাদমস্তক বারবার শিউরে উঠছে রানার। দ্রুত পায়ে ঘরের এ মাথা ও মাথা চক্কর দিয়ে ফিরতে লাগল ও। ভয়ানক গম্ভীর। কুঁচকে আছে কপাল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে আছে নাদিরা। বুক কাঁপছে তার। এত গম্ভীর হতে পারে মাসুদ রানা, দেখেও বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ ব্রেক কষল ও। ঘুরে তাকাল নাদিরার দিকে। 'তুমি শিওর, আর কোন সাইলেন্ট অ্যালার্ম সিস্টেমের কথা উল্লেখ করেনি গার্সিয়া?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মেয়েটি। মাথা দোলাল। 'শিওর। করেনি।'

আবার পায়চারি শুরু করল রানা। হয়তো কথাটা সত্যিই হবে, আবার মিথ্যে হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। না, যায়, নিজের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল ও। তথ্যটা বেহেড মাতাল

অবস্থায় ফাঁস করেছে গার্সিয়া, সজ্ঞানে নয়। কাজেই আরও যদি কোন ব্যবস্থা থাকত, সেটাও বলে ফেলত ওই সঙ্গে।

আবার থেমে দাঁড়াল। 'তথ্যটা ফাঁস করার সময় পুরোপুরি মাতাল ছিল লোকটা, ঠিক?'

'সম্পূর্ণ মাতাল ছিল,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

'কোন সন্দেহ নেই?'

'কোন সন্দেহ নেই। লোকটা হেভি ড্রিঙ্কার। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ডিনার করি, সেদিনের কথা তো বলেইছি তোমাকে। লোকটা যেমন পেটুক, তেমনি ড্রিঙ্কার। খাবার যা খায়, তার দ্বিগুণ পান করে। কালও তাই করেছে। তাছাড়া কাল আমিও যথেষ্ট সাহায্য করেছি তাকে দ্রুত বেসামাল হতে। গ্লাস পুরো খালি হওয়ার আগেই নিজ হাতে ভরে দিয়েছি।'

'হুঁম!'

বাচ্চাদের একটা খেলনা প্রিন্টিং মেশিন কিনল মাসুদ রানা। ওটার সাহায্যে বিগ অ্যাপেল লণ্ড্রি অ্যাণ্ড ড্রাই ক্লিনার্সের নামে একটা ভিজিটিং কার্ড ছাপাল। ম্যানহাটনের এক পাবের ফোন নাম্বার দিল ওতে রানা। সময়মত নাদিরা থাকবে ওখানে, বনোমোর মালিক বা ম্যানেজার যদি ফোন করে নিশ্চিত হতে চায়, জবাব দেবে তার প্রশ্নের।

পরদিন সকাল দশটায় হোটেল থেকে বেরুল মাসুদ রানা। পরনে ডার্ক গ্রে কনজারভেটিভ স্যুট। ট্যাক্সি চেপে ফিফটি ফোর্থ অ্যাভিনিউ চলল ও। সেখানে ট্যাক্সি ছেড়ে হেঁটে পৌঁছল ইলেভেনথ স্ট্রীট। অফিসটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

মালিককেই পাওয়া গেল অফিসে। তাকে নিজের পরিচয় দিল

রানা বিগ অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজার বলে। 'এই ব্যবসায় আমরা নতুন, স্যার। মাত্র কিছুদিন হলো নেমেছি,' বিনয়ের সঙ্গে বলল রানা।

'আই সী!' ওর ভিজিটিং কার্ডটা পড়ল বনোমোর মালিক। 'তা আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি, মিস্টার উডওয়ার্ড?'

'আমরা আমাদের এফিশিয়েন্সির প্রমাণ দেয়ার একটা সুযোগ চাই, স্যার। আপনার কোম্পানির ক্লীনারদের এক ডজন ইউনিফর্ম বিনে পয়সায় ধোলাই ও ইস্ত্রি করে দেয়ার একটা সুযোগ চাই।'

কার্ডটা নাড়াচাড়া করতে লাগল মালিক। 'ইউ মীন, কোন পয়সা লাগবে না?'

'না, স্যার। এক পয়সাও লাগবে না। আমাদের কাজ পছন্দ হলে পরেরবার দেবেন। বর্তমানে যে দরে কাজ করাচ্ছেন, তার থেকে দশ পার্সেন্ট কম দেবেন। তাতেই আমরা খুশি।'

'আই সী।' কিছু ভাবল লোকটা। 'আপনার এই ফোন নম্বরে রিঙ করলে নিশ্চই মাইণ্ড করবেন না আপনি?'

'হোয়াই!' চেহারায় অকৃত্রিম বিস্ময় ফোটাল মাসুদ রানা। 'অফকোর্স নট, স্যার। তাতে বরং খুশিই হব আমি।'

রিসিভার তুলে নাম্বারটা টিপল বোনোমোর মালিক। একবার রিঙ বাজতেই ওপাশ থেকে মিষ্টি মেয়ে-কণ্ঠ ভেসে এল, 'বিগ অ্যাপেল লণ্ড্রি অ্যাণ্ড ড্রাই ক্লিনিং কোম্পানি, গুড মর্নিং!'

'স্যাম উডওয়ার্ড নামে কেউ আছেন আপনাদের ওখানে?'

'ইয়েস, স্যার। আমাদের সেলস্ ম্যানেজার। কিন্তু এই মুহূর্তে অফিসের বাইরে আছেন উনি। আপনার যদি কোন মেসেজ থাকে মিস্টার উডওয়ার্ডকে দেয়ার, স্যার, অথবা যদি আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন...'

'না, ঠিক আছে।' ফোন রেখে দিল লোকটা। 'অল রাইট,

মিস্টার উডওয়ার্ড। প্রথমবার কোন পয়সা পাবেন না। তারপর কাজ বুঝে পেমেন্ট। ওকে?'

'ওকে, স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরি মাচ।'

এক ডজন আধ ময়লা হালকা নীল রঙের কভারলস্ একটা শপিং ব্যাগে পুরে তুলে দেয়া হলো ওর হাতে। ওগুলোর পিঠে বড় করে হলুদ রঙে লেখা: বনোমো ক্লিনিং সার্ভিস। বেরিয়ে এল রানা। খুশিতে মনে মনে লাফাচ্ছে।

বেনামে ভাড়া করা একটা ফোর্ড চালাচ্ছে নাদিরা। পাশে বসেছে মাসুদ রানা। পিছনের সীটে মুত্তাকিম এবং ত্রিরত্নের একজন, হাসান। ওদের পিছন পিছন আসছে অপর গাড়ি, শেভ্রোলে। ওটাও বেনামে ভাড়া করা। ওতে আছে ফয়েজ, সবুজ, এবং বিপুল। কাজটা ভালয় ভালয় শেষ হলে দুটো গাড়িই ফেলে পালাবে ওরা।

অবশেষে যাত্রা শুরু করেছে ওরা। আড়চোখে ঘড়ি দেখল নাদিরা, আটটা পাঁচ। সব যদি ঠিক থাকে, আর এক ঘণ্টার অল্প কয়েক মিনিট পরই সদলবলে রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে চড়াও হবে মাসুদ রানা।

সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ছে নাদিরা। বাড়ছে বুকের কাঁপুনি। কে জানে কি হয়! সফল হবে তো ওরা? নাকি ধরা পড়ে যাবে? চট্ করে মাসুদ রানার ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। মুখটা মনে হলো পাথর কেটে গড়া। পনেরো সেকেণ্ড পর পর একবার ডানে, একবার বাঁয়ে তাকাচ্ছে ও। দু'পাশের ট্রাফিকের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

রানার ওই ডানে-বাঁয়ে করার সঙ্গে কিসের যেন মিল আছে,

ভাবতে গিয়ে গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল নাদিরার। কিসের সঙ্গে যেন অদ্ভুত মিল আছে তার। কিসের সঙ্গে? হঠাৎ বুঝে ফেলল ও, সাপের সঙ্গে মিল আছে এ ভঙ্গির। ছোবল মারার আগে সাপের ফণা যেমন এদিক-ওদিক মৃদু দোল খায়, ঠিক তেমনি লাগছে রানার এই ভঙ্গি।

প্রত্যেকে দস্তানা পরে আছে ওরা। রওনা হওয়ার আগে গাড়ি দুটো থেকে ওদের হাতের ছাপ মুছে ফেলা হয়েছে যত্নের সঙ্গে। বাইরের নাক থেকে লেজ পর্যন্ত, আর ভেতরের স্টীয়ারিং হুইল, ডোর হ্যাণ্ডেল, ড্যাশ বোর্ড, মোট কথা এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ রাখা হয়নি। ঘণ্টাখানেক ধরে কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে সব খুব সতর্কতার সঙ্গে।

পালাবার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে কাজে লাগবে বলে আরও দুটো গাড়ি তৈরি রেখেছে রানা ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটের সেই গ্যারেজে। দুটোরই লাইসেন্স প্লেটের একটা করে সংখ্যা গ্রীজের প্রলেপ লাগিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

দলের সবার সঙ্গে রয়েছে মোজার মুখোশ, টেপ, খানিকটা করে দড়ি ইত্যাদি কমন আইটেম। এছাড়া মুত্তাকিম, ফয়েজ ও হাসানের সঙ্গে আছে ক্রোবার এবং খাটো লোহার পাইপ। মাসুদ রানার পকেটে আছে দুটো ডোর স্পার। এছাড়া সবার সঙ্গেই রয়েছে তিনটে করে কাপড়ের ব্যাগ। সবাই সশস্ত্র।

গাড়িতে ওঠার আগে সবাইকে আলাদা আলাদা চেক করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে রানা। নাদিরার মনে হয়েছে, যুদ্ধে যাওয়ার আগে অস্ত্র গোলা-বারুদ সৈনিকরা ঠিক মত সঙ্গে নিয়েছে কি না পরখ করে দেখছে ক্যাপটেন। সবশেষে রানাসহ তিনজন বাদে অন্য সবাই নাকের নিচে লাগিয়ে নিয়েছে নকল চওড়া গোঁফ। রানার ডান গালের আঁচিলটা এখনও আছে স্বস্থানে। সবুজ আর

বিপুলের প্রয়োজন হয়নি গোঁফ, কারণ ওদের আসল গোঁফ আছে। ওদের বরং সেগুলো খোয়াতে হবে পরে। কাজ শেষ হলে।

বাঁক নিয়ে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে এসে উঠল নাদিরা। সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা চেপে বসল আবার। যদি সফল না হয় ওরা? যদি ধরা পড়ে যায়? কি হবে তখন? তবে কথাবার্তায় মাসুদ রানাকে বেশ আস্থাশীল মনে হয়েছে ওর। রানার ধারণা, সাইলেন্ট অ্যালার্মের গোমর যখন জানা গেছে, আর কোন আশঙ্কা নেই। মিশন সফল হবেই।

রানার আস্থা প্রভাবিত করেছে অন্যদের, এমনকি ওকেও। অনেক সময় জুয়াড়ীদের মধ্যে এ ধরনের আস্থা দেখেছে নাদিরা, খেলতে বসার আগে কি করে যেন টের পায় তারা আসন্ন দান তাদের জন্যে জয় বয়ে আনবে। শিকারিদের ভেতরেও দেখেছে। শিকারে যাওয়ার আগেই বুঝে ফেলে তারা ভাগ্য কোনদিন প্রসন্ন থাকবে। যাত্রার শুরুতে নাদিরাও ব্যাপারটা কিছু কিছু টের পেয়েছে।

কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি ওদের। কেউ লিফট চায়নি ওদের কাছে, কোন পরিচিত লোকের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে খেজুরে আলাপে অংশ নিতে হয়নি। পুরোপুরি বাধাহীনভাবে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছে ওরা। অতএব আশা করা যেতে পারে, যে কাজে আসা সেটাও কোনরকম বিঘ্ন ছাড়াই সম্পন্ন হবে।

দূর থেকে অ্যান্টিক শপটা চোখে পড়ল সবার। 'একটু আস্তে করো,' বলল মাসুদ রানা। 'ওদের আরেকটু কাছে আসার সুযোগ দাও,' পিছনের শেড্রোলে ইঙ্গিত করল ও।

অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ কমাল নাদিরা। আরও সতর্ক মনোযোগ দিল ড্রাইভিঙে। 'হ্যাঁ, এইভাবে,' প্রশংসার সুরে বলল

রানা। 'আস্তে আস্তে যাও।'

ফিফটি থার্ড স্ট্রীটে পড়ল ফোর্ড। অ্যান্টিক শপের সামনে খালি, পৌঁছায়নি এখনও বনোমো ভ্যান। 'শিট,' গাল পাড়ল রানা। 'আরেক চক্কর ঘুরে আসা যাক পুরো ব্লক।'

তাই করল নাদিরা। অ্যান্টিক শপের সামনে দিয়ে উত্তরে চলল। পার্ক অ্যাভিনিউ হয়ে ফিফটি ফোর্থ স্ট্রীট, তারপর দক্ষিণে। আবার ম্যাডিসন হয়ে ফিফটি থার্ডে। ঠিক পিছন পিছন আসছে শেভ্রোলে।

এখনও দেখা নেই বনোমো ভ্যানের।

'ওরা দেরি করে ফেলেছে আজ,' ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বলল মাসুদ রানা হালকা স্বরে। 'মিনিট তিনেক।'

ওর কণ্ঠে কোন হতাশা নেই বুঝতে পেরে আরও অবিশ্বাসী হয়ে উঠল নাদিরা। মনের ভেতর জমে ওঠা হালকা ধোঁয়ার মেঘ কেটে গেল দ্রুত।

'আরেক চক্কর, নাদিরা।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করল সে নির্দেশটা। ঘুরে এল ব্লক। তারপর আরও একবার। একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে ট্রাফিকের চাপ। সাইড ওয়াক পুরোপুরি অফিস যাত্রীদের দখলে চলে গেছে। একটা দুটো করে দোকান-পাট প্রায় সবই খুলে গেছে। প্রতিটি ক্রসিঙে পথচারীদের পারাপারে সুবিধে করে দেয়ার জন্যে জায়গামত ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল এবার। দু'মিনিটের পথ অতিক্রম করতে চার মিনিট লাগল। শেষ বাঁক ঘুরে ম্যাডিসনে উঠল ফোর্ড।

এবং ভ্যানটার ওপর চোখ পড়ল সবার একসঙ্গে। অ্যান্টিক শপের সামনে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। কেউ নেই ওতে। আরেকটু কাছে এগোতে বোঝা গেল, ঠিক দোকানের সামনেই

নয়, জায়গার অভাবে আট-দশ গজ দূরে দাঁড়াতে হয়েছে আজ ওটাকে।

'একেই বলে ভাগ্য,' বিড়বিড় করে বলল মুত্তাকিম। 'জানালা দিয়ে ভেতর থেকে কেউ উঁকি দিলেও ভ্যানটা দেখতে পাবে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা। 'লক্ষণ ভালই।' ওটা যখন আর পঞ্চাশ গজ সামনে, নড়ে উঠল মাসুদ রানা। 'হাত চালাও,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ও।

বসে বসেই ঝট্‌পট্ কাপড় চোপড় খুলে ফেলল ওরা। নিচে পরা আছে বনোমো কভারলস্। শার্ট, প্যান্ট, কোট সব রেডিমেড, গতকালই কেনা হয়েছে। ওগুলো যার যার পায়ের কাছে দলা করে রাখল ওরা। ইউনিফর্মে পকেটের সংখ্যা বেশুমার। ওগুলো হাতড়ে জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কি না চেক করে নিল সবাই। তারপর রানার দেখাদেখি সবার হাতে বেরিয়ে এল একটা করে স্কিন কালারের টাইট মোজা।

'ভ্যানের সামনে থামো,' নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। 'ওটার পাঁচ ফুট তফাতে দাঁড়াও। এঞ্জিন বন্ধ করবে না।'

তাই করল নাদিরা। অ্যাকশন শুরু হতে যাচ্ছে ভেবে আবার কাঁপুনি উঠে গেল। ওরই ফাঁকে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল ওর। শেভ্রোলেটাকে দেখা গেল, ওদের পাঁচ ফুট পিছনে থেমে দাঁড়িয়েছে ওরা। দুটো গাড়ির মাঝখানে জায়গা খুব সামান্যই।

'গুড, গুড,' মৃদু স্বরে, আনমনে বলল রানা। নড়ল না ও। বসে থাকল চুপ করে। ওর দেখাদেখি পিছনের ওরাও বসে আছে তৈরি হয়ে। নড়ছে না কেউ। গাড়ি থেকে নামার কোন ব্যস্ততা নেই। যেন বসে থাকতেই এসেছে ওরা সবাই। এক এক করে মিনিট পেরিয়ে যেতে লাগল।

পাথরের মূর্তির মত বসে আছে সবাই। অ্যাভিনিউর ওপাশ দিয়ে একটা স্কোয়াড কার চলে গেল ধীরগতিতে। ভেতরে দুজন পুলিস বসা, একবারও এদিকে তাকাল না তারা। পেট্রলম্যান চোখে পড়ল না রানার একজনও। ঝাড়া দশ মিনিট অপেক্ষা করল ও। তারপর আলতো করে হাত রাখল ডোর হ্যাণ্ডেলে।

'এইবার!' মৃদু, চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও। 'বেরোও!'

পিছনের দু'জন মাথা দোলাল। বেরিয়ে পড়ল ধীরস্থির ভঙ্গিতে। ওদের দেখাদেখি পিছনের গাড়ির তিনজনও নেমে পড়ল, তারপর একযোগে পা বাড়াল সবাই ভ্যানের দিকে। তাড়াহুড়ার লেশমাত্র নেই কারও আচরণে, বরং গল্প করছে তারা নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসি করছে। দুনিয়ার কোনওদিকে নজর নেই।

ভ্যানের পিছনে গিয়ে থামল পাঁচজনের দলটা। হাসিমুখে পিছনের পাল্লা খুলল মুত্তাকিম বিল্লাহ, উঠে পড়ল সবাই ভেতরে। বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। এমন স্বাভাবিক ভাবে ঘটে গেল পুরোটা যে বিশ্বাসই হতে চায় না। পথচারীদের অনেকেই দেখেছে ওদের। কিন্তু একবারের বেশি দু'বার তাকায়নি। সব যখন স্বাভাবিক, তাকানোর কথাও নয়।

'চমৎকার,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। এখনও গাড়ি ত্যাগ করেনি ও। 'কি বলো! দারুণ দেখিয়েছে ওরা।'

ঘুরে তাকাল নাদিরা। ফ্যাকাসে হাসি মুখে।

'ভয় পেলে?'

'হ্যাঁ। তোমাদের কথা ভেবে।'

'চিন্তা কোরো না,' মেয়েটির কাঁধে মৃদু চাপড় লাগাল রানা। 'ঠিকই উৎরে যাব আমরা।'

অবাক হয়ে নতুন চোখে রানাকে দেখতে লাগল ও। এর

মধ্যেও কি করে মাথা ঠাণ্ডা রাখে মানুষ? চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। ভ্যানের ভেতরে কি করছে ওরা যেন দেখতে পাচ্ছে দিব্য চোখে। মোজার মুখোশ এতক্ষণে নিশ্চই পরে ফেলেছে সবাই, ভাবছে ও। এবং অস্ত্র নিয়ে দরজার সামনে এসে অবস্থান নিয়েছে মুত্তাকিম, বনোমোর ড্রাইভার হেলপারকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

আরও দশ মিনিট কাটল নীরবে। তারপর সোজা হয়ে গেল রানা। 'ওই আসছে।'

ঝট্ করে সামনে তাকাল মেয়েটি। অ্যান্টিক শপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল বনোমোর ওদের।

দরজা খুলে এক পা রাস্তায় নামিয়ে দিল মাসুদ রানা। কোন ব্যস্ততা নেই। ওই দু'জনের ভ্যানের পিছন দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, তারপর···

এগিয়ে গেল লোক দুটো, হেলপার লোকটা টান দিল দরজার হাতল ধরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল বরফের মত। মাত্র কয়েক ইঞ্চি তফাতে মূর্তিমান মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আহাম্মকের মত চেয়ে থাকল ওরা মুত্তাকিম বিল্লাহর হাতে ধরা জিনিসটার দিকে। পিছনে খুক্ কাশির আওয়াজে সচকিত হলো তারা, ঘুরে তাকাল। পরক্ষণে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা আর ওর হাতের ওয়ালথার দেখে।

'গেট আপ্!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

ওপর থেকে হাত বাড়াল ফয়েজ আহমেদ। এক এক করে তুলে নিল ওদের তিনজনকে। নাকের সামনে দু-দুটো অস্ত্র দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে লোক দুটো। বিন্দুমাত্র ট্যাঁ-ফোঁ করেনি, উঠে পড়েছে ভাল মানুষের মত। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এক মিনিট পর খুলে গেল আবার। নেমে এল ভ্যান ড্রাইভার

ও মাসুদ রানা। সবক যা দেয়ার, এর মধ্যে দিয়ে ফেলেছে ও ড্রাইভারকে। তারও ব্যাপারটা হজমে দেরি হয়নি। ক্যাবের দিকে হাঁটছে ড্রাইভার ধীর পায়ে, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে রানা। ডান হাত কভারলের পকেটে। সমান তালে পা ফেলে ভ্যানের সামনের দিকে পৌঁছল ওরা, প্যাসেঞ্জার'স সাইডে। দরজা খুলে ড্রাইভার উঠল প্রথমে, পিছলে চলে গেল নিজের আসনে। তারপর উঠল মাসুদ রানা। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

ঘড়ি দেখল নাদিরা, আটটা তেপ্পান্ন। ঢোক গিলল ও। কান দিয়ে গরম ভাপ বেরুতে আরম্ভ করেছে। ভোঁ ভোঁ করছে মাথার ভেতর। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সারা দেহ কাঁপছে ওর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভ্যান, নড়ছে না। দেরি করছে রানা ইচ্ছে করেই।

আটটা সাতান্ন মিনিটে বনোমো ভ্যানের একজস্ট পাইপ দিয়ে এক ঝলক সাদা ধোঁয়া বেরোতে দেখল নাদিরা, স্টার্ট নিয়েছে। ব্যাক লাইট জ্বেলে খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে পিছিয়ে এল ভ্যান। খোলা জায়গায় এসে ঘুরল, তারপর ঢুকে পড়ল দক্ষিণমুখো ট্রাফিকে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ড্রাইভারের মুখটা সামান্য সময়ের জন্যে দেখতে পেল নাদিরা। চকের মত সাদা হয়ে গেছে মানুষটা, নিচের ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে। মনে হলো এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে বুঝি। হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠল ও দূর থেকে কয়েকটা সাইরেনের আওয়াজ শুনে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসছে আওয়াজগুলো।

পরক্ষণেই লজ্জা পেয়ে গেল নাদিরা নিজের ছেলেমানুষির কারণে। আওয়াজটা কেন উঠেছে ভালই জানে ও। ঠিক সময়মত এই এলাকার স্কোয়াড কার আর ফায়ার ফাইটারগুলোকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আগেই ফন্দি এঁটে রেখেছিল রানা। কথা ছিল,

সময়মত শওকত ফোনে ওদের জানাবে যে আগুন লেগেছে রকফেলার সেন্টারে। তাই ঘটেছে। মিথ্যে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটছে ওরা।

চমৎকার ব্যবস্থা। সময়মত এদিকে পুলিস যত কম থাকে, ততই ওদের লাভ। ভ্যানের পিছন পিছন ফিফটি ফিফথ স্ট্রীটে পৌঁছল নাদিরা। শেভ্রোলে পড়ে থাকল অ্যান্টিক শপের সামনে। ওটাকে আর প্রয়োজন নেই। তারপর রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের সামনের নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে দাঁড়াল ভ্যান। ওটার কয়েক গজ দূরে, একটা নির্মাণ সামগ্রী খালাসে ব্যস্ত ট্রাকের আড়ালে ফোর্ড দাঁড় করাল নাদিরা। দু'চোখে গভীর আগ্রহ, সেই সঙ্গে ভয় নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। আয়নায় চোখ রেখে পিছনটা দেখছে।

বনোমো ড্রাইভার এবং মাসুদ রানা বেরিয়ে এল ভ্যান থেকে, ড্রাইভার'স ডোর দিয়ে। পাশাপাশি হেঁটে ভ্যানের পিছনে পৌঁছল দুজনে। পাল্লা খুলে ভেতর থেকে একটা ক্যানিস্টার টাইপ ভ্যাকিউম ক্লিনার ও লাঠির মাথায় ন্যাকড়া বাঁধা ঝাড়ন নিল ড্রাইভার। রানা নিল একটা গারবেজ বাকেট। অন্য হাত এখনও কভারলের পকেটে ওর।

দ্রুত পা চালাল ওরা রবার্টো গার্সিয়ার দিকে। বন্ধ গেটের সামনে পৌঁছে দাঁড়াল। দম বন্ধ করে দেখছে নাদিরা দৃশ্যটা, দৃষ্টি বিস্ফারিত। এক মুহূর্ত মাত্র, খুলে গেল দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানের পিছন দরজাও পুরোপুরি খুলে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ভেতরের পাঁচজন। মুখে সবার মোজার মুখোশ। রংটা চামড়ার রঙের হওয়ায় ভাল করে না তাকালে বোঝা যায় না। মাথা নিচু করে খুব দ্রুত ভ্যান আর রবার্টো গার্সিয়ার মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে গেল ওরা।

পুরোটা এত চমৎকারভাবে ঘটে গেল, আশপাশের কেউ কিচ্ছুটি টের পেল না। মাসুদ রানা দোকানের ভেতরে দু'পা এগোনোর আগেই পৌঁছে গেল রেজিমেন্টের অন্যরা। বন্ধ হয়ে গেল গেট।

ওরা সবাই এখন রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের ভেতরে।

ওদিকে, যে মুহূর্তে দোকানের গেট খুলে গেল, মাসুদ রানার বাঁ হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে গিয়ে আছড়ে পড়ল ড্রাইভার। ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হতভম্ব গার্সিয়ার সামনে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে সবিস্ময়ে, কিন্তু সময় পেল না। পলকে পকেট থেকে পিস্তল বের করেই ঠেসে ধরেছে রানা তার নাকের ডগায়। চোখ কপালে উঠল গার্সিয়ার, হাঁ হয়ে গেল মুখ। ওদিকে আরও কয়েকজন মুখোশ পরা ডাকাত ঢুকে পড়েছে ভেতরে। কোন চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই, ভয় পেয়ে দৌড় ঝাঁপ নেই। মাসুদ রানার লেখা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ীই সব ঘটতে লাগল পর পর।

মুত্তাকিম বিল্লাহ এবং হাসান ছুটল খোলা ভল্ট রুমের দিকে। এত দ্রুত জায়গামত পৌঁছে গেল ওরা, তখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি সামনের দরজা। সেফ রুমে ছিল দুই কারিগর, তাদের নিয়ে আসা হলো সামনে। এবং প্রত্যেককে শো রুমের ঠিক মাঝখানে জড়ো করা হলো। সতর্ক নজর রাখা হলো কেউ দেয়ালের ধারে কাছে যায় কি না, নায়ক হওয়ার চেষ্টা করে কি না।

চোখমুখ কুঁচকে মাসুদ রানা আর মুত্তাকিম বিল্লাহর দিকে পালা করে তাকাতে লাগল গার্সিয়া। 'তোমরা ভুল করছ,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'মারাত্মক ভুল করছ তোমরা।'

কেউ উত্তর দিল না ওরা। ইশারায় কর্মচারীদের হাঁটু গেড়ে

মেঝেতে বসে পড়তে বলল রানা। একবার ভয়ে ভয়ে মালিকের দিকে তাকাল তারা, তারপর বসে পড়ল নির্দেশমত। ঝটপট হাত-পা বেঁধে টেপ দিয়ে মুখ আটকে দেয়া হলো প্রত্যেকের। এরপর সার্চ করা হলো তাদের। একজন সেলসম্যান এবং একজন কারিগরের পকেটে পাওয়া গেল ট্র্যান্সমিটার অ্যালার্ম, বোঝাগুলো হালকা করে দেয়া হলো।

এছাড়া প্রত্যেকের পকেটেই একটা করে মিনি পিস্তল ছিল, সেগুলো সব নিজের পকেটে ভরল ফয়েজ আহমেদ। এবার বনোমো ড্রাইভারকেও ওদের মধ্যে বসিয়ে বেঁধে ফেলা হলো।

আবার কথা বলে উঠল গার্সিয়া, 'তোমরা জানো না কার দোকানে ডাকাতি করতে এসেছ,' প্রায় ধমকের সুরে বলল সে। 'এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও। কিছু বলব না আমি···।' কথাটা শেষ করতে পারল না সে। টেপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো তার কথা বেরোবার রাস্তা। তারপর আসল কাজে নামল মাসুদ রানা।

কাজ আগে থেকেই ভাগ করে দিয়েছিল ও। কাজেই কাউকে নতুন করে কিছু বলতে হলো না, যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। মাসুদ রানা থাকল গার্সিয়া এবং অন্যদের পাহারায়।

বাকিদের মধ্যে দু'জন গিয়ে ঢুকল সেফ রুমে, অন্যরা পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে শো কেসের কাঁচ ভাঙতে শুরু করল। ভেতরে সাজিয়ে রাখা সুদৃশ্য চামড়ার প্যাকেটগুলো টপাটপ ভরে ফেলতে লাগল নিজ নিজ হাত ব্যাগে। বাছাবাছির, দেখাদেখির সময় নেই। শোকেস ঝেঁটিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো সব। চারটে বড় বড় হাত ব্যাগ ভরে গেল।

ওদিকে পিছনের ভল্টও খালি করে ফেলেছে মুত্তাকিম ও ফয়েজ। মাঝে মধ্যে মাসুদ রানাও হাত লাগাচ্ছে ওদের সঙ্গে।

ওরই মাঝে থেকে থেকে হাতঘড়ি দেখে সতর্ক করছে সঙ্গীদের।

'পনেরো মিনিট।'

'দশ মিনিট।'

'আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

দ্রুত হাত চালাচ্ছে সবাই। ঘাম ছুটে গেছে প্রত্যেকের। শো কেস শেষ করে এবার উইণ্ডো কেস নিয়ে পড়ল ওরা। দেখতে দেখতে আটটা ব্যাগ পুরোপুরি ভর্তি হয়ে গেল।

'হাত চালাও, হাত চালাও!' ব্যস্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'সময় নেই। কুইক!' গার্সিয়ার ওপর খেপে আছে ও আসলে। ফার্নিচার আর কারিগরি সরঞ্জাম ছাড়া বিক্রি করার মত আর কিছু যাতে খুঁজে না পায় লোকটা দোকানে, নিশ্চিত করতে চায় তা।

দ্বিগুণ গতিতে হাত চালাচ্ছে অন্যরা। শো কেস, উইণ্ডো কেস, পিছনের সেফ সব একদম ফাঁকা করে তবে থামল। 'আর এক মিনিট!'

'হয়ে গেছে,' ঘোষণা করল বিল্লাহ।

'গুড।'

লুটের মাল ভর্তি ব্যাগগুলো এক এক করে দরজার সামনে এনে জড়ো করা হলো। মোট চোদ্দটা ব্যাগ। প্রতিটা প্রমাণ সাইজ বালিশের খোলের সমান। ওজন অস্বাভাবিক। পরীক্ষা করে দেখল মাসুদ রানা। একবারে নিয়ে বের হওয়া কঠিন। কিন্তু কাজ একবারেই সারতে হবে। 'বিল্লাহ, চারটে নাও। তোমরা দুটো করে। বিল্লাহ, হাসান, ফয়েজ ভ্যানে উঠবে। সবুজ, বিপুল আমাদের ব্যাক সীটে। আমি পিছনে থাকব সবার। সোজা, সহজভাবে গিয়ে গাড়িতে ওঠো। নো ওয়াইল্ড রানিং, বাট মুভ ফাস্ট। লেটস গো।'

হাসান বেরুল প্রথমে। দু'হাতে দুই ব্যাগ। তার পিছনে

বিল্লাহ, দুই হাতে দুটো করে ব্যাগ তার। ওদের পর ফয়েজ আহমেদ। এক হাতে দুটো ব্যাগ বইছে সে, অন্য হাত কভারলসের পকেটে। কয়েক পা এগিয়ে ভ্যানের পিছনে দাঁড়াল ওরা। দরজা খুলে ভেতরে ছুঁড়ে মারল ব্যাগগুলো। হাসান আর ফয়েজ উঠে পড়ল পিছনে, টেনে লাগিয়ে দিল দরজা। বিল্লাহ ধীর স্থির ভঙ্গিতে ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল।

পুরো ব্যাপারটা ঘটল অজস্র পথচারীর চোখের সামনে। কেউ কিছু সন্দেহ করল না। করার কথাও নয়। তিন ক্লিনার কাজ সেরে নিজেদের গাড়িতে ফিরছে, এতে সন্দেহের কি আছে?

এবার বেরুল সবুজ ও বিপুল। দুই পা আন্দাজ সামনে পিছনে আছে ওরা। দৃঢ়, অবিশ্বাসী পদক্ষেপে ফোর্ডের দিকে এগোল। পলকহীন চোখে ওদের দেখছে নাদিরা। কাছে এসে একটা ব্যাগ রাস্তায় নামিয়ে রাখল সবুজ, মেলে ধরল এপাশের দরজা, তারপর ওগুলো ধুপ্ ধাপ্ ভেতরে ছুঁড়ে মেরে নিজেরাও উঠে পড়ল।

'স্টার্ট দিন,' বলল বিপুল। 'এখনই এসে পড়বেন মাসুদ ভাই।'

চাবি ঘোরাল নাদিরা, মৃদু আওয়াজ তুলে স্টার্ট নিল ফোর্ড। ঘুরে তাকাল রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সের দিকে। ইটালিয়ান ডাকাতটার চেহারা এই মুহূর্তে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে ওর। দু'হাতে দুটো থলে নিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা।

গেটের পাশেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল ও দুটো। মোজার মুখোশ খুলে ফেলল চট্ করে, তারপরই ঝুঁকে দাঁড়াল, যেন জুতোর ফিতে বাঁধছে। দূরে থেকে ওর ডানহাতের ত্বরিত আগুপিছু দেখতে পেল নাদিরা, রাবারের ডোর স্পার দরজার নিচে গুঁজে দিয়েই সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। ব্যাগ দুটো

নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই ধাক্কাটা খেল।

মুখ তুলল মাসুদ রানা। কমপ্লিট সুট পরা স্মার্ট এক যুবক, ওর থেকে কম করেও তিন ইঞ্চি দীর্ঘ। ব্যায়ামপুষ্ট শরীর। বাঁ হাতের কব্জির সঙ্গে একটা কালো ব্রিফকেস হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকানো রয়েছে তার। এরই সঙ্গে খেয়েছে ও ধাক্কাটা। দোকানে ঢুকতে যাচ্ছিল যুবক, ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়েছে। মাসুদ রানাকে তার উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি দিতে দেখল নাদিরা, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল যুবক।

ফোর্ডের দিকে এগোল মাসুদ রানা। কোনরকম ব্যস্ততা নেই। ওদিকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যুবক, নড়ছে না। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে রানার দিকে। ফোর্ডের পিছন দিয়ে ঘুরে এপাশের আড়ালে চলে এল মাসুদ রানা, চট্ করে পিছনের দরজা খুলে ওর হাত থেকে ব্যাগ দুটো নিল বিপুল। এক পা এগিয়ে সামনের দরজা খুলল রানা, উঠে বসল নাদিরার পাশে। ভেতরে ঢোকার আগে আড়চোখে যুবককে দেখে নিয়েছে ও, এখনও এদিকেই তাকিয়ে আছে সে। আগেই বুঝেছে রানা, ওই যুবক গার্সিয়ার জুয়েলারি-সেলসম্যান।

নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন পড়ল না। সময়ের গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে নাদিরা আগেই। গিয়ার দিয়েই অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল সে। 'ডোণ্ট প্যানিক,' ঠোঁট না নাড়িয়ে বলল রানা। 'স্বাভাবিকভাবে এগোও।'

এখনও স্থির দাঁড়িয়ে সেলসম্যান। দ্বিধা কাটেনি। কিন্তু ফোর্ড নড়তে শুরু করামাত্র কাটল। ঝট্ করে একবার দোকানের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল, তারপর কি ভেবে এগিয়ে গেল কাছে। উঁকি দিল ভেতরে। পরমুহূর্তে লাফ দিল যুবক, বসে পড়ল এক হাঁটুতে ভর দিয়ে। কোন ফাঁকে ডান হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে

এসেছে তার। ওটা তুলল ফোর্ড লক্ষ্য করে।

একই সময় সামনে বাড়ল বনোমো ভ্যান। এবং যেন ওদের পালাতে সাহায্য করার জন্যেই ইস্ট ফিফটি ফিফথের সামনের লাল ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেল। নিশ্চল ট্রাফিক এগোতে শুরু করল।

গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পুরো এলাকা। চমকে উঠে থেমে দাঁড়াল পথচারীরা, কেউ কেউ চট্ করে বসে পড়ল পথে। আবার গুলি করল সেলসম্যান, পিছনের উইণ্ডশীল্ড ফুটো করে ফোর্ডের গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল বুলেট। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল নাদিরা।

'ভয় পেয়ো না,' নিজেই পেয়েছে ভয়, কিন্তু তা প্রকাশ হতে দিল না মাসুদ রানা। গলা যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল, 'চালিয়ে যাও।'

আবার গুলি ছুঁড়ল যুবক, এবার ভ্যান লক্ষ্য করে। স্টীলের দেহে লেগে 'ঠং' আওয়াজ তুলল বুলেটটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ভ্যানের পিছন দরজা। কে খুলল দেখতে পেল না রানা। যে-ই হোক, তাকে সতর্ক করার বা গুলি ছুঁড়তে বারণ করার কোন সুযোগও পেল না ও। পর পর তিনটে গুলির আওয়াজ কানে এল রানার। শেষ বিস্ফোরণের পরমুহূর্তে সেলসম্যানের পিস্তল ধরা হাতটা শূন্যে লাফিয়ে উঠতে দেখল রানা।

নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসে উঠল ও, 'ইডিয়ট!'

আকাশ ভেঙে পড়েছে যেন ফিফটি ফিফথ ইস্টে। চতুর্দিকে শুরু হয়ে গেল চেঁচামেচি। সঙ্গে গাড়ির হর্ন আর ব্রেক চাপার বিকট আওয়াজে নরক গুলজার। ধীরগতিতে এগোতে থাকা ট্রাফিক খানিক থমকে দাঁড়াল, পরক্ষণেই গ্রাঁ প্রি ট্রফি জেতার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চালকরা।

ভ্যানের রং সাইড দিয়ে সামনে যেতে চাইছিল এক ট্যাক্সি, ড্যাশ মেরে পাঁচ ফুট দূরে হটিয়ে দিল ওটাকে বিল্লাহ, তারপর ছুটল। চারদিকে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে পথ বের করে নিয়ে আগে আগে ছুটল ভ্যান। তার পিছনেই রয়েছে ফোর্ড। ভ্যানের তৈরি পথ ধরে ছুটছে।

ফিফটি ফিফথের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছল ওরা। ভয় পেয়ে গিয়েছিল নাদিরা, ভেবেছিল আর উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হলো। কিন্তু সামনেই বিস্তৃত সিক্সথ অ্যাভিনিউ দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল ওর। ফোর্ড ছোটাল সে তুফান বেগে।

'কারও লেগেছে?' পিছন না ফিরে বলল মাসুদ রানা।

'না, মাসুদ ভাই,' বলল সবুজ। 'আমাদের কারও লাগেনি।'

নয়

ভ্যান ছিল আগে, তাই আগেই পৌঁছল ওটা ওয়েস্ট ফর্টি সেভেনথ স্ট্রীটের পরিত্যক্ত গ্যারেজে। গেট বন্ধ করে বসেছিল ওরা ফোর্ডের অপেক্ষায়। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ফুটো দিয়ে বাইরেটা দেখল বিল্লাহ, তারপর খুলে দিল গেট।

'সমস্যা হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই।' ওকে বেরুতে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সে।

আস্তে করে নকল আঁচিল আর গোঁফটা তুলে ফেলল মাসুদ রানা। কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল এক পায়ে ভর দিয়ে। দু'হাত কোমরে। তাকিয়ে আছে ভ্যানের দিকে। পিছনের একটা পাল্লা খোলা ওটার। ওপর দিকের আট বাই আট ইঞ্চি কাঁচের জানালা চুরমার হয়ে গেছে গুলির আঘাতে। নিচের দিকে বেশ কাছাকাছি

দুটো বুলেটের গর্ত দেখা গেল একটা পাল্লার গায়ে। নাদিরা এসে দাঁড়াল রানার পাশে।

'গুলি খেয়েছে কেউ?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ, দু'জন।'

চাউনি সরু হয়ে এল মাসুদ রানার। 'কে কে?'

'প্রথমে খেয়েছে বনোমো হেলপার। ফ্লোরে শুয়ে থাকা অবস্থায়ই গুলি খেয়েছে লোকটা, সরাসরি মাথায় লেগেছে। স্পট ডেড।'

'আর?'

'হাসান। দুটো গুলি খেয়েছে। একটা মারাত্মক। মারা যাচ্ছে ও।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। 'চলো দেখি!'

টেইল বোর্ডে পা রেখে উঠে পড়ল রানা ভ্যানে। বিল্লাহ এবং নাদিরাও উঠল। ফ্লোরে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল রানা। দুই চোখের কোণ বিশ্রীভাবে কুঁচকে উঠল। রক্ত থৈ থৈ করছে ফ্লোরে। মনে হয় যেন কোন কসাইখানা এটা। তার ওপর পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা, মুখে টেপ সাঁটা হতভাগ্য বনোমো হেলপার।

দু'চোখ খোলা তার, বিস্ফারিত। চাউনিতে ফুটে আছে আতঙ্ক। মাথার একেবারে তালুতে ঢুকেছে বুলেটটা, চুরমার হয়ে গেছে খুলি। রক্তে ভাসছে হলুদ মগজ, বিচূর্ণ খুলি। তার পায়ের কাছে পা লম্বা করে মেলে দিয়ে বসে আছে ফয়েজ আহমেদ। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে তার। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ওদের লুটের মাল ভরা আটটা ব্যাগ। আর ক্লিনিং কোম্পানির বিভিন্ন সরঞ্জাম।

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে ফয়েজের। ভাবাবেগে ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে। তার কোলের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছে

লাজুক চেহারার, দুঃসাহসী হাসান। চোখ বোজা। দম নিচ্ছে ঘন ঘন। ওর পাঁজরের সামান্য নিচে, পাকস্থলী বরাবর একটা মোটা কাপড়ের অতিরিক্ত ব্যাগ কয়েক ভাঁজ করে চেপে ধরে আছে ফয়েজ। এরই মধ্যে রক্তে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ব্যাগটা।

হাঁটু গেড়ে বসল মাসুদ রানা, অপলক চোখে দেখল কিছুক্ষণ আহত যুবককে। ঘন ঘন দম নিচ্ছে ও, বুকটা ওঠা-নামা করছে হাপরের মত। নিঃশ্বাসে কেমন ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ উঠছে। কেশে উঠল হাসান, মুখের দুই কশ বেয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল রক্তমাখা বুদ্বুদ। ওর অন্য ক্ষতটাও দেখল রানা। ডান উরুতে ঢুকেছে বুলেটটা।

'কুত্তার বাচ্চা!' অসহায় রাগে ফুঁসে উঠল মাসুদ রানা।

এমন সময় চোখ মেলল হাসান। তার অনিশ্চিত, অস্থির চাউনি এদিক-ওদিক ঘুরল কয়েকবার, তারপর স্থির হলো রানার মুখের ওপর। ঠোঁট নড়ে উঠল যুবকের, কিছু যেন বলতে চায়। কিন্তু কোন আওয়াজ বের হলো না। ওর পেটের ক্ষতের ওপর ফয়েজের চেপে ধরে রাখা ব্যাগটা সামান্য তুলে উঁকি দিল মাসুদ রানা। এক পলক দেখেই বুঝল, সত্যিই মরে যাচ্ছে ছেলেটা।

উঠে দাঁড়াল ও। 'ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া দরকার, রানা,' ভয়তাড়িত চড়া গলায় বলল নাদিরা।

'কোন লাভ নেই,' বিষণ্ন মুখে এদিক-ওদিক মাথা দোলাল ও। অন্যরা ঘুরে তাকাল ওর দিকে। দৃষ্টি প্রাণহীন।

'কেন?'

'ও মারা যাচ্ছে।'

'কিন্তু সময়মত চিকিৎসা...'

'আশা থাকলে এতক্ষণে সে ব্যবস্থা নিশ্চই করতাম। এখন টানা-হেঁচড়ায় কেবল কষ্টই বাড়বে ওর, কাজ কিছুই হবে না।

আঘাতটা মারাত্মক, ভেতরের আর্টারি ছিঁড়ে গেছে।'

চোখে পানি চিক্ চিক্ করছে মেয়েটির। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কোন আশাই নেই?'

'না। আর দশ থেকে পনেরো মিনিট বাঁচবে হাসান বড়জোর।'

মুখ নিচু করে হাসানকে দেখতে লাগল নাদিরা। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে। দরদর করে পানি পড়ছে দুই গাল বেয়ে। 'তবু একবার শেষ চেষ্টা...!'

'যদি চান্স থাকত, তুমি কি মনে করো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতাম আমি? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো,' বিল্লাহকে দেখাল মাসুদ রানা, 'ও কি বলে!'

জিজ্ঞেস করতে হলো না। তার আগেই মাথা দোলাল দানব, 'নেই। কোন চান্স নেই।'

সরে এসে খোলা দরজার কাছে দাঁড়াল মাসুদ রানা। কাঁচা রক্তের আঁশটে গন্ধে ঘুলিয়ে উঠছে পেটের ভেতর। মৃদু কান্নার শব্দে ঘুরে তাকাল ও। প্রায় অচেতন হাসানের একটা হাত মুঠোয় পুরে কাঁদছে নাদিরা। 'আমার জন্যেই তোমার আজ এই অবস্থা। যাওয়ার আগে আমাকে ক্ষমা করে যাও, ভাই! ক্ষমা করে যাও।'

কাছে গিয়ে জোর করে উঠিয়ে আনল তাকে মাসুদ রানা। 'ওঠো। নিচে যাও।' তাকে সবুজ আর বিপুলের হাতে তুলে দিয়ে হাসানের কাছে ফিরে এল ও। স্থাণুর মত বসে থাকা ফয়েজের হাতে একটা হাত রাখল সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। চোখ তুলল হেভিওয়েট, চেহারা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না কান্না ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। 'হাসান মরে যাচ্ছে, মাসুদ ভাই,' ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল লোকটা।

উত্তর না দিয়ে ছেলেটার পাশে বসে পড়ল রানা। টকটকে

লাল কাপড়টা দেখল কয়েক মুহূর্ত, ওটা চুঁইয়ে বেরোনো রক্তে ফয়েজের হাত, কভারলস সব ভিজে গেছে। একজন মানুষের শরীরে এত রক্ত থাকতে পারে আগে কখনও ভাবেনি রানা।

স্নেহে হাসানের ঘামে ভেজা কপালে হাত বোলাল ও, আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিল এলোমেলো চুল। ছাইয়ের মত হয়ে গেছে মুখটা, আরও ঘন, গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ছে হাসান, যেন ভারি কোন ওজন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার বুকের ওপর।

'কোন ভয় নেই, হাসান,' কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বলল রানা। 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে। ভাল হয়ে যাবে তুমি। হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমরা তোমাকে। দেখো, এক সপ্তার মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। সেরা ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো হবে তোমার। শুধু একটু ধৈর্য ধরো, মন শক্ত করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি তুমি সহজে হাল ছাড়ার ছেলেই নও, যত যা-ই হোক...'

এমনি আরও অনেক কিছু বকে যেতে লাগল রানা নিচু, একঘেয়ে স্বরে। অনেকক্ষণ পর চোখের দু'পাশ কুঁচকে উঠতে দেখা গেল হাসানের, নড়ে উঠল ঠোঁট, যেন বলতে চায় কিছু। ওর মুখের সামনে কান নিয়ে এল মাসুদ রানা।

'আমি...আমাকে...,' থেমে গেল হাসান। মারা গেছে দুঃসাহসী, লাজুক চেহারার ছেলেটা। এইমাত্র ছিল, সংগ্রাম করছিল বেঁচে থাকার, হঠাৎ নেই হয়ে গেছে। এক ঝলক তাজা রক্ত বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, মাথাটা এক পাশে হেলে পড়ল। ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্ত যুবক। ওর চুলগুলো আরেকবার নেড়ে দিল মাসুদ রানা, জোর করে উঠে দাঁড়াল।

'ওঠো,' কঠোর স্বরে ফয়েজের উদ্দেশে বলল ও। 'কভারলস বদলাও। বসে থাকলে চলবে না এখন।'

নেমে এল রানা ভ্যান থেকে। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। একটা সিগারেট ধরাল। ভ্যানের গায়ে হেলান দিয়ে টানতে লাগল। চিন্তা করছে। অন্যমনস্ক। সবুজ, বিপুল, নাদিরা অনুমান করে নিয়েছে কি ঘটেছে। কেউ কোন প্রশ্ন করল না ওকে। পাশ দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ভ্যানে উঠল তারা মৃত সহকর্মীকে দেখার জন্যে।

নাদিরাও দেখল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল ভ্যান থেকে। কাঁদছে না এখন আর, কেবল ফোঁপাচ্ছে। 'এখন কাঁদাকাটির সময় নয়, নাদিরা। শান্ত হও, সামনে অনেক কাজ আমাদের,' বলল মাসুদ রানা।

'আগে কখনও চোখের সামনে কাউকে মরতে দেখিনি,' নিচু, কাঁপা গলায় বলল মেয়েটি। 'এই প্রথম।' উদ্‌ভ্রান্তের মত রানার দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা কেমন...কেমন অদ্ভুত, তাই না?'

'হ্যাঁ। সত্যিই অদ্ভুত,' পাশ থেকে বলল ফয়েজ। কভারলস পাল্টে এসেছে সে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। কেউ কিছু বলছে না। মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই সিদ্ধান্তের আশায়। রানা ভাবছে, পরের সম্পদ লুট করে গার্সিয়া ধনী, ওকে একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ও। নিজের সম্পদ খোয়া গেলে কেমন লাগে, হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে কাজ হয়েছে, তবে দুটো প্রাণের বিনিময়ে। এখন নিশ্চয়ই টের পাচ্ছে গার্সিয়া কেমন লাগে।

ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখন জাবের আহমেদের নিজেরগুলো বাদে লুটের মালের মধ্যে অন্য আর যে সব আছে, সেগুলো বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। বিক্রির টাকাটা গোপনে হতভাগ্য হেলপারের পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে।

শেখ জাবেরেরগুলো তুলে দেয়া হবে হ্যামিলটনের হাতে। কুয়েত পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে সে ওগুলো। সেই সঙ্গে হাসানের মৃতদেহেরও ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে ওটা। কিন্তু সিদ্ধান্তটা তখনই ঘোষণা করল না ও।

'অল রাইট,' বলল রানা। 'ব্যাগগুলো গাড়িতে তোলো। সরে পড়ার সময় হয়েছে।'

দ্রুত হাত চালাল সবাই। পালাবার সময় ব্যবহারের জন্যে যে দুটো গাড়ি রাখা ছিল গ্যারেজে আগে থেকে, তার ট্রাঙ্কে ভরা হলো ওগুলো। সবশেষে তোলা হলো হাসানের মৃতদেহ। বনোমো হেলপারের লাশ রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। পুলিসই করবে তার ব্যবস্থা। যে কাপড় দিয়ে হাসানের ক্ষত চেপে ধরে রেখেছিল ফয়েজ, সেটা নিয়ে এল রানা। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল। কয়েক মিনিটে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ওটা।

'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

আধ ঘণ্টা পর পিছনের গেট দিয়ে রানা এজেন্সির বাউণ্ডারিতে ঢুকল দুটো গাড়ি। কেউ খেয়াল করল না ব্যাপারটা। দোতলায় একটা গেস্ট রুম আছে, মালপত্র নিয়ে ওটায় ঢুকল সবাই। শওকতের ওপর হাসানের মৃতদেহের ভার দিল মাসুদ রানা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর পড়ল লুটের মাল নিয়ে।

একটা ব্যাগ নিয়ে এল বিল্লাহ। মুখ খুলে উপুড় করে ঢেলে ফেলল সব কার্পেটে। নানা রঙের দ্যুতিতে হেসে উঠল যেন ঘরটা। ডায়মণ্ড বসানো আঁটো কণ্ঠহার, আংটি, পেনডেনট-ইয়াররিং সব চিকচিক করছে। মনে হচ্ছে যেন আগুন ধরে গেছে ওগুলোয়। সবাই সব ভুলে মোহাবিষ্টের মত চেয়ে থাকল জিনিসগুলোর দিকে। ভুলে গেল ওগুলো লুটের মাল, দু'দুটো প্রাণ ঝরে গেছে জিনিসগুলোর জন্যে।

'দেখো,' নাদিরাকে বলল রানা। 'এর মধ্যে তোমাদের কোনওটা আছে কি না।'

এগিয়ে এল মেয়েটি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। আধ ঘণ্টা পর মাথা নাড়ল। 'না, নেই।'

সবগুলো আবার ব্যাগে ভরা হলো। খোলা হলো আরেকটা ব্যাগ। এটার মধ্যে যা আছে, সব সুদৃশ্য চামড়ার মোড়কে রয়েছে, খোলা কিছুই নেই। প্রথম যে বড় মোড়কটা পেল, খুলে ফেলল রানা। চোখ কপালে উঠল সবার। ডায়মণ্ড আর এমারেল্ড বসানো অসম্ভবরকম সুন্দর তিন ঝালরওয়ালা সোনার নেকলেস। ডায়মণ্ডটা প্রকাণ্ড, বসানো রয়েছে মাঝের ঝালরে। বিস্ময়ে নানা ধ্বনি বেরুল একেকজনের মুখ থেকে।

'কি এটা?' রানার প্রশ্নে থেমে গেল সবাই। ওর মুখের দিকে তাকাল। কোনদিকে নজর নেই মাসুদ রানার, নেকলেসের মোড়কের ঢাকনা দেখছে ও গম্ভীর মুখে। ওটার ভেতর দিকে লেখা একটা নাম। সবাই পড়ল নামটা, আরেকবার বিস্ময় প্রকাশ করল সশব্দে। লেখা রয়েছে ওখানে: ডিভোল্ট ব্রাদার্স। সান ফ্রান্সিসকো।

'তার মানে?' বলল ফয়েজ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল মাসুদ রানা। 'আমিও তাই ভাবছি।'

'গার্সিয়া লুট করেছে ডিভোল্ট ব্রাদার্স?'

'মনে তো হচ্ছে। অন্য বাক্সগুলো খোলো দেখি।'

নীরবে হাত চলতে লাগল সবার। সবগুলো বাক্স খোলা হলো। তারপর হাত গুটিয়ে বসে থাকল ওরা। প্রতিটা বাক্সে ওই একই নাম লেখা।

'অন্য ব্যাগগুলোও খোলো সব একটা একটা করে।'

শেষ বিকেলের দিকে কাজ শেষ হলো ওদের। সবগুলো ব্যাগ এবং বাক্স খুলে ভেতরের জিনিসে চোখ বোলানো শেষে বসে থাকল সবাই চুপ করে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে প্রত্যেকে। শেখ জাবেরের মালের অর্ধেকও নেই এখানে, বিক্রি করে দিয়েছে গার্সিয়া। আছে কেবল লুটের মাল। সেন্ট লুইস, ডেনভার, শিকাগো, ডালাস থেকে লুট করা। সেই সঙ্গে লণ্ডন, রোম এবং রিওর কয়েকটা কোম্পানির সীলওয়ালা মালও আছে।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে বসে আছে মাসুদ রানা। চোখে পলক পড়ছে খুব ঘন ঘন। অনেক, অনেকক্ষণ পর সিধে হলো ও। বুঝল, সকালে যে লোকটা গোলাগুলি শুরু করেছিল, সে বা তার মত আর যারা আছে, আসা-যাওয়া করে নিয়মিত গার্সিয়ার ওখানে, ওরা কেউ সেলসম্যান নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গার্সিয়ার হয়ে বড় বড় জুয়েলারি দোকান লুট করে ওরা। তারপর লুটের মাল পৌঁছে দিয়ে যায় রবার্টো গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্সে।

ওখানকার পিছনের রূমে ওগুলো ভেঙে-গলিয়ে রিসেট করা হয়। ওদের নামের ছাপ বসানো হয়, তারপর বিক্রির জন্যে শো-কেসে সাজানো হয়। ও মাই গড! চুলে আঙুল চালাতে লাগল মাসুদ রানা, তার মানে গার্সিয়ার এত বড় ব্যবসা বিনা পুঁজির ব্যবসা? সব ডাকাতির মাল?

নাদিরারগুলো, যা যা পাওয়া গেল, সব আলাদা করা হলো। বাকি সব ঠেসে ঢোকানো হলো ব্যাগে। তারপর আবার ভাবতে বসল রানা। নতুন লাইনে।

'হ্যালো!' বলল মাসুদ রানা।

'ইয়েস?'

'মিস্টার জেস হ্যামিলটনকে দিন।'

'কে কথা বলবেন, প্লীজ?'

'উডওয়ার্ড।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল মমির ফিসফিসে কণ্ঠ। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার উডওয়ার্ড।'

'হোয়াট?'

'কিসের কনসাইনমেন্টের কথা সেদিন বলেছিলেন এখন বুঝতে পারছি আমি। কিন্তু আমার পক্ষে কাজটা নেয়া সম্ভব নয়। কথা ছড়িয়ে গেছে।'

'কথা ছড়িয়ে গেছে মানে? কিসের কথা?'

'বন্ধুদের বন্ধুর দোকান লুট করেছেন আপনি···আপনারা, ঠিক না? সেই কথাটাই ছড়িয়ে গেছে। আমি দুঃখিত। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার খুব ইচ্ছে আমার। আর হ্যাঁ, নাদিরা নামে কাউকে খুঁজছে গার্সিয়া। চেনেন নাকি তাকে?'

'শুনুন, মিস্টার···'

'দুঃখিত, কানে কম শুনি আমি।' ফোন রেখে দিল হ্যামিলটন।

চোখ কুঁচকে রিসিভারের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ মাসুদ রানা, তারপর রেখে দিল আলতো করে।

'কি হলো?' পাশ থেকে জানতে চাইল নাদিরা। ওর মুখ দেখে কিছু অনুমান করে নিয়েছে ও।

'জেস হ্যামিলটন মাল পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে।'

'অ্যাঁ! সে কি?'

'ভয় পেয়েছে লোকটা।' চুলে আঙুল বোলাতে লাগল রানা। চিন্তিত।

দশ

আবার মীটিং বসেছে রানা এজেন্সিতে। জরুরি পরিস্থিতির কারণে ডাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মীটিং। বিকেল গড়িয়ে যেতে বসেছে। মাসুদ রানা, বিল্লাহ, ফয়েজ আর শওকত আছে পুরানোদের মধ্যে, আর আছে ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ চেহারার এক ডজন যুবক। এরা প্রত্যেকে দীর্ঘদেহী, পেটা স্বাস্থ্যের অধিকারী। পরিষ্কার খুনীর ছাপ এদের চাউনিতে। দেখলেই কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রানা এজেন্সির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য এরা।

দীর্ঘ সময় ধরে চলল মীটিং।

সন্ধে জেঁকে বসেছে। গাড়িঘোড়ার প্রচণ্ড ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটছে ওরা। গাড়ি চালাচ্ছে ছদ্মবেশী নাদিরা। মাসুদ রানা বসেছে ওর পাশে। এ মুহূর্তে গোঁফ বা আঁচিল কোনটিই নেই রানার, চুলও ফিরে পেয়েছে নিজের বৈশিষ্ট্য। বিল্লাহ আর ফয়েজ, ওরাও নিজের নিজের আসল চেহারা ফিরে পেয়ে খুশি। ওরা দু'জন বসেছে পিছনে। সবুজ আর বিপুল নেই এবার সঙ্গে। ওরা ফিরে গেছে যার যার কাজে।

লিঙ্কন টানেল পেরিয়ে নিউ জার্সি টার্নপিকে উঠল গাড়ি, তারপর ছুটল দক্ষিণে। মাসুদ রানার হাতে একটা গালফ অয়েল ম্যাপ, ঝুঁকে বসে ড্যাশবোর্ডের অস্পষ্ট আলোয় ওটা দেখার কসরৎ করছে সে। পিছনের কেউ একজন নাক ডাকছে।

'তোমার ঘুম পায় না?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা।

'অসময়ে পায় না,' বলল রানা আনমনে। দু'পাশে তাকাল ও। ট্রাফিকের ভিড় অন্য সময় বিরক্তিকর হলেও এখন ভালই

লাগছে আমার। বেশ নিরাপদ বোধ করছি।'

নতুন একটা উইগ মাথায় পরেছে মেয়েটি আজ। রংটা আগুনে লাল এবং কমলার মাঝামাঝি। ঘন কোঁকড়া। চেহারার সঙ্গে মানায়নি একেবারেই। কিন্তু প্রাণ নিয়ে টানাটানির মুহূর্তে সেদিকে লক্ষ করার উপায় বা সময় কোনটাই ছিল না। গ্রে রঙের ট্রেঞ্চকোট পরেছে মাসুদ রানা। বিল্লাহ আর ফয়েজও তাই পরেছে। নাদিরা পরেছে টুইড স্কার্ট এবং অ্যাঙ্গোরা পুলওভার। গাড়ির কাঁচ সবগুলো তোলা, তবু বেশ শীত করছে। টেম্পারেচার শূন্যের কয়েক ডিগ্রি নিচে। গাড়ির ট্রাঙ্কে চারটে প্রকাণ্ড সুটকেসে রয়েছে ওদের লুটের মাল। নাদিরারগুলো রয়েছে আলাদা একটা ব্রিফকেসে। মাসুদ রানার পায়ের কাছে পড়ে আছে সেটা।

'পথে কিছু কেনাকাটা করতে হবে,' বলল রানা। 'সবার জন্যেই বাড়তি কিছু গরম কাপড়-চোপড় সঙ্গে রাখা দরকার। তাছাড়া দু'য়েকটা সুটকেস, গরম কফি রাখার জন্যে থার্মোস, আর খাবার বইবার জন্যে পিকনিক চেস্ট। ওসব সঙ্গে থাকলে গাড়ি চলা অবস্থাতেই খেয়ে নিতে পারব আমরা। থামাথামির ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন হবে না।'

'তুমি আশা করো আমরা এই গেরো থেকে উদ্ধার পাব?' নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল নাদিরা।

'একশোবার।'

রাত দুটো। নিউ জার্সির ওপর দিয়ে দক্ষিণে ছুটছে ওদের গাড়ি ঝড়ের গতিতে। পিছনের ট্রাঙ্কে বোঝাই লুটের মাল। রানার অনুমান, দশ-বারো মিলিয়ন দাম হবে ওগুলোর কম করেও।

পিছনের সীটের নিচে রয়েছে পুরো এক প্লাটুন সৈন্যের উপযুক্ত সরঞ্জাম। ছয়টা পিস্তল, চারটে সাব-মেশিনগান, চারটে জার্মান মেশিন পিস্তল, গোটা দশেক হ্যাণ্ড গ্রেনেড, গোটা ছয়েক

স্মোক বম্ব, পর্যাপ্ত গোলা বারুদ এবং ছুরি-চাকু ইত্যাদি। জিনিসগুলো তোলার সময় ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছিল ফয়েজ, 'এ দিয়ে ইচ্ছে করলেই বুলগেরিয়া দখল করে নিতে পারি আমরা।'

রওনা হওয়ার আগে নাদিরাকে সতর্ক করে দিয়েছে মাসুদ রানা, 'স্পীড লিমিট ব্রেক করবে না ভুলেও। তাতে সন্দেহ জাগবে পুলিসের। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালালে পুলিস ফিরেও তাকাবে না। খেয়াল রাখবে, কোন মতেই পুলিসের নেক্ নজরে পড়া চলবে না।'

ওর পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে মেয়েটি। শুধু যেখানে হাইওয়ে পেট্রলের ভয় কম, সেখানে একটু জোরে চালাচ্ছে। অথচ ওদের আশপাশে প্রায় সবাই ক্রমাগত বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে আইনকে। যে যত জোরে পারে ছুটছে। কিন্তু রানার এক কথা, গতি বাড়াবে না। ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখছে ও নিবিষ্ট মনে, তর্জনী দিয়ে রূট ট্রেস করছে।

'কাল হয়তো সমস্যা একটা দেখা দেবে,' অন্যমনস্কের মত নিজেকেই শোনাচ্ছে যেন ও। 'নিউ ইয়র্ক থেকে যে কয়টা স্টেটে যাওয়ার রাস্তা আছে, সবগুলোয় গার্ড বসিয়ে দেবে এফবিআই। সবগুলো টার্নপিক, ন্যাশনাল হাইওয়েতে আড্ডা গাড়বে ওরা।'

নাদিরা বলল, 'বিমানে চড়লে কি অসুবিধে? অথবা ট্রেন বা বাসে?'

'ভুলে যাও। গার্সিয়া ডাকাতির ঘটনা রিপোর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ওসব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিস। সীল করে দিয়েছে। ওরা অনুমান করে নেবে দক্ষিণই আমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ এ মহূর্তে, অতএব সেদিকেও সব রাস্তায় ঘাঁটি গাড়বে ওরা। সব টার্নপিকে নজর রাখবে। কাজেই আমাদেরকেও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। যতদূর পারা যায়, মেইন রোড এড়িয়ে

সেকেণ্ডারি রোড ধরে চলতে হবে।'

'কিন্তু টাকা?' বলল মেয়েটি। 'সঙ্গে ক্যাশ তো বেশি নেই। কোত্থেকে জোগাড় হবে তা?'

'নেই। কিন্তু হতে কতক্ষণ?'

'মানে?'

'মানে দামী দামী কিছু জুয়েলারি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করব। ট্যুর অ্যালাউন্স বা টি. এ, যাই বল।'

দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল নাদিরা, 'সেটা কি ঠিক হবে?'

'কোনটা ঠিক হবে তাহলে, যার যার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা? সেটা পুলিস আর এফবিআইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ''ওরা ওদিকে চলেছে, ওরা ওদিকে চলেছে?'' '

'তাইতো?'

'কাজেই বিক্রি করতেই হবে ওর থেকে। সবাইকে কিছু না কিছু বিক্রি করতে হবে জায়গা বুঝে। একা কারও পক্ষে বেশি জিনিস নিয়ে বের হওয়া উচিত হবে না। তাতে অবশ্যই সন্দেহ জাগবে মানুষের। আবার একবারে বেশি কিছু বিক্রি করারও প্রয়োজন নেই, পথ চলার মত টাকা জোগাড় হলেই হলো।'

চুপ করল মাসুদ রানা। মন দিল ম্যাপ দেখায়। 'আর একঘণ্টা পর বাঁক নিতে হবে ডানে, ফিলাডেলফিয়ার পথ ধরতে হবে। একদিন বিশ্রাম ফিলাডেলফিয়ায়। একদিন বিশ্রাম। ব্যবসা করে অর্থোপার্জন। তারপর ফের যাত্রা। রাতের বেলা।'

'তারপর?' মৃদু কণ্ঠে বলল নাদিরা।

'ঠিক নেই। সময় সুযোগ বুঝে রাত-দিন সবসময় চলতে হবে, পালা করে। আসল কথা কোন প্যাটার্ন সৃষ্টি করতে চাই না আমরা। কিছু টের পেতে দিতে চাই না ইটালিয়ান হারামজাদাকে।'

'তুমি ঠিক জানো ও আসবেই?'

'কে, গার্সিয়া? খুব বেশি পিছনে নেই ও আমাদের। সঙ্গে পুলিস এফবিআই-ও আসছে। একদম শিওর আমি।'

কিছুক্ষণ নীরবে ড্রাইভ করল মেয়েটি। রানার কথায় ভয় ধরে গেছে নতুন করে। ঘন ঘন ভিউ মিররে তাকাল কয়েকবার, পিছনে সন্দেহজনক কোন গাড়ি চোখে পড়ে কিনা দেখার আশায়। 'কিন্তু রানা, এত জায়গা থাকতে আমরা মায়ামিতেই কেন যাচ্ছি?'

'তুমি কোথায় যেতে সাজেস্ট করো?'

'মিডওয়েস্ট,' বলল নাদিরা। 'শিকাগো, অথবা লস অ্যাঞ্জেলেস, যেখানে আমরা যেতে পারি চিন্তাও করবে না ওরা।'

'মায়ামির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা খাটে। ও দুটোর মত মায়ামিও বড়, জনসংখ্যার চাপে পেরেশান।'

এক সময় কামডেন প্রবেশ করল ওরা। শহরটা ছোট, তবে ছিমছাম। পথের দু'পাশে দেখতে দেখতে এগোল রানা। পিছনে এখন দু'জনেই নাক ডাকছে। ডজনখানেক হোটেল-মোটেল পেরিয়ে এল ওরা, কোনটায় ভ্যাকান্সি নোটিস দেখা গেল না। অবশেষে পাওয়া গেল যা খুঁজছে। নাম ফ্লো-মার'স। কপালে ঝুলছে রূম খালি নোটিস। ভ্যাকান্সির দুই নম্বর 'এ' নেই, জায়গাটা ফাঁকা।

হয়তো স্বামী-স্ত্রী, নিজের নিজের নামের প্রথম অংশ জুড়ে নাম দিয়েছে হোটেলের। কি নাম হতে পারে ওদের? ভাবল রানা, ফ্লোরেন্স-মার্টিন?

ভবনটা এক তলা, বেশ পুরানো ধাঁচের। ইউ শেপড্। সার দেয়া কামরা। খুশি হয়ে উঠল রানা। গাড়ি নিয়ে সোজা নিজের নিজের রূমের দরজায় পার্ক করতে পারে বোর্ডার। গাড়ি ছেড়ে

সিঁড়ি বেয়ে তিন ধাপ উঠলেই রূমের দরজা। পার্কিং লট নেই, লবি নেই, কিচ্ছু নেই। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল গাড়ি নাদিরা। ইঙ্গিতে হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল রানা।

'স্টার্ট চালু রাখো,' বলল রানা। 'আমাকে যদি ছুটে আসতে দেখো, চট্ করে ঘুরিয়ে নেবে গাড়ি।'

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। পাঁচ মিনিট পর হাসিমুখে ফিরে এল মাসুদ রানা। 'দারুণ। পাশাপাশি দুটো ডবল রূম পাওয়া গেছে। আট, নয়। নিয়ে ফেললাম।'

'আসল নামে?'

'পাগল নাকি?'

'কে কার সঙ্গে রূম শেয়ার করবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল নাদিরা।

ব্যাপার টের পেয়ে হাসল রানা। 'লেডিস ফার্স্ট। তুমিই বলো কাকে নিয়ে শেয়ার করতে চাও। ওরা দু'জনেই,' ইঙ্গিতে পিছনের সীট দেখাল ও, 'ভাল মানুষ। যাকে বলে পারফেক্ট ভদ্রলোক। তোমার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।'

আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'কিন্তু ওরা ভীষণ নাক ডাকে।'

'না না। নিঃশ্বাস নেয় গভীরভাবে, এই যা।'

'হয়েছে হয়েছে,' মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'বুঝেছি। তোমার সঙ্গেই শুতে হবে আমাকে।'

'আমার সঙ্গে?'

'মানে তোমার রূমে আর কি!'

'কিন্তু আমারও তো নাক ডাকে।'

'বিছানা?'

'বিছানা কি?'

'দুটো করে তো? নাকি একটাই?'

'এই যাহ্! তা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!' জিভ কাটল রানা। 'দাঁড়াও, গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল ও, 'শুনে আসি।'

'থাক,' ওর কোটের আস্তিন টেনে ধরল নাদিরা। 'আর শুনে আসতে হবে না। ভেতরে গিয়েই দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে। ওহ্, আরেকটা কথা।' পকেট থেকে চকচকে কিছু একটা বের করল রানা। 'এটা পরে নাও রিং ফিঙ্গারে।'

'কি?'

'ওয়েডিং রিং।'

'আবার?'

'হ্যাঁ। অচেনা জায়গা। আমরাও আগন্তুক। কি দরকার মানুষের মনে প্রশ্ন উদয় হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার? ওটা তোমাকে পরা দেখলে লোকে ভাববে...'

'আমি তোমার বউ,' ওর কথা শেষ করল মেয়েটি।

'আমিও চাই লোকে তাই ভাবুক। অনেক ঝামেলা কমে যাবে তাহলে।'

আংটিটা রানা নিজেই পরিয়ে দিল নাদিরার হাতে। সামান্য ঢিলা, তবে মানিয়েছে চমৎকার। 'এটা তোমার পকেটে এল কি করে?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'রওনা হওয়ার আগে বের করে রেখেছিলাম, বিপদে কাজে লাগতে পারে বলে। এখন দেখ, সত্যিই লেগে গেল।'

ট্রাঙ্ক থেকে সুটকেসগুলো বের করে হোটেল রুমে নিয়ে এল ওরা। ব্রিফকেসটাও আনা হলো। অন্ধকারে ডুবে আছে অন্য সব রুম। ঘুমে বেহুঁশ সবাই। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। চেইন লাগিয়ে দিল। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বিছানায় উঠে পড়েছে নাদিরা।

দুটো সিঙ্গেল বিছানা দেখে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়েছে মেয়েটি, ভাবল রানা। ঘরে ঢোকার দশ মিনিটের মাথায় ঘুমিয়ে পড়ল অন্যরা। ঘুম নেই কেবল মাসুদ রানার চোখে। রাস্তার দিকের একটা জানালা সামান্য ফাঁক করে চেয়ার নিয়ে বসে আছে ও। পাহারা।

পরদিন এগারোটার সামান্য পরে ঘুম ভাঙল নাদিরার। চোখ পুরোপুরি মেলার আগেই বুঝে গেল কোথায় আছে ও। কেন এসেছে এখানে। পাশের বিছানায় চোখ পড়তে ঘুমের রেশ কেটে গেল। খালি বিছানাটা। মাসুদ রানা নেই।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল সে। জানালার পাল্লা খোলা দেখে সেদিকে এগোল। সামনেটা ফাঁকা, গাড়ি নেই। ব্যাপার কি? দরজা খুলে উঁকি দিল ও। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ফয়েজকে। দরজার শব্দে ঘুরে তাকাল সে। মেয়েটিকে দেখে হাসল। 'ঘুম ভাঙল?'

লজ্জা পেল ও। 'খুব ধকল গেছে তো গত দিনটা। তাই...।'

'গোসল করলে করে ফেলুন। আমি আপনার নাস্তা দিতে বলি।'

'ওরা কোথায়?'

'মাসুদ ভাই? বিল্লাহকে নিয়ে আশপাশটা চক্কর দিয়ে দেখে আসতে গেছেন। আমাকে রেখে গেছেন আপনাকে আর সুটকেসগুলো পাহারা দিতে।'

'কি দেখতে গেছে?'

'তেমন কিছু না। এমনিই জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখা আর কি। আর কিছু কেনাকাটাও আছে অবশ্য। মাসুদ ভাই একটা লিস্ট বানিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'আমার জন্যে টুথ ব্রাশ আর পেস্ট আনলে হয়। ওসব কিছুই নেই।'

ওর কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল দ্বিতীয় ফোর্ডটাকে। পরে প্রয়োজন হবে বলে অন্য যে দুটো গাড়ি প্রস্তুত ছিল, এটি তার একটি। চালাচ্ছে মুত্তাকিম। ওদের একেবারে নাকের ডগায় এসে থামল গাড়ি। বেরিয়ে এসে পিছনের ফুটবোর্ডে রাখা দুটো নতুন সুটকেস বের করল মাসুদ রানা। দোলাতে দোলাতে উঠে এল বারান্দায়। দুই সুটকেস ভর্তি জিনিসপত্র কিনে এনেছে ও।

টুথ ব্রাশ, পেস্ট, রেজর, অ্যাসপিরিন, শেভিং ক্রীম, কোলন, পাউডার, এক বোতল ভদকা, এক বোতল স্কচ্, সিগারেট, ক্যাণ্ডি বার, ক্র্যাকার্স, ইনসট্যান্ট কফি, থার্মোস জাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা ব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে বাথরুমের উদ্দেশে ছুটল নাদিরা।

গোসল সেরে তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এল একবারে। 'খবরের কাগজ এনেছ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এই নাও,' এক কপি এনকোয়েরার এগিয়ে দিল মাসুদ রানা।

প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় করে ছাপা হয়েছে খবরটা। হেডিং: নিউ ইয়র্কে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের জুয়েলারি লুট। পুলিস দুষ্কৃতকারীদের খুঁজছে।

'এক মিলিয়ন?' চোখ কোঁচকাল নাদিরা। 'তার মানে? কাকে কে ধোঁকা দিতে চাইছে?'

'গার্সিয়া দিতে চাইছে পুলিস এবং অন্যান্যদের। তুমি নিশ্চই আশা করো না ওই দোকানে দশ-বারো মিলিয়ন মূল্যের লুটের মাল রয়েছে তা সবাইকে জানিয়ে দেবে ও? খবরটা পড়ার পর থেকে কেবল হাসি পাচ্ছে আমার। ব্যাটা পড়েছে মহাফ্যাসাদে।

কইতেও পারছে না, সইতেও পারছে না। যাকগে, নাস্তা এখানেই আনিয়ে নিতে চাও, না বাইরে গিয়ে খাবে? সামনে ভাল একটা রেস্টুরেন্ট দেখে এলাম, যদি যেতে চাও...'

'চাই,' বাধা দিল মেয়েটি।

'অল রাইট। তৈরি হয়ে নাও।'

কত ঘণ্টা পর গরম খাবার জুটল কপালে, খেয়াল নেই। একেকজন দু'জনের সমান খেলো ওরা, বিল্লাহ খেলো তিনজনের। একটা কর্নার বুদে বসেছে ওরা। মাসুদ রানা এমন আসন বেছে নিয়েছে, যেখান থেকে প্রবেশ পথ পরিষ্কার দেখা যায়। খাওয়ার ফাঁকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ও সেদিকে।

প্রথম কাপ কফি ওদের শেষ হওয়ার পথে, এই সময়ে জানতে চাইল রানা কার কাছে কত ক্যাশ আছে। নাদিরার হাত ব্যাগ খুঁজে তিনশো ডলারের কিছু বেশি পাওয়া গেল। ফয়েজের কাছে চল্লিশ এবং বিল্লাহর পঁয়ষট্টি। রানার পেটমোটা মানিব্যাগ থেকে বের হলো পুরো দুই হাজার। 'যথেষ্ট নয়,' মন্তব্য করল ও। 'সঙ্গে আরও ক্যাশ থাকা প্রয়োজন।'

'মাল কিছু বেচে দিলে হয়,' বলল বিল্লাহ।

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল রানা। 'বোঝাও কমবে, কাজও হবে।' দুই নম্বর কাপ শেষ করে সিগারেট ধরাল ও, টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর চাপিয়ে ঝুঁকে বসল। 'শোনো, তোমরা তিনজন তিন দিকে...'

নিচু গলায়, থেমে থেমে বলে যেতে লাগল ও কাকে কি করতে হবে। প্রথমে গাড়ি নিয়ে ফিলাডেলফিয়ার কোন শপিং সেন্টার বা আর কোন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যাবে ওরা, ওখানে নেমে পড়বে সবাই, এক এক জন রওনা দেবে একেকদিকে। হেঁটে অথবা ট্যাক্সি চেপে। নাদিরাকে একাজে সঙ্গে নেয়ার ইচ্ছে

ছিল না, কিন্তু এবারও ওর কাছে অবশেষে নতি স্বীকার করল রানা। যাবেই সে।

ফয়েজ বেছে নিল পুরুষদের হাতঘড়ি। চমৎকার এনগ্রেভ করা অ্যান্টিক হাতঘড়ি। ওর মধ্যে ভাল ভাল দেখে গোটা ছয়েক বেছে নিল সে। বেশি ইচ্ছে করেই নিল না, তাতে ফুলে থাকবে পকেট, ঢল ঢল করবে। 'একেক দোকানে একটার বেশি বিক্রি করা চলবে না,' পরামর্শ দিল রানা। 'কিছু যদি কেউ জানতে চায়, বলতে হবে, ঘড়িটা তার বাবার ছিল। তিনি মারা গেছেন। এ মুহূর্তে কিছু নগদ টাকা দরকার, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিক্রি করতে হচ্ছে জিনিসটা।'

'যদি নাম জানতে চায় আমার?'

'বলবে।'

'আসল নাম?'

'না। তবে আমার মনে হয় আসল-নকল কোন নামই জানতে চাইবে না কেউ।'

'দাম কত চাইব?'

'পাঁচশো দিয়ে শুরু করবে,' বলল রানা। 'হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে কেউ কেউ, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ভাব দেখাবে। কিন্তু হাল ছেড়ো না, দর কষাকষি করবে। যদি প্রয়োজন বোঝো, দুইশো পর্যন্ত নামবে। তারপরও যদি আরও কম করাবার জন্যে চাপাচাপি করে, বেরিয়ে আসবে। তবে আমার মনে হয় ওরা তোমাকে যেতে দেবে না। ঘড়িগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু আছে, ঠিকই কিনবে শেষ পর্যন্ত।'

নাদিরার দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'তুমি নাও বিয়ের আংটি, সলিটেয়ার আর হেয়ার ব্যাণ্ড। একটার বেশি আংটি এক দোকানে বের করবে না। জানতে চাইলে বলবে, অল্প দিন হলো ডিভোর্স

হয়েছে স্বামীর সঙ্গে। এবং তার দেয়া কোন জিনিস রাখতে চাও না তুমি। ওদেরকেই দাম অফার করতে বলবে, তুমি বলবে তার সঙ্গে আরও ফিফটি পারসেন্ট যোগ করে। শেষ পর্যন্ত চাপাচাপি করবে, দাম যত বেশি আদায় করে নিতে পারবে, ততই মঙ্গল। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু একটার বেশি আংটি দেখালে ক্ষতি কি? অনেক মেয়েরই একাধিক ওয়েডিং রিং থাকে।'

'ঠিক আছে,' একটু চিন্তা করে বলল রানা, 'তবে জায়গা বুঝে।'

'আর তুমি আর বিল্লাহ? তোমরা কি করবে?'

'আমরাও একই কাজে বেরোব।'

ঠিক হলো হোটেলে ফিরে যার যার জিনিস নিয়েই বেরিয়ে পড়বে সবাই। কাজ করবে বিকেল পর্যন্ত। তারপর পাঁচটায় মিলিত হবে এক জায়গায়।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

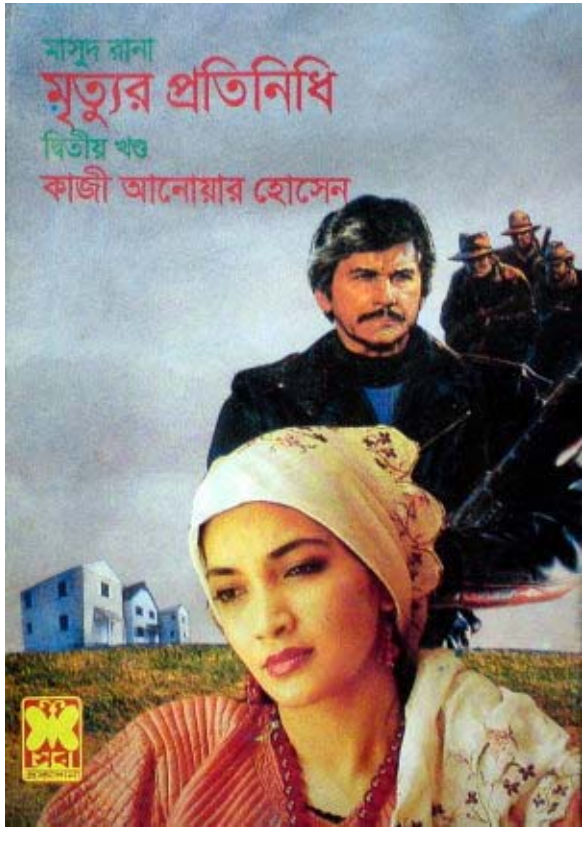

মাসুদ রানা

মৃত্যুর প্রতিনিধি-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

‘ইয়েস, লেডি?’ নাদিরাকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সাইনবোর্ড পড়তে দেখে এগিয়ে এল মোটাসোটা, বৃদ্ধ দোকানি। দোকানটা ক্যাথিড্রাল রোডে। সাইনবোর্ডের নিচের দিকে লেখাগু উই বাই অ্যাণ্ড সেল ডায়মণ্ড, গোল্ড অ্যাণ্ড সিলভার।

ভেতরে চলে এল ও। রিং ফিঙ্গারে পরা আংটিটা দেখাল বৃদ্ধকে। ‘এটা বিক্রি করতে চাই।’

ওর হাতটা ধরল দোকানি। ‘বিয়ের আংটি, তাই না?’ নাদিরাকে মাথা দোলাতে দেখে সে-ও মাথা দোলাল সমঝদারের মত। ঝুঁকে দেখতে লাগল জিনিসটা। ‘ভালমত দেখা দরকার।’

‘শিওর, দেখুন না।’

আস্তে করে আংটিটা খুলে নিল বৃদ্ধ। ‘এত লুজ কেন?’

‘ওহ্, সম্প্রতি বেশ ওজন হারিয়েছি আমি।’

মাথা দোলাল লোকটা। ‘আচ্ছা! তা অবশ্য এমন কিছু নয়। যখন তখন ঘটতে পারে।’

দোকানের ব্যাক রূম থেকে বেরিয়ে এল বুড়োর ডবল সাইজের এক বুড়ি। প্রথমে আগ্রহ নিয়ে নাদিরাকে দেখল সে। তারপর স্বামীর হাতে চমৎকার একটা আংটি দেখেই ওর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। ‘কি, দেখি!’ স্বামীর ঘাড়ে প্রায় চড়াও হওয়ার জোগাড় করল বুড়ি।

'দাঁড়াও। আগে আমাকে দেখতে দাও,' পিছিয়ে গিয়ে নিজের ওয়ার্কিং ডেস্কে বসল বৃদ্ধ। টেবিল ল্যাম্প জ্বালল। তারপর চোখে লুপ এঁটে ঝুঁকে পড়ল আংটিটার ওপর। 'কেন বেচতে চাও এ আংটি?' একই ভাবে ঝুঁকে আছে সে।

'স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমি চাই না ওর কোন স্মৃতি সঙ্গে রাখতে।'

'কেন ছাড়াছাড়ি হলো?' প্রশ্ন করল বুড়ি। 'লোকটা ভাল ছিল না?'

মাথা দোলাল নাদিরা। 'ও একটা জানোয়ার!'

চোখ কোঁচকাল মহিলা। 'মারধোর করত নাকি তোমাকে?'

ভাল মেয়ের মত মাথা দোলাল ও। 'করত।'

'শুনলে?' স্বামীর দিকে ফিরল বৃদ্ধা। 'হতচ্ছাড়া মারধোর করত একে।'

'শুনলাম।' আংটি উল্টেপাল্টে দেখল দোকানি। 'হরহামেশা ঘটছে এরকম।'

'এইসব স্বামীদের ধরে ধরে…'

'আহ্! থামো, কথা বলতে দাও। তা, এটার দাম কত হলে চলবে, ইয়াং লেডি?'

'পাঁচ হাজার।'

চোখ কপালে তুলল বৃদ্ধ। 'পাঁচ হাজার, লেডি!'

'আমার স্বামী…মানে, প্রাক্তন স্বামী বলেছিল, পাঁচ হাজার দিয়েই ওটা কিনেছে সে বছর দেড়েক আগে।'

বড়সড় মাথাটা ডানে-বাঁয়ে দোলাল বৃদ্ধ। 'আস্ত একটা মিথ্যুক তোমার স্বামী, দুঃখিত, প্রাক্তন স্বামী। এক হাজারের এক ডলার বেশিও দাম হতে পারে না এই আংটির। সে যাক, আমি পাঁচশো পর্যন্ত দিতে পারব।'

'মাত্র? থাকগে, ফেরত দিন আমার আংটি। দেখি অন্যখানে…।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, রাগ কোরো না। এই আংটির বর্তমান বাজারদর হতে পারে এক হাজার। রিটেইল। কিন্তু অত টাকা দেয়ার উপায় নেই আমার। তোমার জন্যে সাড়ে সাতশো পর্যন্ত উঠতে পারি আমি, অ্যাট বেস্ট।'

নাদিরা বুঝল, বুড়োর পছন্দ হয়েছে আংটি, সহজে ছাড়তে চাইবে না। কাজেই ঝোলাঝুলি আরম্ভ করল। ও ধীরগতিতে নামতে লাগল, আর বুড়োর দর চড়তে লাগল। অবশেষে এক ঘণ্টা পর ষোলোশো পঞ্চাশে পাকা হলো দাম।

'ক্যাশ দিতে হবে।'

হাসি মুছে গেল বৃদ্ধের। 'ক্যাশ? লেডি! দেখে কি মনে হয় এরকম একটা দোকানে এত ক্যাশ মজুত থাকতে পারে? চেক দেব আমি, তবে চিন্তার কারণ নেই, আমার চেক ক্যাশের মতই দারুণ। কাল সকালে প্লেস করা মাত্র…'

'কিন্তু আজ রাতেই মায়ামি চলে যাচ্ছি আমি। হাতে সময় নেই। তাই ক্যাশ চাই আমার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করল দোকানি। 'সরি, লেডি। অত ক্যাশ নেই আমার কাছে।'

'তাহলে কত আছে?' বলেই বুঝল নাদিরা কাজটা বোকার মত হয়ে গেল। কিন্তু কি আর করা!

'কুড়িয়ে কাচিয়ে বড়জোর দেড় হাজার হতে পারে।'

তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো নাদিরাকে। বুড়ো-বুড়ি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে। বারবার আশীর্বাদ জানাতে লাগল যেন ওর মায়ামির নতুন জীবন আনন্দময় হয়।

প্রথম দোকানের মত সহজে কাজ আদায় করা গেল না আর

কোথাও। দুটো দোকান প্রায় অভদ্রের মত হাঁকিয়ে দিল ওকে, কারণ তাদের কোনরকম পারচেজ ডকুমেন্ট দেখাতে পারেনি নাদিরা। কয়েকটা দোকান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এমন দাম বলল, ভাবখানা, হয় দাও, নয় বিদেয় হও গোছের। তাই সই, বিক্রি করে ভার কমাতে থাকল নাদিরা।

একটা দোকানে ঘটল অন্যরকম ঘটনা। মালিক লোকটা অল্পবয়সী, টাক মাথা। মুখে পচা দুর্গন্ধ। বাঁ চোখে কালো পট্টি বাঁধা। একটা ভিক্টোরিয়ান ওয়েডিং রিং কিনল সে কোনরকম দরদাম না করেই, নাদিরার হাঁকা দরে।

'আর কিছু আছে নাকি বিক্রি করার মত, ম্যাম? নিয়ে আসুন না! দাম নিয়ে ভাববেন না, যা চাইবেন তাই দেব।'

'ধন্যবাদ। ভেবে দেখব।'

'আপনি আবার আসবেন আশা করতে পারি?' আগ্রহে চকচক করে উঠল তার একমাত্র চোখটা।

'দেখি।'

ঘুরতে ঘুরতে পা ব্যথা হয়ে গেল নাদিরার। সাড়ে চারটের মধ্যে সাতটা রিং বিক্রি করে ফেলল ও। কাঁধের ব্যাগে জমা পড়েছে সাত হাজার ডলার। সাড়ে চারটের দিকে ফেরার তাগিদ অনুভব করল সে। ট্যাক্সি নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল দেরি না করে।

ফোর্ডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাসুদ রানা, মুখে চওড়া হাসি। 'কেমন করলে ব্যবসা?'

'অনেক,' শ্রান্ত মুখে আলো ফুটল মেয়েটির। 'সাতের বেশি।'

'মাই গড!' তাজ্জব হয়ে গেল রানা। 'বলো কি! অবশ্য জানতাম ভাল করবে তুমি, কিন্তু তাই বলে এত হবে ভাবিনি। আমি পেয়েছি মাত্র সাড়ে চার। ভেবেছিলাম আমিই বুঝি সবচে'

বেশি পেয়েছি।'

'তোমারগুলোর চেয়ে বেশি দামী ছিল আমারগুলো।'

গায়ের ওপর ব্রেক কষার আওয়াজে ঘুরে তাকাল ওরা। রানার হাত উঠে গিয়েছিল হোলস্টারের দিকে। থেমে গেল ওটা মাঝপথে। একটা ট্যাক্সি। পিছন থেকে নামল বিল্লাহ ও ফয়েজ। খুশিতে আটখানা। 'ওরাও বোধহয় হারিয়ে দিল আমাকে,' মুখ কালো করে বলল মাসুদ রানা।

দেখা গেল ওর ধারণাই সত্যি হয়েছে। দু'জনে মিলে সাড়ে আট হাজার কামাই করেছে ওরা। অল্প কথায় যার যার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল ওরা, কিছু সন্দেহ করেছে কি না কেউ, তেমন কোন আভাস কেউ দিয়েছে কি না। সবার বক্তব্য শুনে নিশ্চিত হলো রানা, না, তেমন চিন্তার কোন কারণ নেই। দুই একজন খদ্দের যে ওরা আবার আসবে কি না, বা বিক্রি করার মত আর কিছু আছে কি না জানতে চেয়েছে, তা নেহায়েৎ ব্যবসায়িক কারণেই। ওর পিছনে কোনরকম দুরভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় না। এ ধরনের ডিলে লাভ হয় আশাতীত, সেটা বুঝেই খোঁজ-খবর করেছে তারা।

'তার মানে বিশ হাজারের মালিক এখন আমরা,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল মাসুদ রানা। 'তারও বেশি। গুড। রীতিমত বড়লোক বলা চলে আমাদের। চলো সবাই, হোটেলে ফিরে মানুষ হওয়া যাক আগে, তারপর শানদার খানাপিনা হবে আজ। খানিক বিশ্রাম নিয়ে রওনা হতে হবে আবার।'

গোসল করল ওরা, শেভ করল। নাদিরাও গোসল করল। তারপর সবাই মিলে তৈরি হয়ে নিল ডিনারে বেরুবার জন্যে। আটটা বেজে গেছে ততক্ষণে। বেরুতে গিয়েও কি মনে করে থেমে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'এক মিনিট।'

'কি হলো?' প্রশ্ন করল নাদিরা।

'ফিরে এসে যখন রওনা হতেই হবে, মালপত্র প্যাকিঙের কাজ এখনই কেন সেরে রেখে যাই না? পরে ভরপেটে কষ্ট করতে হবে না।'

'গুড আইডিয়া,' বলল বিল্লাহ। 'সেই ভাল। খেয়ে উঠে কাজ করতে একদম ভাল লাগে না আমার।'

'রাখো।' আবার কি যেন চিন্তা করল রানা।

'আবার কি?' কপাল কোঁচকাল মেয়েটি।

'আমরা যদি এখনই চেক আউট করি, অসুবিধে কি? মালপত্র সব গাড়িতে থাকবে। খেয়েদেয়ে ওই পথে রওনা হয়ে যাব আমরা। কি বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ, মন্দ হয় না,' সায় দিল নাদিরা। 'সেই ভাল।'

অতএব যার যার কাপড়-চোপড়, অন্য আর সব গোছগাছের কাজে লেগে পড়ল ওরা। ঠেসে ঠুসে ঢোকানো হলো সব গাড়ির ট্রাঙ্কে। নাদিরার ব্রিফকেস আগের মত রানার হাতেই থাকল। বিছানাপত্রের ক্যারিঅল স্থান পেল পিছনের সীটে, ফয়েজ আর মুত্তাকিমের সঙ্গে।

রিসেপশন ডেস্কে এসে সবাই ভিড় করল ওরা। দুই রুমের চাবি এগিয়ে দিল রানা। 'আমরা চেক আউট করছি।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ, জরুরী কাজ পড়েছে।'

'আবার আসবেন আশা করি?'

'নিশ্চই! আপনাদের আতিথেয়তার তুলনা হয় না।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'এখানে ভাল ডিনার আশা করা যায়, এমন এক রেস্টুরেন্টের

নাম বলুন দেখি!'

'কি খেতে চান, স্যার?'

'স্টেক, বীফ রোস্ট, এইসব আর কি।'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল লোকটা, 'আঙ্কেল টম'স ট্যাভার্ন। এসবের জন্যে সেরা হোটেল এখানে। হাইওয়ে ধরে সোজা গিয়ে বাঁয়ে টার্ন নেবেন, তারপর সোজা দুই মাইল গেলে পড়বে ওটা। হাতের ডানে।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'বাইরে থেকে দেখে হয়তো পছন্দ হবে না রেস্টুরেন্টটা, কিন্তু রান্না ওদের সত্যিই চমৎকার।'

লোকটাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। এবার ড্রাইভ করছে মাসুদ রানা। যা বলেছিল রিসেপশনিস্ট, ঠিক তাই। নামের মত চেহারাটাও সেকেলে আঙ্কেল টম'স ট্যাভার্নের, কিন্তু রান্না অতুলনীয়। সামনে বিশাল কার পার্ক, গাড়িতে বোঝাই।

ভেতরের দেয়াল ও সিলিঙের চলটা প্রায় সবটুকুই ঝরে গেছে, কিন্তু সেজন্যে দেখতে তত খারাপ লাগে না। সুন্দর সাদা রং করা। দুই মাথায় বড় দুটো ফায়ার প্লেস, ভেতরে জ্বলছে গ্যাস লগ। টেবিল চেয়ার পুরানো হলেও চমৎকার দেখতে। ওক কাঠের তৈরি সমস্ত ফার্নিচার। ঝকঝকে পালিশ করা।

এক মাথায় মেহগনির দীর্ঘ বার, তার পিছনে লাল ভিনাইল দিয়ে চার কিনারা মোড়া বিশাল আয়না। বারটেণ্ডার আর ওয়েট্রেসরা প্রত্যেকে স্মার্ট। মেন্যু দেখে ধুমসে অর্ডার দিল ওরা, খেলো গলা পর্যন্ত ঠেসে। গল্প আর হাসাহাসি চলল সমান তালে। ওরই ফাঁকে চারদিকে সতর্ক নজর রাখল প্রত্যেকে। সবাই মনে রেখেছে এখানে পিকনিক করতে আসেনি ওরা।

সাড়ে এগারোটার দিকে আসন ছাড়ল নাদিরা। 'এক্সকিউজ মি। লেডিজ রুমে যাচ্ছি আমি।'

এক ওয়েট্রেসকে জায়গাটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল সে। বাথরুম ছেড়ে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেক আপ ঠিক করতে লাগল। এই সময় ব্যাপারটা নজরে পড়ল তার। আয়নায় পিছনের রেস্টুরেন্ট পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। অজস্র খদ্দের। তার ভেতর চেনা একটা মুখ চোখে পড়ল। তাকিয়ে থাকল নাদিরা।

পরক্ষণেই সচকিত হলো। ও যখন লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে, লোকটাও মুখ তুললে দেখতে পাবে ওকে, হয়তো দেখে ফেলেছে এরই মধ্যে। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল নাদিরা। অস্বস্তি লাগছে। ওই লোক এখানে কেন? ভেতরে তাড়া থাকলেও ভাব ভঙ্গিতে প্রকাশ করল না সে। ধীরপায়ে নিজেদের টেবিলের দিকে ফিরে চলল। দূর থেকে ওর চেহারা দেখে কিছু একটা অনুমান করে নিল মাসুদ রানা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না।

নিজের আসনে বসল নাদিরা। ন্যাপকিন তুলল। তারপর মুখ নিচু রেখে ঠোঁট যথাসম্ভব না নাড়িয়ে বলল, 'রানা! বোধহয় ঝামেলা।'

'মানে?' বলেই হাসল রানা। চেয়ার টেনে নাদিরার আরও কাছে এসে একটা হাত তুলে দিল তার কাঁধে। 'ঠিক আছে,' বলল ও। মুখে হাসি। 'যদি ঝামেলা হয়েই থাকে, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করো, আর খুলে বলো কি হয়েছে।'

'সবশেষে যে জুয়েলারি দোকানে গিয়েছিলাম আমি, ওটার মালিককে দেখতে পেয়েছি আমি এখানে। ড্রিঙ্ক করছে।'

'তাই?' মুহূর্তে হাজার মাইল গতিতে কাজ শুরু করে দিল

রানার মাথা। হাসিমুখে বিল্লাহ ও ফয়েজের উদ্দেশে বলল ও, 'তোমরা কাজ চলিয়ে যাও। হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করো। মুখ তুলবে না। আমাদের দিকে তাকাবে না। নাদিরা, বলো এবার। লোকটা কি রকম দেখতে?'

'টাক মাথা। বাঁ চোখে কালো পট্টি। ওপাশে করিডরে যাওয়ার পথের পাশের টেবিলটায় বসেছে।'

বারের পিছনের আয়নায় চোখ রাখল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ, দেখেছি। তুমি শিওর এ সেই লোক?'

'ড্যাম শিওর।'

একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। মুখ উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়ল সিলিঙের দিকে। তারপর, যেন ধোঁয়া গেছে চোখে, মুখ ঘুরিয়ে চোখ কচলাতে লাগল। এই ফাঁকে আরও ভাল করে তাকাল লোকটার দিকে। 'হুঁম!'

'এই লোকটা কোনরকম দামাদামি করেনি। যা চেয়েছি তাই দিয়ে দিয়েছে। জানতে চেয়েছে বেচার মত আরও কিছু আছে কি না। বলেছি আমি তোমাকে।'

'হ্যাঁ, বলেছ।' চিন্তা করতে লাগল রানা।

ওদিকে মুত্তাকিম আর ফয়েজ নিজেদের গল্পে মশগুল। কফি পান করছে, সিগারেট ফুঁকছে। তবে কান এদিকে রয়েছে, সব শুনছে ওদের আলাপ।

হঠাৎ কথা বলে উঠল বিল্লাহ। ঠোঁট না নাড়িয়ে ফয়েজের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ব্যাপারটা কো-ইন্সিডেন্সও হতে পারে। হয়তো কোন ডেট আছে লোকটার, তাই এসেছে। অথবা হয়তো ডিনার করতেই এসেছে। আফটার অল, আঙ্কেল টম'স ট্যাভার্নের নাম ডাক খুব।'

'হ্যাঁ,' ঘেউ করে উঠল ফয়েজ। 'ফিলাডেলফিয়া থেকে

এতপথ ঠেঙিয়ে কামডেন এসেছে ডিনার করতে! তোমার কল্পনার রেলগাড়ি থামাও, বিল্লাহ।'

'বলছ?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'থামো তোমরা,' বলল রানা। 'নাদিরা, মনে করার চেষ্টা করো, ওর দোকান থেকে বেরিয়ে কি করেছিলে তুমি।'

একটু চিন্তা করল মেয়েটি। 'ওখান থেকে বেরিয়ে আরও কয়েক দোকানে গিয়েছি। এটা-ওটা বিক্রি করেছি।'

'দোকানে লোকটা একা ছিল?'

'হ্যাঁ। একা ছিল।'

'ব্যাক রূমেও কেউ ছিল না?'

'ব্যাক রূমে?' থতমত খাওয়া চেহারা হলো মেয়েটির। 'না, মানে, ব্যাক রূমের দিকে খেয়ালই ছিল না আমার। সরি।'

'বুঝলাম,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'ও ব্যাটা নিশ্চই কিছু টের পেয়েছে। যে কারণে তুমি ওর দোকান ত্যাগ করার পর ও পিছু নিয়েছে তোমার। প্রথমে শপিং সেন্টার, পরে আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এবং সেখান থেকে এই পর্যন্ত। হতে পারে,' মাথা দোলাতে লাগল রানা। 'হতে পারে।'

'আমি খুবই দুঃখিত, রানা,' অপরাধীর চেহারা করে বলল নাদিরা।

'এতে তোমার কোন দোষ নেই, নাদিরা। দোষ-ভুল যা হয়েছে, সবকিছুর জন্যে আমি দায়ী। আমার উচিত ছিল তোমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া।' কিছুক্ষণ ভাবল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে, শোনো সবাই। আমি বেয়ারা ডেকে বিল দিতে বলছি এখন। বিল পে করে উঠে যাব আমরা। আস্তে ধীরে গল্প করতে করতে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের, খেয়াল রেখো। হুড়োহুড়ি

নয়। যেন দুনিয়ার কোনদিকে খেয়াল নেই, ড্যাম কেয়ার।

'বাইরে গিয়ে আমি, নাদিরা এবং ফয়েজ গাড়িতে উঠব। বিল্লাহ, তুমি বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। পার্কিং লটের কোথাও গিয়ে ঠাঁই গাড়বে। সেখান থেকে রেস্টুরেন্টের প্রবেশ পথ যেন দেখা যায়। যদি দেখো লোকটা আমাদের পিছু নেয়নি, তাহলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা নেহাৎ দৈব-সংযোগ। সেক্ষেত্রে কোন কথা নেই।

'কিন্তু যদি দেখো যে পিছু লেগেছে ব্যাটা, অনুসরণ করতে যাচ্ছে আমাদের। তাহলে বুঝতেই পারছ,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে অন্য কিছু নয়, কেবল অজ্ঞান করবে তুমি লোকটাকে, ঠিক আছে?'

মাথা দোলাল মুত্তাকিম বিল্লাহ, 'জ্বি।'

'কাজটা হতে হবে অন্যরকম। ওর ঘড়ি, ওয়ালেট, ক্রেডিট কার্ড সব নিয়ে নেবে। যদি সম্ভব হয়, অজ্ঞান দেহটা ওর নিজ গাড়ির ড্রাইভিং সীটে তুলে দিয়ো। লোকে ভাববে গলা পর্যন্ত গিলেছে। ওকে?'

'ওকে, বস্।'

তুড়ি বাজাল রানা ওয়েটারের উদ্দেশে। নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমরা কিছুদূর গিয়ে অপেক্ষা করব। এখানকার পরিস্থিতি যাই হোক, ঠিক পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসব আমরা তোমাকে তুলে নিতে। সবাই স্বাভাবিকভাবে এগোবে গেটের দিকে, ভুলেও লোকটার দিকে তাকাবে না কেউ। লেট'স গো।'

বিল মেটাল রানা নগদে। আশাতীত বকশিশ দিল বেয়ারাকে। তারপর একযোগে আসন ছাড়ল সবাই। হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে এগোল গেটের দিকে। দুনিয়াদারি সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন। পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে তৎপর হলো ওরা। হঠাৎ করেই যেন পারিপার্শ্বিকতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে পড়েছে।

মাসুদ রানা, নাদিরা ও ফয়েজ দ্রুত পা চালাল গাড়ির দিকে। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা, নাদিরা বসল তার পাশে। ফয়েজ পিছনে। স্টার্ট দিল রানা, টায়ারের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে লট থেকে পিছিয়ে এল, তারপর ঘুরেই ছুটল বড় রাস্তার দিকে। বিল্লাহ ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে। পার্কিং লটেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে সে, কিন্তু কোথায়, দেখতে পায়নি ওরা কেউ।

'বাজে কয়টা?' গাড়ি থার্ড গীয়ারে তুলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বারোটা বাজতে সতেরো মিনিট বাকি,' হাত তুলে রাস্তার আলোয় ঘড়ি দেখে বলল ফয়েজ। কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

'চোখ রাখো ঘড়িতে। ঠিক তিন মিনিট পর জানাবে আমাকে।

ধীরগতিতে কামডেনের দিকে এগোল মাসুদ রানা। হাত চোখের সামনে তুলে ধরে বসে আছে ফয়েজ, চোখ কুঁচকে আছে গভীর অভিনিবেশের ফলে। এক সময় হাত নামাল সে। 'পোনে বারো।'

গাড়ি রাস্তার ডান পাশে নিয়ে এল মাসুদ রানা, গতি কমিয়ে পিছনের গাড়িগুলোকে ওকে ওভারটেক করার সুযোগ করে দিল। তারপর অ্যাক্সিলারেটর ঠেসে ধরে হুইল ঘোরাল বন্ বন্ করে। একই গতিতে ফিরে চলল আঙ্কেল টম'স ট্যার্ভানের দিকে।

পুরোটা যেতে হলো না। বড় রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে এসে ওদের অপেক্ষায় রয়েছে মুত্তাকিম বিল্লাহ। গাড়ি দাঁড় করাল রানা। ফয়েজ পিছনের দরজা মেলে ধরতেই মাথা নিচু করে অদ্ভুত এক লাফ দিয়ে ভেতরে উঠে বসল সে। আবার টার্ন নিল

রানা। দ্রুত ছুটল টার্নপাইকের দিকে।

'তারপর?' বলল রানা।

'পথের ফকির বানিয়ে রেখে এসেছি কানা ব্যাটাকে,' হাসল বিল্লাহ। 'ওয়ালেট, ক্রেডিট কার্ড, হাতঘড়ি সব এখন আমার পকেটে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'তার মানে সত্যিই আমাদের অনুসরণ করছিল লোকটা।'

'কোন সন্দেহ নেই। আপনারা রওনা হওয়ার পরমুহূর্তে সে-ও বেরিয়ে আসে। পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে ছুটছিল নিজের গাড়ির দিকে।'

আর কোন প্রশ্ন করল না মাসুদ রানা। অন্যরাও বলল না কিছু। নীরব হয়ে পড়ল হঠাৎ করে। বিপদ টের পেয়ে গেছে সবাই। এতক্ষণ পুরো ব্যাপারটা ছিল মজার খেলা গোছের, এখন আর তা নেই। পিছনে শত্রুর অস্তিত্ব এতক্ষণ ছিল কাল্পনিক। এ মুহূর্তে তা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে শত্রু। এর নাম মাফিয়া।

'কে হতে পারে লোকটা?' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করল নাদিরা। 'পুলিস? এফবিআই?'

'না,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'গার্সিয়ার লোক। মাফিয়া।'

আবার সবাই চুপ। যেন এই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছে, কার লেজে পা দিয়েছে ওরা। নিউ ইয়র্ক থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরে ওরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিল বিপদ কেটে গেছে। এইবার টের পেল, আসলে সবে শুরু হয়েছে। কেটে যাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। রানা ছাড়া প্রত্যেকেই থেকে থেকে পিছনে তাকাচ্ছে ঘাড় ঘুরিয়ে, বোঝার চেষ্টা করছে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না ওদের।

'বিল্লাহ,' মৃদু কণ্ঠে ডাকল মাসুদ রানা।

'জ্বি?'

'তুমি যদি গার্সিয়া হতে, আর খবর পেতে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে কামডেনে রয়েছি আমরা, সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী হল্টেজ কোথায় হতে পারে বলে ভাবতে তুমি?'

'বাল্টিমোর, অবশ্যই,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলল দানব। 'ঠিক বলিনি, মাসুদ ভাই?'

সন্তুষ্ট হলো ও। 'ঠিকই বলেছ। আমার মনে হয় গার্সিয়াও তাই ভাবছে। অন্তত সেটাই স্বাভাবিক। অতএব আমাদের এবারকার যাত্রা হবে সংক্ষিপ্ত। আজকের রাতটা উইলমিংটন অথবা এল্‌ক্‌টনে কাটাব আমরা। তারপর কাল দুপুর নাগাদ যাব বাল্টিমোর। ওখানে যতক্ষণ থাকব চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। ওখানে যদি গার্সিয়ার লোক পিছু না নেয়, বুঝতে হবে ওয়াশিংটনে আশা করবে ও আমাদের।'

'মাসুদ ভাই,' বলল ফয়েজ। 'ওরা যদি এরকম আগেভাগেই আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে, তাহলে বিপদ। তারচে' এক কাজ করলে কেমন হয়? যদি নিউ ইয়র্কেই ফিরে যাই আমরা? আর যা-ই হোক, ওখানে নিশ্চই আমাদের আশা করবে না গার্সিয়া? কেমন হয় আইডিয়াটা?'

'অন্য কোন শহর হলে সম্ভাবনাটা ভেবে দেখা যেত, ফয়েজ। কিন্তু নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই। অসম্ভব! হাজারো চোখ রয়েছে ওখানে, হাজারো কান। শুধু গেলেই তো হবে না, থাকতেও হবে। কোথায় থাকবে? ওখানে ফিরে যাওয়ার অর্থ হবে নিজ হাতে নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো। অসম্ভব!' তাছাড়া গার্সিয়া এর সাথে নাদিরার জড়িত থাকার কথা যখন জেনেই গেছে, ওর সাথে আমি আছি, তাও

ঠিকই বুঝে গেছে। কাজেই ও-কাজ করা একেবারেই ঠিক হবে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কি করে ব্যাটা নাদিরার জড়িত থাকার কথা জানল।

'তাহলে? কোথায় যাব আমরা এখন?' জানতে চাইল নাদিরা।

'মায়ামি। এ মুহূর্তে ওটাই হবে আমাদের জন্যে সবচে' উপযুক্ত স্থান। আমরা অতদূর যাব, আশা করা যায়, এতটা কল্পনা করবে না গার্সিয়া।'

দেলাওয়ের নদী পেরিয়ে এল ওরা, ফার্নহার্স্ট পৌঁছল। শহরটা ওয়াশিংটন শহরের সামান্য দক্ষিণে। সামনেই হাইওয়ে নাইনটি ফাইভ, আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে– চলে গেছে ওয়াশিংটন। হাইওয়ে ধরে মায়ামির দিকে এক ঘণ্টা চলল মাসুদ রানা। তারপর খুদে শহর এল্‌ক্‌টনে থামল। রাতটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছে। জায়গাটা নিরাপদ। এত ছোট শহরে নিশ্চয়ই ওদের আশা করবে না গার্সিয়া।

ঘড়িতে তখন প্রায় একটা। বড় রাস্তার কাছে একটা পছন্দসই হোটেল খুঁজে বের করল ওরা। দুটো ডবল রুম নিল কামডেনের মত। 'একসঙ্গে সবার ঘুমানো চলবে না আজ রাতে,' বলল ওদের মাসুদ রানা। 'পালা করে পাহারা দিতে হবে। একেকজন দুই ঘণ্টা করে।'

'ঠিক আছে,' বলল ফয়েজ। 'প্রথম পালা আমার।'

যার যার বিছানায় উঠে পড়ল রানা ও নাদিরা। পাশের রুমে দরজা সামান্য খোলা রেখে পাহারায় বসেছে ফয়েজ। এপাশ ওপাশ করতে লাগল মাসুদ রানা, ঘুম আসছে না। মাথায় হাজারো দুশ্চিন্তা। নাদিরার জড়িত থাকার কথা জানল কি করে গার্সিয়া? হ্যামিলটন কেন বলল, নাদিরাকে খুঁজছে সে? হাসানের

কথা মনে পড়ল হঠাৎ করে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না ও। তবু এ নিয়ে একটা শও উচ্চারণ করেনি রানা নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করার পর থেকে। তাতে পরিবেশ গুমোট হয়ে যাবে। সেটা চায় না ও। এ মুহূর্তে সবার মন খোলা না থাকলে বিপদের ওপর বিপদ। হাসানের অসহায় মৃত্যু-দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল মাসুদ রানা।

'রানা,' মৃদু কণ্ঠে ডাকল মেয়েটি।

'বলো।'

'কিছু ভাবছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

হেসে ফেলল ও। 'কেন?'

'না। এমনিই জানতে চাইছি।'

'ভাবনার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?'

'তবু। বলো না!'

'প্রথম চিন্তা আমাদের গাড়িটা।'

'গাড়িটা মানে?'

'মানে এই গাড়ি নিয়ে আর পথে বেরোনো ঠিক হবে না।'

'তো?'

'ভাবছি, গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'লুকিয়ে রাখবে?'

'হ্যাঁ। বাতিল করে দিতে হবে এটা।'

'কিন্তু তাহলে আমরা বাল্টিমোর যাব কিসে করে? এখানে কি ভাবে কোত্থেকে গাড়ি ম্যানেজ করা যাবে?'

'না। এখানেই ওটা ছাড়ার কথা ভাবছি না। বাল্টিমোর পৌঁছে সারতে হবে কাজটা।'

অন্ধকার আর নীরবতা একসঙ্গে জমাট বাঁধল ঘরের ভেতর। পরমুহূর্তে 'খুট্' শব্দে জ্বলে উঠল মাসুদ রানার গ্যাস লাইটার। সিগারেট ধরাল ও। সিগারেটের মাথার আগুনটা ঘন ঘন বাড়ছে কমছে। এক ভাবে সেদিকে চেয়ে রইল নাদিরা।

সিগারেট শেষ করে আবার শুয়ে পড়ল মাসুদ রানা। কিন্তু ঘুম আর আসে না। গড়াগড়ি করতে লাগল দু'জনেই। কোন ফাঁকে ঘুম এসে জুড়ে বসল চোখের পাতায়, দু'জনের একজনও টের পেল না। ভোর ছ'টায় চট্ করে চোখ মেলল মাসুদ রানা। লোকজন জেগে উঠেছে। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে এক আধটা গাড়ি ছুটে যাওয়ার শব্দ আসছে।

পাশের কোন রুমে যেন টিভি চলছে। ভোরের খবর শুরু হয়েছে। খবরের তৃতীয় আইটেমটা কানে যেতেই যেন তড়িতাহত হলো মাসুদ রানা। একঘেয়ে কণ্ঠে পড়ে চলেছে পাঠকগু গত পরশু রাতে, ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর এক অফিসে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তিটি গত রাতে মৃত্যুবরণ করেছে। জানা গেছে, সে কুখ্যাত মাফিয়া ডন, পাওলো গার্সিয়ার পুত্র রবার্টো গার্সিয়ার বডিগার্ড-কাম-শোফার। লোকটির নাম আলবার্তো ফেলিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত পরশু একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর বেসরকারী এক গোয়েন্দা সংস্থা, রানা এজেন্সির ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অফিসটির প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। যদিও এজেন্সির অপারেটরদের পাল্টা মারের মুখে খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি তারা ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ইয়াল্লা!' ফিস ফিস করে বলল নাদিরা। 'কি করে...'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। সিলিঙের দিকে চেয়ে আছে, চাউনি অন্তঃসার শূন্য। ব্যস্ত টোকার আওয়াজ উঠল দরজায়।

'মাসুদ ভাই! মাসুদ ভাই! দরজা খুলুন!' চাপা কণ্ঠে ডাকছে ফয়েজ।

নাদিরা দরজা খুলে দিল। দমকা বাতাসের মত ভেতরে ঢুকল ফয়েজ ও বিল্লাহ। 'খ-খবর শুনেছেন, মাসুদ ভাই?'

'শুনেছি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ওরা জেনে গেছে আমরাও আছি এর পিছনে!' বলে উঠল বিল্লাহ।

আনমনে থুতনি ডলল ও। 'তাই তো দেখছি।' মাথায় এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রানার। কি করে গার্সিয়া ব্যাপারটা টের পেল, ভেবে পাচ্ছে না।

সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল মাসুদ রানা। গম্ভীর। তাহলে প্যাট্রিক কার্নিকেও চিনে ফেলেছে গার্সিয়া! অর্থাৎ সেই কাজই হলো, জানাজানি হয়ে গেল সব। কিছুই গোপন রইল না! যে জন্যে পালাতে হচ্ছে। নইলে অন্য কিছু করা যেত ভেবেচিন্তে।

দুই

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই গাড়িটা ছেড়ে দেয়া উচিত আমাদের,' বলল মুত্তাকিম বিল্লাহ। 'এটা নিয়ে আর পথে বের হওয়া ঠিক হবে না।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। খাটের কিনারায় বসে আছে ও, হাঁটুতে কনুই রেখে দু'হাতে মুঠো করে ধরে রেখেছে চুল। দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ।

'কিন্তু এখানে গাড়ি কোথায় পাব?' প্রশ্ন করল ফয়েজ।

'বাল্টিমোর থেকে জোগাড় করতে হবে গাড়ি।' হাত নামিয়ে

সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা। 'ট্যাক্সি নিয়ে বাল্টিমোর যাও তোমরা দু'জন। তৈরি হয়ে নাও।'

'এই গাড়ির কি ব্যবস্থা করা যায়?' বলল ফয়েজ।

'লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করো। ভাল হয় যদি নির্জন কোন এলাকায় নিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয়া যায়।'

'জ্বি, আচ্ছা,' মাথা দোলাল বিল্লাহ।

'ফেরার সময় একবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসো। আমরা তৈরি হয়ে থাকব।'

'ঠিক আছে।' দরজার দিকে এগোল ফয়েজ আর বিল্লাহ।

'খুব সাবধানে,' পিছন থেকে সতর্ক করল মাসুদ রানা। 'চারদিক ভাল করে দেখেশুনে এগোবে। না, দাঁড়াও। ক্যাশ নিয়ে যাও কিছু। দেখো, খুঁজে কোন ইউজ্‌ড্ কার কিনতে পাওয়া যায় কি না। সম্ভব হলে চলনসই দেখে কিনেই নিয়ে এসো একটা গাড়ি। ট্যাক্সি খুব রিস্কি হয়ে যাবে।'

'ওরা যদি নাম জানতে চায় ক্রেতার?' জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ।

'চাইবে না,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'বেশিরভাগ চোরাই গাড়ি কেনা-বেচার কারবার করে এইসব লট। নগদ পয়সা পেলে কোন প্রশ্নই করবে না, আমি জানি। বিক্রি করার সময় একটা শর্ত জুড়ে দেয় ওরা কেবল, তা হলোগু বিক্রেতার নাম প্রকাশ করা চলবে না ধরা পড়লে। অন্তত পুলিসের কাছে। ওটায় বোমা ফিট করে যদি হোয়াইট হাউস উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যানও করো তুমি, কিচ্ছু আসবে-যাবে না ওদের।'

এক থোক ডলার ধরিয়ে দিল রানা মুত্তাকিমের হাতে। বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন। দরজা বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। একটা চেয়ার টেনে দরজার কাছে বসল। নাস্তার কথা ভুলে

গেছে। সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা। নিজের বিছানায় চুপ করে বসে আছে নাদিরা। নিজেকে বড্ডো অপরাধী মনে হচ্ছে তার। এত বড় ঝামেলায় পড়েছে এরা ওরই জন্যে, তার চেয়েও বড় কথা, এর পিছনে মাসুদ রানার হাত আছে, ধরে ফেলেছে রবার্টো গার্সিয়া। আর রবার্টো গার্সিয়া মানেই মাফিয়া।

এক্সপোজড হয়ে গেছে মাসুদ রানা। এত রকম সতর্কতা অবলম্বন করেও কোন লাভ হলো না শেষ পর্যন্ত। কি হবে এখন? একই চিন্তা চলছে রানার মাথায়ও। মাফিয়া পরিবারগুলো যদি এক জোট হয়ে হামলা চালায় রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার ওপর, তাহলে সর্বনাশ। সম্ভাবনাটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিল ও। পাওলো গার্সিয়ার সঙ্গে অন্যান্য ডনের সম্পর্ক ইদানীং ভাল যাচ্ছে না, ব্যবসা নিয়ে কি সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে পরিবারগুলোর মধ্যে, আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে মাসুদ রানা। কাজেই ওদের এক জোট হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে না ও।

তবু স্বস্তি পাচ্ছে না মাসুদ রানা। বার বার খারাপ চিন্তা উঁকি দিচ্ছে মনের মধ্যে। পুলিস বা এফ.বি.আই-কে রবার্টো কি জানিয়েছে যে এর পিছনে মাসুদ রানা আছে? নাকি গোপন করে গেছে? একাই মোকাবিলা করবে সে ওকে? তাই যেন হয়, মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, তাই যেন হয়। ব্যাপারটা রবার্টো যদি প্রশাসনকে জানায় তাহলে জটিলতা দেখা দেবে। অথচ ওসব এড়ানোর জন্যেই অফিশিয়ালি পদক্ষেপ নিতে বারণ করেছিলেন ওকে রাহাত খান।

ঠিক আছে, বেপরোয়া এক সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা, দেখা যাক কতদূর গড়ায় ব্যাপারটা। তারপর চরম পদক্ষেপ নেবে ও প্রয়োজনে। সে ব্যবস্থা করেই এসেছে। ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা।

নাদিরাকে দেখল। 'অনর্থক দুশ্চিন্তা করছ তুমি। এ কাজে আমাকে তুমি বাধ্য করোনি, আমি স্বেচ্ছায়ই কাজটা নিয়েছি। কাজেই নিজেকে অপরাধী ভাবার কোন কারণ নেই তোমার। যাও, ওঠো। তৈরি হয়ে নাও। খিদে লেগেছে, পেটে দিতে হবে কিছু।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে থাকল মেয়েটি কিছুক্ষণ। তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে উঠল। নিঃশব্দ পায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। বাইরে নজর দিল মাসুদ রানা। ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে উঠছে খুদে এল্‌ক্‌টন। সামনের বড় রাস্তায় বাস, কার ইত্যাদির দ্বিমুখী ট্রাফিক ক্রমেই ঘন হচ্ছে। স্বাভাবিকের তুলনায় দেশের অন্যান্য জায়গার মত এখানেও প্রচণ্ড চাপ পড়েছে রাস্তার ওপর। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হতে যাচ্ছে, আগেভাগেই যে যার পছন্দের জায়গায় ছুটছে দিনটা পালনের জন্যে। দেখতে দেখতে আরও ঘন হলো ট্রাফিক। মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। এই ট্রাফিক খুবই উপকারে লাগবে ওদের।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল, এখনও ফেরার নাম নেই বিল্লাহ্ ও ফয়েজের। চিন্তায় পড়ে গেল রানা। কোন বিপদ হলো না তো? ধরা পড়ে যায়নি তো ওরা রবার্টোর লোকজনের হাতে? ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল মাসুদ রানা। নাদিরা বসে আছে নিজের বিছানায়। চুপ হয়ে গেছে মেয়েটি। রানার সান্ত্বনা কোন কাজে আসেনি, ওকে দেখলেই বোঝা যায়। এক এক করে চারটে সিগারেট ধ্বংস করল মাসুদ রানা।

পঞ্চমটা ধরাতে যাবে, এই সময় হোটেলের গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল ভেতরে। থেমে গেল মাসুদ রানা। ওটার ভেতরে বসা দেখা গেল বিল্লাহ আর ফয়েজকে। আশ্বস্ত হয়ে গাড়িটা দেখল ও, একটা কালো রঙের বুইক রিভেরা। হুইলে গর্বিত ভঙ্গিতে বসে

আছে বিল্লাহ। বুইকটা পুরানো। সাইড প্যানেলে কিছু কিছু স্ক্র্যাচ দেখা গেল। সামনের ফেণ্ডার সম্ভবত কোন দুর্ঘটনায় তুবড়ে গিয়েছিল, পরে মেরামত করা হয়েছে। রং-ও করা হয়েছে। দেখতে একেবারে মন্দ লাগছে না বুইকটা। এঞ্জিনের আওয়াজও ভালই মনে হলো রানার।

সব তৈরিই ছিল, টপাটপ বুইকের ট্রাঙ্কে তুলে ফেলল ওরা মালপত্র। 'দেখতে যেমনই হোক, গাড়িটা চলে ভাল, মাসুদ ভাই,' ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করে বলল ফয়েজ। 'এঞ্জিনটা প্রায় নতুন, কোন বাজে আওয়াজ নেই।'

'আরও ভাল, প্রায় নতুন গাড়িও পেয়েছিলাম,' বলল বিল্লাহ। 'কিন্তু ইচ্ছে করেই নিলাম না মানুষের চোখ পড়তে পারে বলে। এটার দিকে দ্বিতীয়বার কেউ তাকাবে না।'

'ঠিকই করেছ,' বলল মাসুদ রানা। বুইকের এঞ্জিন আর ভেতরটা দেখল ও। চমৎকার! ভেতরে জায়গা অনেক বেশি, হাত-পা ছড়িয়ে আরামে বসতে পারবে ওরা অনায়াসে। এঞ্জিনও যথেষ্ট শক্তিশালী। 'দারুণ গাড়ি। কিনতে কোন অসুবিধে হয়নি?'

'নাহ্!' গামলার মত প্রকাণ্ড মাথাটা এপাশ ওপাশ দোলাল বিল্লাহ। 'কোন প্রশ্নই করেনি লট মালিক, নগদ টাকা দেখে ঠাণ্ডা মেরে গেছে একেবারে। প্রায় জোর করেই আমার একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়েছি আমি তাকে। অবশ্য বেশ পুরনো লাইসেন্স ওটা, নাম-ঠিকানা ভুয়া।'

'একেবারে কিছুই জানতে চায়নি?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।

'না।' হাসল ফয়েজ আহমেদ। 'সে সুযোগই দেয়নি লোকটাকে তার বউ।'

'কি রকম?'

'ঘর-সংসার ছেড়ে বউ এসে বসে ছিল স্বামীর ঘাড়ের ওপর, বড়দিনের কেনাকাটার টাকা চাই। বিল্লাহর হাত থেকে টাকাটা সে-ই নিয়েছে, ইন ফ্যাক্ট্, কেড়ে নিয়েছে বলা চলে। স্বামী বেচারীকে দরদাম করার সুযোগটাও দেয়নি দজ্জাল মহিলা, আমরা গাড়ির চাবি হাতে পাওয়ার আগেই টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে সে।'

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। 'ভেরি গুড।' দেখাদেখি নাদিরাও হাসল।

'ওদের সামনে পিটসবার্গের রুট নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা,' বলল বিল্লাহ। 'কোন পথে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, এইসব। খবরটা যদি কোনরকমে পৌঁছায় রবার্টোর কানে, মিসগাইডেড হওয়ার চান্স আছে লোকটার।'

'চমৎকার!'

মাসুদ রানা বসল ড্রাইভিং সীটে, পাশে ফয়েজ আহমেদ। নাদিরা ও বিল্লাহ উঠল পিছনে। নাদিরার রত্নভাণ্ডারের ব্রিফকেসটা থাকল ওদের মাঝখানে। হ্যাণ্ড রেস্ট হিসেবে ব্যবহার করছে ওটাকে বিল্লাহ। শহর ছাড়ার আগে কিছু কেনা-কাটা করল ওরা, তারপর ফিরে চলল আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে নাইন্টি ফাইভের দিকে। হাইওয়েতে উঠে বুইক দক্ষিণমুখো ছোটাল মাসুদ রানা। 'ফোর্ডটার কি ব্যবস্থা করলে তোমরা?'

'আপনি যেমন বলেছিলেন, তেমন উপযুক্ত জায়গা একটাই পেয়েছিলাম, মাসুদ ভাই,' বলল বিল্লাহ। 'কিন্তু এত বেশি ট্রাফিক যে ও কাজ করার কোন সুযোগই ছিল না। সারাদিন অপেক্ষা করলেও হত না সুযোগ। সেজন্যেই তো এত দেরি হয়ে গেল ফিরতে আমাদের।'

'তো?'

‘এ অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল ফয়েজ আহমেদ।

‘আমি? লোকালয় থেকে দূরে কোন গভীর জঙ্গলে নিয়ে ঢোকাতাম গাড়িটা। তার পরও প্রয়োজন বুঝলে ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিতাম ওটাকে। লাইসেন্স প্লেট খুলে নদীতে ফেলে দিতাম। অথবা, সুবিধেমত জায়গা খুঁজে বের করে আস্ত গাড়িটাই ফেলে দিতাম নদীতে।’

‘ওতে কারও কোন উপকার হত না। কিন্তু আমরা যা করেছি, তাতে আমাদের সঙ্গে আরও কিছু লোকের উপকার হয়েছে।’ পায়ের ওপর পা তুলে বসল পাহাড়। সিগারেট ধরাল গম্ভীর মুখে। ফয়েজ হাসছে মিটিমিটি।

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। ‘যেমন?’

‘ওটা গায়েব করার আর কোন উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে শহরের একটা বস্তিতে নিয়ে পার্ক করে রাখি আমরা গাড়িটা,’ বলল ফয়েজ। ‘লাইসেন্স প্লেট আগেই লুজ করে রেখেছিলাম। ও দুটো খুলে নিয়ে দরজা আনলক রেখে কার লটের খোঁজে চলে যাই।’

‘তারপর?’ সিগারেট ধরাল রানা।

‘ঘণ্টা দু’য়েক ব্যয় হয় এটা কিনতে। কাজ সেরে বুইক নিয়ে আবার বস্তিতে যাই আমরা। ওর মধ্যেই ফোর্ডের হুইল, ব্যাটারি, কারবুরেটর, রেডিয়েটর, ডিস্ট্রিবিউটরসহ পুরো এঞ্জিন ব্লক গায়েব হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলাম, সীটগুলো, ফুয়েল পাম্প খুলে নিয়ে যাচ্ছে একদল নিগ্রো ছোঁড়া। ঘণ্টা খানেক ছিলাম আমরা ওখানে। আসার সময় কেবল ফ্রেমটা পড়ে আছে দেখে এসেছি। দরজা, ফ্রন্ট আর ব্যাক উইণ্ডশীল্ড, সব গাপ্ করে দিয়েছে ব্যাটারা।’

‘এখন গেলে ফ্রেমটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, বাজি ধরে বলতে পারি আমি,’ মন্তব্য করল পাহাড়। ‘বড়দিনটা এবার ভালই কাটবে ছোঁড়াগুলোর।’

‘দারুণ!’ বলল মাসুদ রানা। ‘রীতিমত একটা অত্যাধুনিক উপায় আবিষ্কার করেছ তোমরা গাড়ি গায়েব করার। ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লে উপায়টা কাজে লাগাব ভাবছি। কংগ্রাচুলেশনস!’

‘বৈপ্লবিক উপায়।’ সংশোধন করে দিল বিল্লাহ্।

‘ঠিক,’ মেনে নিল রানা। ‘বৈপ্লবিক উপায়।’

একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠতে শুরু করল নাদিরা। মাঝে মধ্যে ওদের আলোচনায় যোগ দিচ্ছে সে এখন। মাসুদ রানা এবং তার দুই সহযোগীর সতর্ক, কিন্তু নির্ভীক, ড্যাম কেয়ার ভাব-ভঙ্গি দেখে ভুলে গেল সে ভয়-শঙ্কা, অপরাধবোধ।

সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। হাইওয়ে নাইন্টি ফাইভ ধরে তুমুল বেগে ছুটছে বুইক। হুইলে তিনটে বাজার ভঙ্গিতে রয়েছে মাসুদ রানার হাত। ঋজু দেহটা বসে আছে অনড়। নজর সামনে স্থির। ড্যাশবোর্ডের মৃদু নীলাভ আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চেহারাটা। কিছু ভাবছে ও। নাদিরা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। বিল্লাহ্ আর ফয়েজ বসে আছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যেও চোখ বোজেনি ওরা কেউ। ভবিষ্যৎ ভাবনায় ডুবে আছে সবাই।

দূর থেকে ওয়াশিংটন ডি. সি. পাশ কাটাল মাসুদ রানা। বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে আলোর বন্যায় ভাসছে ওয়াশিংটন। পুরো আকাশ গোলাপী রঙের উজ্জ্বল আভায় ঝলমল করছে। ফ্রেডারিক্স্বার্গের এক স্পেনীয় ধাঁচের রেস্টুরেন্টে ডিনার খেলো ওরা। তারপর আবার চলা। এবার হুইলে বসল বিল্লাহ, মাসুদ রানা পিছনে। শহর ত্যাগ করার আগে ট্যাঙ্ক ভরে তেল নিল

ওরা। রিচমণ্ড এসে আরেক দফা আসন বদল হলো বিল্লাহ এবং ফয়েজের মধ্যে।

কাত হয়ে নাদিরার ব্রিফকেসে হেলান দিয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেয়ার কসরৎ করল মাসুদ রানা। কাজ হলো না। উল্টে শক্ত জিনিসটার ওপর পড়ে থেকে থেকে কাঁধ-পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। সাড়ে দশটার দিকে রকি মাউন্টেন পৌঁছল ওরা। তন্দ্রায় চোখ বুজে এসেছিল কখন যেন, চট করে সোজা হয়ে বসল রানা। বিল্লাহ আর নাদিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। গতি কমে গেছে বুইকের। 'এটা কোন জায়গা?' জানতে চাইল ও।

'রকি মাউন্ট,' বলল ফয়েজ।

'দেখো কোন জয়েন্ট পাওয়া যায় কি না।'

'ঠিক আছে।' বড় রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বাঁক নিল ফয়েজ। সামান্য এগোতেই নীল রঙের নিয়ন আলো চোখে পড়ল। একটা বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট, 'দি গেম কক'। জানালায় বিয়ার ক্যানের ছবি পেস্ট করা আছে দেখা গেল।

'চলো দেখি, কফি জোটে কি না দু'এক কাপ।'

বিল্লার ঘুম আগেই ভেঙেছে, নাদিরাও জেগে গেছে। সোজা হয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে। 'কোথায় এসেছি আমরা?'

'রকি মাউন্টেন,' বলল মাসুদ রানা।

'এখানে কি?'

'কফি খাব।'

'ওহ্, ফাইন!'

গেম ককের পার্কিং লট বেশ বড়। আধ ডজন কার, একটা পিকআপ ট্রাক, দুটো মোটর সাইকেল এবং অতিকায় এক ট্রাক্টর ট্রেইলার দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে। ধীর গতিতে বুইকের নাক ঢোকাল ফয়েজ লটে। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রানা ও

বিল্লাহ। আলো নেভাল ফয়েজ, স্টার্ট বন্ধ করে দিল। তখনই বেরিয়ে পড়ল না ওরা, ঝাড়া দু'মিনিট বসে থাকল গাড়িতে। না, কোথাও কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ল না। কোন অ্যাডভান্স পার্টি অপেক্ষা করছে না ওদের স্বাগত জানাতে।

'চলো,' মৃদু কণ্ঠে নির্দেশ দিল মাসুদ রানা। নাদিরার খুদে কেসটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। ডান হাত ট্রাউজারের পকেটে, ওয়ালথারের বাঁট আঁকড়ে রেখেছে আঙুলগুলো।

ফয়েজ নামল সবার শেষে। বুইক লক করল সে, তারপর একযোগে গেম ককের প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল সবাই। ভেতরের আলোগুলো কম শক্তির। নগ্ন কাঠের মেঝে, সারা দেহে তার ক্ষত। প্রায় চৌকোনা গেম কক বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট। এক মাথায় আধা-নোংরা বার। সামনে কোন টুল নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করা ছাড়া উপায় নেই খদ্দেরের।

দু'পাশে গোটা বিশেক গোল কাঠের টেবিল, প্রত্যেকটি ঘিরে রেখেছে এক হালি করে চেয়ার। বেশিরভাগই নড়বড়ে। এক পাশে কয়েকটা বুদও আছে। মাঝখানের খানিকটা জায়গা ফাঁকা, ডান্স ফ্লোর। অল্প শক্তির আলো আড়াল করতে পারেনি ভেতরের দীনতা, বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বেশি বেশি। বারের পিছনে দেয়ালে ঝুলছে একটা নোংরা মূল্য তালিকা, হ্যামবার্গারস্, রিব্স্, চিলি, হ্যাম ও চীজ বার্গার, অ্যাপেল পাই ও কফি ইত্যাদির।

বারের পাশেই একটা করিডর, চলে গেছে পিছনদিকে, গেম ককের কিচেনে। ভেতরে পা রেখেই টের পেল ওরা পিছনে রান্না চলছে। তেল মশলার ঝাঁঝে চোখে অন্ধকার দেখল সবাই। পাঁচ পুরুষ খদ্দের বীয়ার পান করছে বারের সামনে দাঁড়িয়ে। উভয় লিঙ্গ মিলিয়ে আরও জনা চল্লিশেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে

সামনের টেবিল ও বুদ দখল করে। উৎসব উৎসব আমেজ।

মেয়েদের বেশিরভাগই কম বয়সী, ষোলো থেকে বিশের মধ্যে। এক নজরেই বোঝা যায় পেশাদার। পরনে টাইট সোয়েটার, পায়ে হীল, মাথায় লাল অথবা সোনালী উইগ। মুখে এত কড়া মেক আপ, সার্কাসের ক্লাউনও হার মানতে বাধ্য হবে। পুরুষরা সব কঠোর চেহারার, লাল মুখো। কয়েকজনের চোখেমুখে দীর্ঘ যাত্রার ছাপ স্পষ্ট। বাকিরা কেউ চাষী, নির্মাণ শ্রমিক, টেলিফোনের লাইনসম্যান এইসব।

একাধিক পায়ের আওয়াজে ভেতরের কলগুঞ্জন থেমে গেল আচমকা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সবাই। শূন্য, অস্পষ্ট শত্রু ভাবাপন্ন চোখে দেখল আগন্তুকদের। সবচেয়ে বেশি সময় তাদের নজর কাড়ল নাদিরা। তারপর পাহাড় এবং সবশেষে গরিলা। পুরুষরা মাসুদ রানাকে দেখেও না দেখার ভান করল। মেয়েরা খানিকটা করুণা করল রানাকে। একবার, কেউবা দু'বারও তাকাল। কিন্তু কারও মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

সুইচ টিপে সবার কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করে দিয়েছিল যেন কেউ, ওরা একটা বুদে ঢুকে পড়তেই অন হয়ে গেল সেটা, যে যেখানে থেমে পড়েছিল, সেখান থেকে শুরু হলো আগের মত। নোংরা কৌতুক আর পাঞ্জার লড়াইয়ে মেতে উঠল পুরুষরা, আর মেয়েরা অহেতুক গা কাঁপানো খিল খিল হাসি, মেক আপ ঠিক করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে।

ওরা ঠিকমত বসতে না বসতেই হাজির হলো এক ওয়েট্রেস। খুব বেশি হলে পনেরো হবে তার বয়স, কিন্তু মুখ দেখলে বেশি মনে হয়। সাংঘাতিক রকম টাইট জিনস পরেছে মেয়েটি, গায়ে পেট কাটা লো-কাট উলেন ব্লাউজ, তাও পিভলেস। এই শীতে কী করে মেয়েটি এত সংক্ষিপ্ত পোশাকে আছে ভেবে পেল না ওরা।

মেন্যু আঁতিপাতি করে খুঁজে একমাত্র চীজ স্যাণ্ডউইচ ছাড়া আর কিছুই খাওয়ার উপযুক্ত মনে হলো না রানার। অতএব নিজের জন্যে ওর একটা এবং এক কাপ কালো কফি অর্ডার দিল ও। ফয়েজ আর বিল্লাহ অনুসরণ করল ওকে। নাদিরা শুধু কফির অর্ডার দিল। চলে গেল মেয়েটি নিতম্ব দোলাতে দোলাতে। হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে ছিল ফয়েজ, টেবিলের তলা দিয়ে তার হাঁটুতে কষে এক লাথি লাগাল বিল্লাহ।

'বাবাগো!' লাফিয়ে উঠল গরিলা।

লাফিয়ে উঠল মাসুদ রানাও, মুহূর্তে ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে হাতে। 'কি! কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

ভাল মানুষের মত বিল্লাহও চমকে উঠল। 'কি হলো?'

ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ডলতে লাগল ফয়েজ মুখ বিকৃত করে। 'তেমন কিছু না, মাসুদ ভাই,' অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল সে। ঠাণ্ডা চোখে বিল্লাহর প্রতি শাসানি। 'অনেক আগে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলাম একবার পড়ে গিয়ে, ফুটবল খেলার সময়। হঠাৎ হঠাৎ কামড়ে ওঠে জায়গাটা।'

'তাই বলো,' আশ্বস্ত হলো যেন বিল্লাহ। চেহারা নির্বিকার। 'আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম।'

'ডাক্তার দেখাও না কেন?' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল রানা। 'কই, দেখি! কোথায় ব্যথা?' ঝুঁকল ও।

হাঁ হাঁ করে উঠল ফয়েজ। 'না না! দেখতে হবে না, মাসুদ ভাই। ঠিক হয়ে গেছে। ও কিছু না।'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল মাসুদ রানা। 'এত তাড়াতাড়ি সেরে গেল?'

'জ্বি। যেমন হঠাৎ শুরু হয়, তেমনি হঠাৎ করেই সেরে যায়।' বিল্লাহর দিকে তাকাল ফয়েজ। চাউনি 'মজা টের পাবে পরে'

গোছের।

বড় একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল ওয়েট্রেস। খালি করতে লাগল ওটা। 'মিস্, তোমাদের রেস্টরুমটা কোনদিকে?' জানতে চাইল নাদিরা।

'থ্রু দ্যা কিচেন,' বলল সে। শোনাল যেন 'থ্রু ডাহ্ কিচ'।

'আমি যাব প্রথমে।' আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। 'ওদিকটা চেক করে দেখা হয়নি। একটু অপেক্ষা করো।' বারের পাশের করিডর দিয়ে হেঁটে চলে গেল মাসুদ রানা। লক্ষ করল নাদিরা, অল্পবয়সী, মোটামুটি সুন্দরী একটি মেয়ে পিছু নিয়েছে ওর। সে-ও যাচ্ছে রেস্টরুমের দিকে। মুচকে হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল নাদিরা, চুমুক দিল কফির কাপে। কি ভাবল কে জানে, হঠাৎ করে নাক-মুখ লাল হয়ে উঠল তার।

তিন মিনিট পর ফিরল মাসুদ রানা। তার আগেই হতাশ মুখে ফিরে এসেছে মেয়েটি। 'মেন'স রুম বা' উইমেন'স রুম বলে কিছু নেই এদের। খাড়া কফিন সাইজের একটা টয়লেট আছে কেবল। তবে সাবধান, ভেতরে ঢুকে যদি দম বন্ধ না রাখতে পারো, নির্ঘাত বমি হয়ে যাবে।' নিজের আসনে বসে পড়ল ও।

'আর রান্নাঘর পার হওয়ার সময় চোখ বন্ধ রাখবে। নইলে তেল-মশলার ঝাঁঝে চোখ জ্বলে-পুড়ে যাবে। এখানকার হেলথ ইনসপেক্টররা কি করে বুঝি না,' গজ গজ করে উঠল রানা।

খাঁটি কথাই বলেছে মাসুদ রানা, জায়গামত পৌঁছে ভাবল নিরুপায় নাদিরা। খাড়া কফিনই বটে। উঁচু ছয় ফুট, পাশে তিন ফুট। কপালে লেখা আছে 'টয়লেট'। তার পাশেই রাজ্যের দাগ পড়া একটা ওয়াশ বেসিনের বাচ্চা। তার ওপর ছোট্ট একটা নোটিস বোর্ড। ওতে লেখাগু কর্মচারীদের ল্যাভেটরি ত্যাগ করার আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে নিতে হবে।

অথচ ওটার পাশের সোপ স্ট্যাণ্ড শূন্য–সাবান নেই। ট্যাপে গরম পানি নেই। হুকে রোলার টাওয়েলের যেটুকুও বা আছে, চেহারা দেখে মনে হয় কয়লার ট্রাক ঝাড়মোছ করা হয়েছে বুঝি তা দিয়ে।

পিছনে একটা দরজা আছে গেম ককের, বাজার-সওদা সরাসরি ওই পথে কিচেনে ঢোকানো হয়। এ মুহূর্তে দরজাটা পাহারা দিচ্ছে বিল্লাহ, মাসুদ রানার নির্দেশে। কোন রকমে দায় সেরে বেরিয়ে এল নাদিরা। আরেকবার এদিক ওদিক তাকাল। কিচেনের পিছনে ছোট একটা হলওয়ে চোখে পড়ল এবার। পাশাপাশি দুটো ফোন বুদ রয়েছে ওখানে। তার ওপাশে একটা সোয়েল ভেনডিং মেশিন।

হাঁ করা পটে উপযুক্ত মূল্য ফেলে দিলেই জ্যান্ত হয়ে ওঠে মেশিনটা। নিঃশ্বাস বিশুদ্ধকরণ মিন্ট, পারফিউম, চিরুনি, টিস্যু, কনডম ইত্যাদি বিক্রি করে ওটা।

কিচেন পাশ কাটাবার সময় ঘৃণায় গা রি রি করে উঠল নাদিরার। মেঝেতে কাদার মত থক থক করছে তেল-মশলা। দেয়ালের অবস্থাও প্রায় তাই। পার্থক্য কেবল, ওখানে শক্ত হয়ে জমে আছে ওই দুই বস্তু। খোঁচা দিলে নিঃসন্দেহে দুই ইঞ্চি পুরু চলটা উঠে আসবে। ভেতরে এক মেয়ে, আর এক পুরুষ কুক কাজ করছে। রান্নাঘরের চাইতেও শোচনীয় তাদের চেহারা।

তাড়াতাড়ি বুদে ফিরে এল নাদিরা। আরেকটু দেরি হলে বাথরুম নয়, বরং কিচেনই ওর বমি হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াত। বাকি তিনজনও তলপেটের ভার মুক্ত হয়ে এল এক এক করে। তারপর আরেক রাউণ্ড কফি। খাওয়ার বিল মেটাল মাসুদ রানা, আশাতিরিক্ত টিপস দিল পেট কাটাকে। 'চলো।'

আসন ছাড়ল সবাই। ব্রিফকেসটা ফয়েজের হাতে দিল রানা।

দরজার দিকে পা বাড়াল আগে আগে। ডান হাত আগের মতই ট্রাউজারের পকেটে। দরজা খুলে বাইরে পা রাখল মাসুদ রানা। অন্যরাও বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডা, নির্মল বাতাসে দম নিল সবাই। মনে হলো যেন জাহান্নাম থেকে বেরিয়েছে ওরা। আকাশের দিকে তাকাল নাদিরা, তারায় তারায় হাসছে অসীম আকাশটা।

রানার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, স্থির হয়ে গেল। আকাশ দেখছে না রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 'বিল্লাহ!' চাপা কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'ফয়েজ! সামনে দেখো, ডানে।'

একযোগে তাকাল ওরা তিনজন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের গাড়ি। এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ওদের বিশ গজ দূরে। দু'পাশে দুটো কাঠামো, ভারি টপকোটের দুই পকেটে হাত ভরে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। বাঁ দিকেও আছে আরেকটা গাড়ি। ওটার পাশেও দুটো কাঠামো। দাঁড়ানোর ভঙ্গি অবিকল এক। ভেতরে আরও লোক আছে নিশ্চয়ই ভাবল রানা।

যেন রিহার্সাল দেয়াই ছিল, একই সঙ্গে জ্বলে উঠল দুই গাড়ির চারটে শক্তিশালী হেডলাইট, সরাসরি ওদের ওপর এসে পড়ল আলো। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই দপ্ করে নিভে গেল।

'ভেতরে চলো,' মৃদু, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'ঘাবড়িয়ো না। দৌড় দেবে না কেউ। মুভ!'

তিন

ধীর পায়ে পিছিয়ে এল ওরা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। বুদে বসার ঝুঁকি নিল না মাসুদ রানা, সদলবলে বারের সামনে এসে দাঁড়াল।

'ফিরে এলেন যে?' কণ্ঠ এবং চাউনি, দুটোতেই বিস্ময় বারটেণ্ডারের। 'হার্ড কোন ড্রিঙ্ক চাই?'

'না হে,' গম্ভীর গলায় বলল বিল্লাহ। 'তোমাদের কফি খুব ভাল লেগেছে। তাই আরেক কাপ করে খাব বলে এলাম।'

'নিশ্চই নিশ্চই!' ব্যস্ত হয়ে উঠল লোকটা। 'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ।' তুড়ি বাজিয়ে আরেক ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

ওদিকে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নাদিরা। ঠোঁট কাঁপছে তার আতঙ্কে। সন্ত্রস্ত চোখে ঘন ঘন প্রবেশ পথের দিকে তাকাচ্ছে। 'স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'এত লোকের সামনে কিছু করতে সাহস পাবে না ওরা। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। শান্ত হও।'

কিসের শান্ত! কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল বরং মেয়েটির। কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো প্রথমবার, গলা বুজে গেছে। কেশে পরিষ্কার করতে হলো। 'পি-পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি না আমরা?' আতঙ্কিত গলায় বলল সে অনেক কষ্টে।

'না, পারি না।' ভেতরে যা-ই থাক, মুখে সাহসী ভাবটা জোর করে ফুটিয়ে রেখেছে মাসুদ রানা। 'কারণ পিছনদিকেও লোক

আছে ওদের। না থেকে পারে না। ওরা প্রফেশনাল। কিন্তু তাই বলে…'

থেমে গেল ও। কফি নিয়ে এল ওয়েট্রেস। টেণ্ডারের হাতে দশ ডলারের নোট একটা ধরিয়ে দিল রানা। বাকি পয়সা ফেরত দিতে যাচ্ছিল সে, হাত নেড়ে নিষেধ করল ও। 'কীপ দা চেঞ্জ।' লোকটা সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না কেউ। বিল্লাহ ও ফয়েজ গম্ভীর। অন্যমনস্কের মত ফড়াৎ ফড়াৎ চুমুক দিচ্ছে কাপে। চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন মনে হয় না ওদের কাউকে। গেরো থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে ব্যস্ত বোধহয়।

বারে কনুইয়ের ভর দিয়ে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়াল মাসুদ রানা। গালগল্পে মশগুল অন্য খদ্দের, বিশেষ করে পুরুষদের দিকে নজর দিল। কারও আচরণে সন্দেহজনক কিছু দেখল না ও। কেউ লক্ষ করছে না ওদের। 'কফি খাও!' কঠোর গলায় প্রায় দাবড়ি লাগাল রানা নাদিরাকে। 'স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো। বলেছি তো, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ভেতরে কোন চর নেই ওদের। এবং ভেতরে ঢুকে এত লোকের সামনে কিছু ঘটাতে পারে, সে সম্ভাবনাও নেই। ওরা বাইরেই অপেক্ষায় থাকবে আমাদের। ব্যাটারা ভালই বোঝে, সারা রাত গেম ককে থাকব না আমরা। যখনই হোক, বের হবই।'

'কিন্তু কেন?' তাড়াতাড়ি কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলল নাদিরা। 'আমাদের ধরার জন্যে এত সময় নষ্ট না করে আমাদের গাড়িটা তো সামনেই আছে, বুট ভেঙে মালপত্র যা আছে নিয়ে নিলেই তো পারে!'

'ওরা বোঝে ওখানে সব মাল নেই। তাছাড়া শুধু মালে সন্তুষ্ট হবে না রবার্টো, আমাদেরকেও চাই তার।'

'আসলেই রবার্টোর লোক ওরা, না এফ.বি.আই?'

'রবার্টোর লোক,' দৃঢ় স্বরে বলল মাসুদ রানা। 'সে নিজেও আছে নিশ্চই। এফ.বি.আই হলে গেম ককের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেত এতক্ষণে। সার্চলাইট, বুলহর্ন, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে অ্যাকশনে নেমে পড়ত তারা, বাইরে অপেক্ষা করত না এই শীতের মধ্যে। তাছাড়া আমার ধারণা, এফ.বি.আইকে আমাদের পিছনে লাগার মত সূত্র দেয়নি রবার্টো। দেবেও না। তাতে সে-ই বিপদে পড়বে। কারণ প্রশাসনকে সে যা জানিয়েছে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি টাকার মাল হাতছাড়া হয়ে গেছে রবার্টোর। সে চাইবে না বিষয়টা জানাজানি হোক। সবাই জেনে যাক, আমেরিকার সব বড় বড় জুয়েলারি দোকানের ডাকাতি হওয়া মাল তার সেফে ছিল, তাদের অরিজিনাল সীল-ছাপ্পর সুদ্ধ। বিষয়টা যদি কোন রকমে লীক করে, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে পত্রিকাওয়ালারা। ফলে গার্সিয়া অ্যাণ্ড সন্স তো যাবেই, ফেডদেরও বারোটা বেজে তেরোটা ঝুলে পড়বে। তখন সাহায্য করা দূরে থাক, তারাই উল্টে গারদে পুরতে বাধ্য হবে রবার্টোকে, মুখ রক্ষার জন্যে হলেও। কিন্তু…! একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, ব্যাটা আমাদের খোঁজ কি করে পেল?'

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল ফয়েজ।

'তোমাদের পিটসবার্গের টোপ গেলেনি দেখছি ব্যাটা।' সিগারেট ধরিয়ে তরল কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

মুখ কালো হয়ে গেল বিল্লাহর। ফয়েজের দিকে তাকাল সে। 'আশ্চর্য! আমি এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কি করে খোঁজ পেল ওরা আমাদের!'

'নিশ্চই কার ডিলারের…' থেমে গেল ফয়েজ রানাকে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দেখে।

'মনে হয় না,' বলল ও। 'এল্‌ক্‌টন থেকে আমাদের পিছু

নেয়নি ওরা, আমার যতদূর বিশ্বাস। তাই যদি হত, ফ্রেডারিক্‌স্‌বার্গেই ঘেরাও করত আমাদের ওরা, ডিনারের সময়।'

'তাহলে?' হতভম্ব দেখাল ফয়েজকে।

আরেকবার ভেতরের সবার ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। 'এখান থেকেই কেউ জানিয়েছে ওদের খবরটা। সে যাক্, এখন বের হওয়ার উপায় বের করতে হবে তাড়াতাড়ি। মাথা খাটাও সবাই, বোকা বানাবার চেষ্টা করতে হবে ওদের।'

'পেয়েছি!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিল্লাহর। 'মাসুদ ভাই, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই আমি। শব্দ শুনে সামনের ওরা ছুটে আসবে, সেই সুযোগে আপনারা দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠবেন।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল ফয়েজ। কপাল কুঁচকে আছে তার।

'আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা ঠিকই...'

'চোপ!' খ্যাঁক করে উঠল গরিলা। 'দেশে আমার একটা বকরি আছে দাড়িওআলা, ওটা এখানে থাকলে তোমার থেকে ভাল কোন বুদ্ধি দিতে পারত বোধহয়।'

কটমট করে তাকাল বিল্লাহ। 'কি বললে?'

'বলছিলাম...'

'থামো তোমরা।' বিল্লাহর কাঁধে একটা হাত রাখল মাসুদ রানা। 'আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ইচ্ছে। ধন্যবাদ, বিল্লাহ। কিন্তু ওরা সবাই পিছনে ছুটে আসবে, তোমার এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। কেউ না কেউ থাকবেই সামনের দিকে। তাকে অসতর্ক মুহূর্তে ঘায়েল করে আমরাও হয়তো গাড়িতে চড়তে পারব, কিন্তু বিনিময় মূল্য অনেক বেশি পড়ে যেতে পারে। তোমাকে হয়তো হারাতে হবে আমাদের। আমি রাজি নই তাতে। ফয়েজও নিশ্চই সেটাই মীন করেছে।'

'ঠিক বলেছেন।' সিগারেট ধরাল ফয়েজ বিরক্ত মুখে। 'লম্বা মানুষ সাধারণত আহাম্মক হয়, সব খুলে না বললে কিছু বোঝানো যায় না তাদের।'

এর মধ্যেও না হেসে পারল না মাসুদ রানা। 'দেখো, ফয়েজ, তুমি কিন্তু আমাকেও...'

'না না, মাসুদ ভাই! তোবা!' আধ হাত জিভ বের করল ফয়েজ। 'আমি ছয় ফুটের ওপরে লম্বা যারা, তাদের মীন করেছি কেবল।'

আরেকবার আগুন ঝরা চোখে তাকে দেখল বিল্লাহ্, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝট করে। 'ব্যাটা নাটকু!' বিড় বিড় করে বলল সে। 'পয়গম্বরের শত্রু!'

'স্বাভাবিক আচরণ করো সবাই। গল্প করো, অন্যদের মত শব্দ করে হাসাহাসি করো।' পায়ে পায়ে সামনের দিকের একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। বাইরে তাকাল। দুটোরই হেডলাইট জ্বলছে দেখা গেল, তবে ডীপ করা। একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এল চট্ করে। তাড়াতাড়ি ওদের কাছে ফিরে এল রানা। 'কয়েন আছে তোমাদের কারও কাছে?'

'আছে।' পকেটে হাত ভরে দিল ফয়েজ। 'কেন?'

'বলছি। বের করো আগে। তুমি আর বিল্লাহ এখানে থাকো, আমরা দু'জন কিছুক্ষণের জন্যে পিছনদিকে যাচ্ছি। আমি আর নাদিরা।'

'কেন?' জানতে চাইল নাদিরা। 'পিছনে কি?'

ফয়েজের বাড়িয়ে ধরা কয়েনগুলো নিল মাসুদ রানা। নাদিরার দিকে ফিরল। 'ওখান থেকে টেলিফোন করবে তুমি ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে। বুদের দরজা বন্ধ করে চেঁচাবে মনের সুখে, কাঁদবে, ফোঁপাবে। ওদের বলবে, আগুন লেগে গেছে গেম ককে,

ভেতরের লোকজন সব আটকা পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আগুন নেভানো সম্ভব না হলে একজনও বাঁচবে না। পরিষ্কার?'

মাথা দোলাল বিস্মিত মেয়েটি। 'তাতে লাভ?'

'অপেক্ষা করো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। অভিনয়টা নিখুঁত হতে হবে, মনে রেখো।'

'তা হবে,' অবিশ্বাসের সাথে বলল নাদিরা।

মাথা দোলাল রানা। 'আমি জানি হবে। ওটাই আমাদের একমাত্র চান্স এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার। আমি অন্য ফোনে পুলিস ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলব একই সময়ে। ওদের জানাব, গেম ককে ডাকাত পড়েছে, মারপিট, লুটপাট চালাচ্ছে তারা। যদি আমাদের অভিনয় কাঁচা না হয়, আশা করা যায় পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে এ জায়গা নিউ ইয়ার'স ডে-র টাইমস স্কোয়্যারের মত জনারণ্য হয়ে উঠবে। এবং সুযোগটা নেব আমরা। বিল্লাহ, ফয়েজ এখানে অপেক্ষা করো। আরেক রাউণ্ড অর্ডার দাও কফির। চলো,' নাদিরার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে।'

পা চালাল নাদিরা। রানা থাকল পিছনে। ক্রমাগত কথা বলছে মেয়েটি, ঘন ঘন ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে, হাসছে। পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যেন একেবারেই উদাসীন। কিচেন অতিক্রম করল ওরা, পিছনের হলরুমে চলে এল। পুরোপুরি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে আসামাত্র চেহারা পাল্টে গেল দু'জনেরই। দ্রুত পায়ে পুরানো ধাঁচের কাঠের তৈরি প্রথম বুদের সামনে এসে দাঁড়াল। এই সময় নোটিসটা চোখে পড়ল ওদের। ওটার দরজার হাতলে ঝুলছে 'আউট অভ অর্ডার' সাইন।

থমকে গেল রানা মুহূর্তের জন্যে। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, 'ওটায় চলো। দুটো ফোন একই সাথে করতে চেয়েছিলাম,' পরের বাক্য

আনমনে বলল ও। 'তুমি আগে, ঢোকো ভেতরে। খেয়াল রেখো, ওরা যেন ফাঁকি টের না পায়। নাম জানতে চাইলে যা খুশি একটা বলে দিয়ো। ঢোকো। আমি আছি এখানেই।'

মেয়েটিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল মাসুদ রানা। কাঁপা, ঘামে ভেজা পিচ্ছিল হাতে কয়েন পটে ফেলল নাদিরা, ডায়াল করল অপারেটরের নাম্বারে। রিং বাজতে শুরু করেছে ও-প্রান্তে, চতুর্থ দফা বাজার আগে রিসিভার তুলল অপারেটর।

'ইয়েস! কি সাহায্যে লাগতে পারি...'

'ফায়ার ডিপার্টমেন্ট!' ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল নাদিরা তারস্বরে। 'এমার্জেন্সি! ওহ্ গড! ফায়ার ডিপার্টমেন্টে দিন! হারি আপ, প্লীজ! হারি আপ!'

'জাস্ট আ মোমেণ্ট,' দ্রুত বলল অপারেটর। 'দিচ্ছি লাইন।'

খুট করে আওয়াজ উঠল ও মাথায়, পরমুহূর্তে মোটা একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'দিস ইজ...'

'আগুন!' গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাল নাদিরা। 'আগুন! আগুন!! হায় খোদা, আমরা আটকা পড়ে গেছি! সব পুড়ে গেল! সব জ্বলে ছাই...'

'কোথায়?' হুঙ্কার ছাড়ল ও-প্রান্তের পুরুষ কণ্ঠ। 'কোত্থেকে বলছেন আপনি?'

'র-র-রকি মাউন্ট! গেম কক ট্যাভার্ন থেকে, রুট নাইন্টি ফাইভের কাছে। ওহ্ গড! হারি আপ, প্লীজ। পুরো রেস্টুরেন্ট জ্বলছে, মানুষজন সব...'

'কে বলছেন! কি নাম আপনার?'

'প্লীজ, হারি আপ!'

'কি নাম আপনার?' এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, মনে

হলো সে-ও আচমকা আক্রান্ত হয়েছে ধনুষ্টংকারে।

'বি-বিয়া, বিয়া ফ্ল্যাণ্ডার্স! প্লী-ই-জ…'

'অল রাইট, লেডি! ডোন্ট প্যানিক, আমরা আসছি।' কেটে গেল লাইন।

'চমৎকার!' হাসল মাসুদ রানা। 'ভাবতেই পারিনি এত ভাল অভিনয় করতে পারো তুমি।'

বেরিয়ে এল নাদিরা ভেতর থেকে। ফ্যাকাসে মুখে হাসল। 'কি জানি কতদূর বিশ্বাস করেছে ওরা। বলল তো আসছি। যদি…'

'কোন যদি-টদি নেই। এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে ওরা। সরো, এবার আমি একটু অভিনয় করি।' ভেতরে ঢুকল ও। দরজা বন্ধ করল না, কারণ পিছনের খোলা দরজার ওপর নজর রাখতে হবে। অপারেটরের মাধ্যমে ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতর পিডিতে পৌঁছে গেল রানার কল।

'শুনুন,' মাউথপীসের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে চাপা অথচ জরুরী কণ্ঠে দ্রুত বলতে লাগল রানা। 'জোরে কথা বলতে পারছি না, কেউ শুনে ফেলতে পারে। তিনজন অস্ত্রধারী ডাকাত…'

'ডাকাত!'

'হ্যাঁ, বলতে দিন। তিনজন ডাকাত জিম্মি করে রেখেছে রেস্তোরাঁর শ'খানেক খদ্দেরকে। লুটপাট চালাচ্ছে, মারধোর করছে।'

'কোথায়?' তড়পে উঠল পিডির কল গ্রহণকারী। 'কোন রেস্তোরাঁ?'

নাম-ঠিকানা জানাল মাসুদ রানা। 'চেনেন তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই চিনি!'

'গুড। কাস্টমারদের সবাইকে সার বেঁধে দাঁড়াতে বাধ্য করছে ওরা, ওহ্ মাই গড! তাড়াতাড়ি আসুন, খুন-খারাপি ঘটে যেতে

পারে যে কোন মুহূর্তে। অ্যাঁ? আমার নাম জ্যাক, জ্যাক ফ্লেমিং। প্লীজ, ফর গডস সেক, জলদি আসুন! কুইক, কুইক!' রিসিভার ঝুলিয়ে রাখল মাসুদ রানা।

বেরিয়ে এল বুদ থেকে। 'কেমন করলাম?'

'আমার থেকে অনেক ভাল। এবার?'

'একটু অপেক্ষা করো। পিছনে শ্রীমানদের কয়জন আছে দেখা দরকার।' হলের এ মাথায় চলে এল মাসুদ রানা। মনে পড়েছে, বাথরুমের পিছনের দেয়ালে বাতাস চলাচলের জন্যে খুদে একটা জানালা দেখেছে ও তখন। কফিনের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। দরজা বন্ধ করতে সাহস হলো না। তাই ভিড়িয়ে দিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল কমোডের ওপর। সাবধানে উঁকি দিল পিছন দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটোর ওপর চোখ পড়ল রানার।

গ্রেটকোটের পকেটে দু'হাত ভরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। নজর গেম ককের ব্যাক এন্ট্রান্সে সেঁটে আছে। দু'জনই, না আরও আছে? ভাবতে ভাবতে নেমে পড়ল রানা। দ্রুত হাতে ওয়ালথারের নলে সাইলেন্সার জুড়ে নিয়ে পকেটে ভরল অস্ত্রটা। বেরিয়ে এল।

'আছে কেউ?' কাছে এসে প্রশ্ন করল নাদিরা।

'অবশ্যই! দু'জনকে দেখতে পেয়েছি। আরও আছে কি না কে জানে। চলো, ভেতরে যাওয়া যাক।'

আগের মতই হাসি মুখে কথা বলতে বলতে ফিরে এল ওরা বারের সামনে। 'কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে নিশ্চই?' ফয়েজের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'না। একটু আগেই দিয়ে গেল, বেশ গরম আছে এখনও।'

'দেখি!' নিজের কাপে চুমুক দিল ও। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে। 'হ্যাঁ, চলবে।' আরও দশ ডলার ধরিয়ে দিল টেণ্ডারের

হাতে। দ্বিতীয় ওয়েট্রেস কাছেই ছিল, তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'টিপ্‌স্ পুরোটা একাই গাপ্ করে দিয়ো না। অর্ধেকটা ওকে দাও।'

'রাইট, স্যার। হোয়াই নট?'

নিজের অংশ পকেটে পুরে হাসল মেয়েটি রানার দিকে তাকিয়ে। 'থ্যাঙ্কস।'

'নো মেনশন, হানি।'

'কি অবস্থা, মাসুদ ভাই?' ওর গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়াল বিল্লাহ। বিড় বিড় করে বলল, 'হয়েছে কাজ?'

'হয়েছে।'

'ওরা আসছে?'

'যে-কোন মুহূর্তে সাইরেন শুনতে পাবে ওদের।'

'যাক।'

পিছনের দু'জনের কথা ওদের জানাল মাসুদ রানা। 'আচ্ছা!' বড়সড় মাথাটা দোলাতে লাগল পাহাড় ঘন ঘন। 'ও দুটোকে আমি নেব, মাসুদ ভাই।'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা। 'আগে কফি শেষ করো। তারপর বলছি আমি কাকে কি করতে হবে।'

নির্দেশ শোনার গরজ বেশি, তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট কফি একবারে গলায় ঢেলে দিল বিল্লাহ ও ফয়েজ। 'বলুন।' রানার আরেকদিক ঘেঁষে দাঁড়াল ফয়েজ আহমেদ।

'সাইরেনের আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র একজন একজন করে বাথরুমে যাবে তোমরা, ভেতরে ঢুকে পিস্তলে সাইলেন্সার লাগিয়ে আবার ফিরে আসবে এখানে। খুব দ্রুত।'

'এলাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মধ্যমার নখ খুঁটছে ফয়েজ। 'তারপর?'

'প্রথমে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের গাড়ি আসবে। আশা করা যায় তার মিনিট খানেকের মধ্যেই পৌঁছবে পুলিস। যদি এক সাথে এসে পড়ে, তাহলে তো দারুণ হয়। যাই হোক, যে দলই আগে আসুক, ওদের গাড়ির বহর পার্কিং লটে প্রবেশ করামাত্র পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা। বিনা কারণে হঠাৎ করে ওদের আগমনে নিশ্চই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে রবার্টো আর তার সঙ্গীরা, সে সুযোগটা কাজে লাগাব আমরা। পিছনের ওরা কোথায় আছে আমরা জানি, কিন্তু ওরা জানে না ঠিক কখন বের হব আমরা, এবং পিছন দিয়েই বের হব কি না। অর্থাৎ ওদের থেকে অনেক সুবিধেজনক পর্যায়ে আছি আমরা।

'ওদের ফায়ার এবং পুলিস, পর পর দুটো চমক উপহার দিতে যাচ্ছি আমরা, ওরা যখন করণীয় সম্পর্কে দ্বিধান্বিত থাকবে, সেই মুহূর্তে তৃতীয় চমকটা উপহার দিয়ে বেরিয়ে পড়ব সবাই। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো থাকছে। কাজেই প্রয়োজনে ওদের দু'চারজনকে নিঃশব্দে ঠাণ্ডা করে দেয়ার সুযোগটাও আমরা ষোলো আনা পাচ্ছি। আমি জানি, কাজটা খুব সহজেই সারতে পারব আমরা, ওরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগেই হাওয়া হয়ে যেতে পারব এখান থেকে।

'প্রথমে বের হব আমি।' বিল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল মাসুদ রানা। 'রাখো। আমিই একমাত্র জানি ঠিক কোথায় রয়েছে পিছনের দু'জন। কাজেই, আমি যাচ্ছি প্রথম। এ-ব্যাপারে নো আরগুমেন্ট। আমার পর ফয়েজ, তারপর নাদিরা। সবশেষে বিল্লাহ তুমি। আমি আর তুমি পিছনের ওদের সামলাব। এই ফাঁকে ফয়েজ নাদিরাকে নিয়ে বাউণ্ডারি ওয়াল ঘেঁষে সামনের পার্কিং লটের দিকে এগোবে। আশা করছি, ততক্ষণে সামনে গাড়ি আর মানুষের হাট বসে যাবে।'

'এবং লেজুড় ভাইয়েরাও লেজে-গোবরে একাকার দেখে সটকে পড়বে!' উল্লাস প্রকাশ পেল ফয়েজের কণ্ঠে। 'সব পুলিস নিউ ইয়র্কের পুলিস নয় যে ওদের মত···' থেমে গেল সে।

প্রতীক্ষায় ছিল ওরা, তাই আওয়াজটাও ওদেরই কানে এল প্রথম। খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে টানা সাইরেনের আওয়াজ। অনেকগুলো।

'সামনে ভিড়ের ভেতর ছোটাছুটি করবে না কেউ ভুলেও,' বলল মাসুদ রানা। উত্তেজনায় মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে ওর বুকে। 'ধীরেসুস্থে গিয়ে গাড়িতে উঠবে। বিল্লাহ গাড়ি চালাবে। খুব সাবধানে বেরুতে হবে। পুলিস বা ফায়ারের কোন গাড়ির সঙ্গে টক্কর লাগলেই সর্বনাশ। বেরিয়ে সোজা রুট নাইন্টি ফাইভে উঠবে, তারপর সোজা দক্ষিণে ভাগবে, যত জোরে সম্ভব। সবাই বুঝতে পেরেছ সব? কারও কোন প্রশ্ন?'

কেউ মুখ খুলল না। ওদিকে আওয়াজ অনেক কাছে এসে পড়েছে সাইরেনের। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে অনেকগুলো ফায়ার ফাইটার।

'ভেরি গুড।' ধীর পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। বাইরে তাকাল। ডান দিকে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে লাল আলোর বেশ কয়েকটা ঝলকানি চোখে পড়ল ওর। আকাশের রংও লাল হয়ে গেছে। ফাইটারগুলোর টানা চিৎকার ছাপিয়ে দূর থেকে আরও একটা আওয়াজও শুনতে পেল এবার মাসুদ রানা। বাফেলো হুইস্‌ল–এসে গেছে পুলিসও। প্রথম দলের বড়জোর আধ মিনিট পিছনে আছে ওরা।

চমৎকার! খুশি হয়ে উঠল মাসুদ রানা। দলের মধ্যে ফিরে এল। 'দুই বাহিনীই হাজির।'

ওদিকে সাইরেনের আওয়াজ যত এগিয়ে আসছে, ততই ঘন

ঘন গেম ককের দরজার দিকে তাকাচ্ছে খদ্দেররা। আলোচনা, খাওয়া-দাওয়ায় আপনাআপনি ছেদ পড়ে গেছে তাদের। কয়েকজন দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে উঠে পড়ল আসন ছেড়ে, পা বাড়াল বাইরে গিয়ে কি ঘটেছে দেখবে বলে। কেউ একজন দরজা খুলল, পরমুহূর্তে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানের পর্দায় ভীষণ জোরে আঘাত করল ভেতরের সবার।

চোখের কোণে লাল একটা ফ্ল্যাশ চোখে পড়ল মাসুদ রানার, পরক্ষণেই হুশ করে সামনের লটে ঢুকে পড়ল প্রথম ফায়ার ফাইটার ট্রাক। কড়া ব্রেক কষে একরাশ নুড়িপাথর ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা একেবারে গেম ককের প্রবেশ পথের সামনে। ওটার পর পরই ঢুকল আরও তিনটে ট্রাক। পুরোপুরি থেমে দাঁড়ানোর আগেই ওগুলো থেকে বাঁদরের মত লাফিয়ে লাফিয়ে নামল কয়েক ডজন ফায়ার ম্যান। পাম্পার, হোস কার্ট, খাটো খাটো হুক ল্যাডার, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হুক-পোল, কুড়াল ইত্যাদি নিয়ে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি শুরু করল লোকগুলো।

হৈ-চৈ, চিৎকার, গলা ফাটানো নির্দেশ, সব মিলিয়ে মুহূর্তে নরক গুলজার হয়ে উঠল। ব্যাপার দেখে পুরো হতভম্ব হয়ে গেছে গেম ককের প্রত্যেকে। বার ফেলে সামনের দিকে ছুটল টেণ্ডার পড়িমরি করে। তার পিছন পিছন বাকি খদ্দেররাও ছুটল। পলকে খালি হয়ে গেল গেম কক।

সব শেষে ভেতরে ঢুকল ফায়ার চীফের কার। এবং তার পিছনেই পুলিসের অসংখ্য স্কোয়াড কার। সবার একসঙ্গে ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি মিলিয়ে অবর্ণনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো সামনে।

'এইবার!' দ্রুত পিছন দিকে এগোতে আরম্ভ করল মাসুদ রানা। অন্যেরা অনুসরণ করল ওকে। খোলা দরজাটার সামনে

এসে থেমে দাঁড়াল রানা, ওয়ালথার বাগিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। জায়গাটা খালি দেখল ও, নেই কেউ। খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ভাল করে তাকাল বাইরে। না, সত্যিই কেউ নেই। একদম ফাঁকা গেম ককের ব্যাক ইয়ার্ড।

'এসো!' বলে পা বাড়াল রানা বাউণ্ডারি ওয়ালের দিকে। এক মিনিটের মধ্যে নিরাপদেই ভিড় ঠেলে গাড়িতে এসে উঠল ওরা। বিনা বাধায় গাড়ি নিয়ে উঠে এল বড় রাস্তায়। রবার্টো বা তার সঙ্গী-সাথী কারও টিকিরও দেখা পেল না ওরা কেউ।

চার

আবছা অন্ধকার ভেদ করে তীরবেগে ছুটছে বুইক রিভেরা। ভেতরে চুপ করে বসে আছে ওরা, কারও মুখে কথা নেই। মাস্তক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে, কিন্তু তাই নিয়ে ওদের কোন আনন্দ উচ্ছ্বাস নেই। সবাই গম্ভীর। ডুবে আছে যার যার চিন্তায়। এবারের মত বেঁচে যাওয়া মানে যে বরাবরের মত বেঁচে যাওয়া নয়, তা ওরা ভালই বোঝে।

'আরেকটু আস্তে করো, বিল্লাহ,' বলল মাসুদ রানা। 'ষাটের ওপর যেয়ো না, হাইওয়ে পেট্রোল ধরে ফেলতে পারে।'

গতি কমাল বিল্লাহ। মাইল মিটারের নিড্‌ল্ পঁচাত্তর থেকে ষাটে নেমে এল বুইকের। মিডল লেনে নিয়ে এল সে গাড়ি। রাত বাজে একটা, অথচ ট্রাফিকের অবস্থা দেখে মনে হয় সবে বুঝি দুপুর।

'দেশের সবাই কি আমাদের মত মায়ামি যাচ্ছে নাকি?' আনমনে অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল নাদিরা।

কেউ কোন উত্তর দিল না। ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি এক সময়। 'সুযোগ থাকার পরও বুইকের বুট ভাঙেনি রবার্টো,' বলল রানা চিন্তিত গলায়। 'প্রচুর সময় পেয়েও মালগুলো নেয়নি। এর অর্থ কি, ফয়েজ?'

'আমাদের গাড়ি কোনটা জানতো না সে, মাসুদ ভাই। শুধু আমরা গেম ককে আছি খবর পেয়েই ছুটে এসেছে।'

'ওকে দিল কে খবরটা?' বলল বিল্লাহ।

'খুব সম্ভব বারটেণ্ডার,' বলল মাসুদ রানা। 'তোমরা কেউ দেখেছ ওকে বারের ফোন থেকে কল করতে? অথবা পিছনের বুদের দিকে যেতে?'

'আমি দেখিনি।'

'আমিও না।'

'সমস্যায় পড়ে গেলাম।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'কি সমস্যা?' বলল ফয়েজ।

'এখন যেখানেই যাব সেখানেই এমনি তাড়া খেতে হবে আমাদের।'

'কেন?'

'তিনজন পুরুষ আর একজন মেয়ে একসঙ্গে জার্নি করছে দেখলেই সংবাদটা কেউ না কেউ পৌঁছে দেবে রবার্টোকে। সে নিশ্চই হাইওয়ের যত রেস্তোরাঁ, বার, ট্যাভার্ন, মোটেল, রোডহাউস ইত্যাদি আছে, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, যে আমাদের খবর ওকে জানাতে পারবে, তাকে মোটা বকশিশ দেবে সে। ওদের সঙ্গে মাফিয়ার নিজস্ব চর বাহিনীও আছে। সবাইকে বলে রেখেছে ওরা, এরকম কোন গ্রুপ দেখলে এই নাম্বারে কল করবেন, অথবা তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। গেম ককে ওরা আমাদের গাড়ি চিনতে পারেনি ঠিকই,

তবে এখন চেনে। আমরা বেরিয়ে আসার সময় গাড়িটা ওদের কেউ না কেউ নিশ্চই দেখেছে।'

'আমার মনে হয় না, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল মুত্তাকিম বিল্লাহ। 'বেরিয়ে আসার সময় ভাল করে লক্ষ করেছি আমি, ওদের গাড়ি দেখতে পাইনি। মনে হয় ঝামেলা টের পেয়ে আগেই সরে পড়েছে ব্যাটারা।'

'হ্যাঁ, আমিও লক্ষ করেছি,' বলল রানা। 'ছিল না গাড়ি দুটো। আর পিছনের দুই পাণ্ডা তো ছিলই না।' কিছু সময় চুপ করে থাকল ও, ভাবল কিছু। 'কেউ না দেখে থাকলে তো ভালই। আয়ু কিছুটা বাড়ল বুইকের।'

'কেউ দেখেনি আমাদের, শিওর ।' মাথা দোলাল ফয়েজ আহমেদ। 'যা পরিস্থিতি হয়েছিল! গণ্ডাগণ্ডা ফায়ার এঞ্জিন, পুলিসের গাড়ি, ওদের আর খদ্দেরদের উল্টোপাল্টা দৌড়-ঝাঁপ, তার ওপর অন্ধকার, দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

'যাক,' ফোঁস করে দম ছাড়ল বিল্লাহ। 'তাও ভাল। ডিলার ভায়া অন্তত কুকাজটা করেনি। তার মানে এখনই এটা ত্যাগ না করলেও চলবে।'

'ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় জানাল ফয়েজ। 'কি বলেন, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ। প্রার্থনা করি তোমাদের ধারণা যেন সত্যি হয়।'

মিনিট পনেরো নীরবে এগোল ওরা। একটু একটু করে কমে আসতে শুরু করেছে ট্রাফিক। ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। দুটো বাজতে চলেছে। 'বিল্লাহ্, সামনের টার্নঅফে গাড়ি ঘোরাও,' বলল ও। 'র‍্যালে ফিরে যাব আমরা। রাতটা ওখানে কাটিয়ে কাল আবার রওনা হব।'

'জ্বি,' একান্ত বাধ্যগতের মত বলল পাহাড়।

উইলসন পৌঁছে বুইক ঘোরাল সে, ফেডারেল হাইওয়ে টু সিক্সটি ফোর ধরে ফিরে চলল পশ্চিমে। র‍্যালের উপকণ্ঠে একটা অপরিচ্ছন্ন মোটেলে উঠল ওরা। অন্যান্যবারের মত দুটো ডবল রুম নিল। পালা করে ঘুমাল ওরা পরদিন প্রায় দুপুর পর্যন্ত। তারপর গোসল এবং পেট পুরে নাস্তা খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল।

'আমি বাইরে যাচ্ছি কিছুক্ষণের জন্যে,' একটার দিকে ঘোষণা করল মাসুদ রানা। 'জরুরী কিছু কেনাকাটা আছে। গাড়ি রইল। বিল্লাহ, ফয়েজ, সতর্ক থেকো। বিপদ দেখলে সটকে পড়বে নাদিরাকে নিয়ে।'

'জ্বি।'

'কি কেনাকাটা করতে হবে?' জানতে চাইল নাদিরা।

উত্তরটা এড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। 'তোমার কিছু লাগবে?'

'না।' মাথা দোলাল মেয়েটি। 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'নির্বিঘ্নে কাটানো গেলে দিনে বেরুচ্ছি না। রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে বের হব।'

'কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে আমাদের যদি পালাতে হয়?' পরিষ্কার উদ্বেগ প্রকাশ পেল নাদিরার কণ্ঠে। 'যদি…যদি…'

'ভয় নেই। এতক্ষণেও যখন কিছু ঘটেনি সেরকম, আর ঘটবে বলে মনে হয় না। যদি ঘটেই যায়, ঘাবড়িয়ো না। এদের দু'জনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত রবার্টোর সাধ্য নেই তোমাকে স্পর্শ করে।'

'কিন্তু যদি পালাতেই হয়, তোমার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবে কি ভাবে?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। 'ওরা জানে কি ভাবে যোগাযোগ করতে হবে। ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না তোমাকে। খেয়ে-দেয়ে আরেক দফা ঘুম দাও, নয়তো টিভি

দেখো, ওদের সঙ্গে গল্প করো তবে চেষ্টা কোরো রূম থেকে না বেরুতে। বেশি সময় লাগবে না আমার। পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসব।'

'যদি দেরি হয়ে যায় আপনার?' বলল ফয়েজ। 'আমি বা বিল্লাহ আসব খোঁজ নিতে?'

'না।' অকস্মাৎ বন্ধুসুলভ সুর উধাও হয়ে গেল মাসুদ রানার কণ্ঠ থেকে, কর্তৃত্বের ভরাট সুর ফুটল সেখানে। 'কাউকে আসতে হবে না। সোজা সরে পড়বে তোমরা একে নিয়ে। পরিষ্কার?'

দু'জনেই মাথা নাড়ল ওরা। নীরবে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। রূমের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল নাদিরা। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। নানার কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর কষ্টার্জিত সংগ্রহের কথা, সাফাত সিটিতে ওদের স্বপ্নের মত সুন্দর বাড়িটার কথা। কোত্থেকে কি হয়ে গেল ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল নাদিরা।

নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন ছেড়ে কী করে নিজেকে এমন জটিল এক পরিস্থিতিতে জড়াল, ভেবে অবাক লাগল নিজেরই। সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে আরও কয়েকজনকে। ওরই সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তাদের ভাগ্য। দুটো তরতাজা প্রাণ এরই মধ্যে ঝরে গেছে নাদিরাকে সাহায্য করতে গিয়ে। আরও যদি কেউ···। চট করে উঠে বসল ও, মাথা থেকে দূর করে দিল আজেবাজে চিন্তা। কিছুক্ষণ টিভিতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা চালাল। কিন্তু কাজ হলো না।

সকার গেম চলছে টিভিতে। এই খেলাটা একদম সহ্য করতে পারে না ও। ঢোলের মত প্যাডেড জার্সি আর গ্রিল লাগানো হেলমেট পরে মাঠ জুড়ে ষাঁড়ের মত কাঁধ দিয়ে গুঁতোগুঁতি, যাচ্ছে তাই! টিভি অফ করে দিল নাদিরা। দুটোর দিকে রূমে আনিয়ে

লাঞ্চ খেলো ওরা। কথাবার্তা তেমন একটা বলল না কেউ। সবাই ডুবে আছে নিজের নিজের ভাবনায়।

ঘড়ির কাঁটা ঠিকই চলছে, তবু ওদের মনে হচ্ছে সময় যেন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, পণ করেছে নড়বে না। তিনটে বাজল, তার এক যুগ পর চারটা। নানান দুশ্চিন্তা কাহিল করে ফেলেছে নাদিরাকে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে একা রানাকে যেতে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি। জোর করে হলেও বিল্লাহ বা ফয়েজ, একজনকে সঙ্গে দেয়া উচিত ছিল। ও যদি জেদ ধরে বসত, একজনকে সঙ্গে না নিয়ে পারত না রানা কিছুতেই। ভুল হয়ে গেছে, বড্ডো ভুল হয়ে গেছে।

কাঁটা যতই পাঁচটার দিকে এগোচ্ছে, ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে নাদিরা। কি হবে যদি মাসুদ রানা ফিরে না আসে? যদি ধরা পড়ে গিয়ে থাকে ও রবার্টো গার্সিয়ার হাতে? যদি···। ছোটখাট একটা লাফ দিল নাদিরার কলজেটা, গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে একটা ট্যাক্সি। পরক্ষণেই গভীর স্বস্তি ও প্রশান্তির একটা ঝিরঝিরে ধারা ান করিয়ে দিয়ে গেল নাদিরাকে, ওটার পিছনের সীটে মাসুদ রানাকে দেখেছে সে। পাঁচটা বাজতে তখন দশ মিনিট বাকি।

হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট নিয়ে ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। নাদিরার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ফুটল না ঠিকমত। ফ্যাকাসে লাগছে ওকে, কপাল চিক চিক করছে ঘামে। মনের মধ্যে বিপদের ডঙ্কা বেজে উঠল নাদিরার। 'কি হয়েছে, রানা?'

উত্তর না দিয়ে বিল্লাহর দিকে ফিরল রানা। 'সব ঠিকঠাক?'

'জ্বি, সব ঠিক।'

'বাঁচলাম! চলো, বেরিয়ে পড়ি। এখনই।'

'কি হয়েছে, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফয়েজ আহমেদ।

একটা আর্ম চেয়ারে বসে পড়ল মাসুদ রানা। কপালের ঘাম মুছল। 'ওকে দেখতে পেয়েছি আমি। রবার্টোকে। দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছে। ভয় হচ্ছিল, এখানকার খোঁজ পেয়েই এসেছে ভেবে।'

'ও আপনাকে দেখেনি তো?'

'না।'

'কতজন আছে রবার্টোর সাথে?'

'মোট আটজন।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেল ত্যাগ করল ওরা। বেরিয়ে পড়ল বুইক নিয়ে। মাসুদ রানা বসেছে সামনের প্যাসেঞ্জার'স সীটে, ড্রাইভ করছে ফয়েজ আহমেদ। রিয়ার ভিউ মিরর নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে রানা যাতে পিছনে ভাল করে নজর রাখা যায়। থেকে থেকে চোখ তুলছে ও, সন্দেহজনক কোন গাড়ি পিছু লেগেছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে।

স্মিথ ফিল্ডের ওপর দিয়ে এসে আবার রুট নাইন্টি ফাইভে উঠল বুইক। দক্ষিণ দিকে নাক সই করে ছুটল নিক্ষিপ্ত তীরের মত। ম্যাপ দেখে ফয়েজকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে মাসুদ রানা। ওর 'ডানে যাও' বা 'বাঁয়ে যাও' শব্দ ছাড়া আর কারও গলা শোনা যাচ্ছে না। মুখে তালা চাবি মেরে বসে আছে সবাই।

দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সামনে-পিছনে যতদূর চোখ যায় কেবল গাড়ি আর গাড়ি। পিঁপড়ের মত পিল পিল করছে হাইওয়েতে। কত যে বাহারি রঙের আর আকারের–মডেলের, বলে বোঝানো মুশকিল। সংখ্যায় ওগুলো অনেক বলেই বেশি বেশি মন খুঁত খুঁত করছে মাসুদ রানার। দশ-পনেরো, কি বিশ-পঁচিশটা গাড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে যে

ওদের অনুসরণ করছে না রবার্টো গার্সিয়া কে বলতে পারে?

সন্ধে গড়িয়ে গেল। ফিয়েটিভিল হয়ে লাম্বার্টনের দিকে চলেছে ওরা। ট্রাফিকের চাপ এর মধ্যে আরও বহু গুণ বেড়ে গেছে। দেড় ঘণ্টার পথ অতিক্রম করতে পুরো তিনটি ঘণ্টা ব্যয় হলো ওদের। ফেয়ারমন্ট পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে ব্রাঞ্চ রোডে গাড়ি ঢোকাল ফয়েজ। দ্রুত ডিনার খেলো ওরা এখানে, তারপর আবার দৌড়। ড্যাশ বোর্ডের মৃদু আভায় ম্যাপ দেখে পথের নির্দেশ জানাতে থাকল রানা ফয়েজকে। আধঘণ্টা নীরবে এগোল ওরা।

'র‍্যালেতে কি এত কিনলে, রানা?' জানতে চাইল নাদিরা। এত পথ পেরিয়ে এসে এই প্রথম মুখ খুলল সে।

ম্যাপটা ভাঁজ করে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ভরে রাখল মাসুদ রানা। আসনের ওপর পাশ ফিরে বসল, যাতে ওর মুখটা দেখতে পায় মেয়েটি। 'অনেক কিছু,' বলল ও। 'ওয়্যার ক্লিপার্স, লং-নোজড প্লায়ার্স, অল নামের এক ধরনের বিশেষ সূচ, একটা বিশেষ ডিজলভেন্ট, বল-পিন হ্যামার, আরও অনেক কিছু।'

বিস্ময় ফুটল মেয়েটির মুখে। 'কি ওগুলো! কি কাজে লাগবে?'

'অলঙ্কারগুলো ভাংতে।'

'যেমন?'

'ওগুলো ভেঙে পাথর আর সোনা আলাদা করব ঠিক করেছি। তাতে বোঝা অনেক কমে যাবে আমাদের। ঝামেলা কমবে।'

'ওসব করতে গেলে জিনিস নষ্ট হবে না?'

'না। সতর্ক হয়ে করলে কিছুই নষ্ট হবে না। বরং সুবিধেই হবে। সেটিং ভেঙে ফেললে ওগুলো বিক্রি করা কোন সমস্যা হবে না। একটা অলঙ্কার সেটে যখন একটা পাথর বসানো থাকে, তখন জানা থাকলে চেনা যায়। কিন্তু স্রেফ একটা পাথর বা এক

তাল গলানো সোনা চেনার কোন উপায় নেই।'

ভেতরের জমাট বাঁধা ভারি পরিবেশ খানিকটা তরল হলো। একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠতে শুরু করল আবার সবাই। এ মুহূর্তে সাউথ ক্যারোলিনায় আছে ওরা। বুইকের চাকার তলায় মরা সাপের মত নির্জীব পড়ে থাকা প্রশস্ত হাইওয়ে সাঁই সাঁই করে দ্রুত পিছিয়ে চলেছে। শীতে বাষ্প জমছে গাড়ির কাঁচে, কিছুক্ষণ পর পর ওয়াইপার চালিয়ে সামনেটা পরিষ্কার করতে হচ্ছে।

আচ্ছন্নের মত হেলান দিয়ে বসে আছে নাদিরা। ওর মনে হচ্ছে এ পথের বুঝি অন্ত নেই। কেউ যদি বলে দুনিয়ার আরেক মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই হাইওয়ে, এবং পরবর্তী স্টপেজ হংকং, নির্দ্বিধায় মেনে নেবে সে। একই গতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে চলেছে বুইক। ক্রমশ যৌবনে পৌঁছল রাত, তারপর প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়াল, তবু বিরাম নেই চলার। দূরে, অনেক সময় পর পর, ছোট-বড় শহরের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে ওরা আকাশে নিয়ন আলোর আভা দেখে।

ঘুম ঘুম আবেশ মাখা আধবোজা চোখে কেবল দেখেই চলেছে নাদিরা, আর অনুভব করার চেষ্টা করে চলেছে। আবার দেখেও দেখছে না, অনুভব করেও করছে না। পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থেকেও যেন নেই সে। দেহ থেকে আপন সত্তা যেন আলাদা হয়ে গেছে তার, নিজেকে এবং অন্যদের দেখছে দূর থেকে।

ফ্লোরেন্স, ম্যানিং, সামারটন পাশ কাটিয়ে লেক ম্যারিয়নের দিকে চলেছে ওরা এখন। বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। 'ট্যাঙ্কে তেল আর কত আছে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা। মুখের সামনে হাত এনে হাই তুলল লম্বা করে।

'তিন-চার লিটারের বেশি না,' বলল ফয়েজ।

'এবার তাহলে থামতে হয়। ভেবেছিলাম একবারে সাভান্না

গিয়ে বিশ্রাম নেব। তা আর হলো না। সামনের টার্নঅফে থামব আমরা, বিশ্রাম দরকার সবার।'

'ঠিক,' উঠে বসল নাদিরা। 'বিশ্রাম না নিলে আর একদম চলছে না। একবার বিছানায় পিঠ ঠেকালে এক সপ্তায়ও আমার ঘুম ভাঙবে কিনা সন্দেহ আছে।'

'ঠিক আছে,' বলল মাসুদ রানা। 'দেখা যাক, তেমন ভাল জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় কি না। পেলে দু'-এক দিন রেস্ট নেব আমরা, অবশ্য যদি রবার্টোর ধাওয়া খেতে না হয় এর মধ্যে।'

আরও পনেরো মিনিট পর পরবর্তী টার্নঅফে পৌঁছল ওরা। বুইক ঘুরিয়ে সেকেণ্ডারি রোডে ঢোকাল ফয়েজ। সামনে যে খুদে শহর পড়ল, তার নাম কূসাহোয়াচি। ইণ্ডিয়ানদের রাখা নাম খুব সম্ভব, ভাবল মাসুদ রানা, তাই শুনতে এরকম অদ্ভুত নাম। আধঘণ্টা ধরে ঘুমে বিভোর কূসাহোয়াচির বুক চষে ফিরল ওরা, কিন্তু হোটেল-মোটেল বা রোডহাউস, কোথাও ভ্যাক্যান্সি সাইন চোখে পড়ল না।

বিরক্ত হয়ে হাইওয়েতে ফিরে এল ওরা, ছুটল পরবর্তী শহরের উদ্দেশে। নাম তার রিজল্যাণ্ড। কিন্তু এখানেও সেই একই কাহিনী। পরের শহর হার্ডিভিল, জর্জিয়ার বর্ডারের আগের শহর। এখানে ভাগ্য দারুণভাবে সহায়তা করল ওদের। ছয় তলা এক নতুন হোটেলের চার তলায় স্থান পেল ওরা। সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা আছে এখানে। রূমে রূমে টিভি, খুদে রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি আছে। তাছাড়া হোটেলটা সেন্ট্রালি এয়ার কণ্ডিশণ্ড।

বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে এলিভেটরে চড়ল সবাই। কাপড় ছাড়ার কথা এমন কি ভাবল না পর্যন্ত কেউ, মাত্র দশ মিনিটে তলিয়ে গেল মরণ ঘুমে। ঘুম নেই কেবল মাসুদ

রানার চোখে। ওদের রুমের সামনের দিকের জানালা সোজা নিচে হোটেলের কার পার্ক। তাকালেই দেখা যায় বুইকটা। ধুলোর পুরু স্তর জমে আছে ওটার দেহে। একটা আর্ম চেয়ার এনে জানালার কাছে বসল ও, সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

ঘরের ওমাথায় নাক পর্যন্ত কম্বল টেনে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে নাদিরা। অনড়। কালো কম্বলের পটভূমিতে ওর ফর্সা মুখের আভাস দেখা যায় অল্প অল্প। একটা শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। কার পার্ক এবং তার আশপাশের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নজর। দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে এল ওর এক সময়, মেলে রাখতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ঘুম ঘুম একটা ভাব গ্রাস করে ফেলল মাসুদ রানাকে। অথচ ঘুম নয় সেটা, আবার জাগরণও নয়, অনেকটা জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে যেন রানা।

ভাবনা-চিন্তা পরিষ্কার নয়। একটা ভাবনা উদয় হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে, ধরতে পারছে না ও। নাকেমুখে কড়া রোদের আঁচ টের পেয়ে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা। চট্ করে চোখ বোলাল হাত ঘড়িতে—সোয়া নয়টা। ওরে বাবা! তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ও, পরক্ষণেই বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। একই ভঙ্গিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমানোর ফল, বিষ হয়ে গেছে পিঠ। নাদিরার বিছানা খালি দেখে চোখ কোঁচকাল রানা, বাথরুম থেকেও কোন শব্দ আসছে না। গেল কোথায় মেয়েটা?

জানালা দিয়ে নিচে তাকাল মাসুদ রানা। এক কণা ধুলোও লেগে নেই বুইকে, চকচক করছে ওটা। মনটা খুশি হয়ে উঠল ওর, নিশ্চই বিল্লাহ বা ফয়েজের কাজ। ট্যাঙ্কও হয়তো ফুল করে রেখেছে ওরা। সরে আসতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ করে নাদিরার ওপর চোখ পড়ল, একটা দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে সে,

হাতে ব্যাগ ঝুলছে। তার পিছন পিছন পাহাড় আর গরিলাও বেরিয়ে এল। হাসছে ওরা দু'জনে। রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল নাদিরার লাল পরচুলা।

বাথরুমে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। সময় নিয়ে শাওয়ার-শেভ সারল। তারপর নতুন এক সেট প্যান্ট শার্ট পরে নেমে এল নিচে। পেটে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। নিচে ওদের সঙ্গে যোগ দিল মাসুদ রানা। দিনের আলোর অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে, নাদিরার হাসি-খুশি, নিশ্চিন্ত চেহারা দেখে ভাবল ও। কয়েক ঘণ্টা আগের ভয়, আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই তার মধ্যে।

একাই চারজনের নাস্তা সাবাড় করল রানা। তারপর দু'কাপ কফি ও দুটো সিগারেট গিলে খানিকটা সুস্থির বোধ করল। প্রয়োজনীয় তেল-পানি পেয়ে ফুলস্পীডে কাজ শুরু করে দিল ওর মস্তিষ্কের কোষগুলো। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখল রানা ওদের সঙ্গে নিয়ে। প্রকাণ্ড এক শপিং সেন্টার আসলে এটা, দাঁড়িয়ে আছে তিনমুখো রাস্তার সংযোগস্থলে। নতুন সেন্টার, কনস্ট্রাকশন শেষ হয়নি এখনও। আধখানা চাঁদের মত গোল কমপ্লেক্সটা।

কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর, অসংখ্য বড় বড় দোকান, রেস্তোরাঁ, বুটিক, সিনেমা হাউস ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় খুদে একটা শহর। অবশ্য সব দোকান চালু হয়নি এখনও। সামনের পার্কিং-লটটা বিরাট। কমপ্লেক্সের এক মাথায় সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ওদের হোটেল, হোটেল চেরিব্লসম। তার পরেরটা একটা ছয় তলা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। ওর পাশেরটা সিনেমা হাউস। গায়ে গায়ে লাগিয়ে তোলা হয়নি ভবনগুলো, প্রতিটির মাঝে ব্যবধান রয়েছে পাঁচ-ছয় ফুট করে। মার্কেটের নাম ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড। ওয়াণ্ডারফুল, ভাবল মাসুদ রানা।

'চমৎকার জায়গা!' মৌনতা ভঙ্গ করল নাদিরা। 'সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, পোস্ট অফিস, লণ্ড্রি, বেকারি, মেন'স-উইমেন'স ক্লোদিং, আর কি চাই? পুরো একটা মাস কাটিয়ে দিতে পারি আমরা এখানে।'

'দুঃখিত। অত সময় দেবে না তোমাকে রবার্টো গার্সিয়া।'

কল্পনার জগৎ থেকে আচমকা ফিরে এল যেন নাদিরা কঠিন বাস্তবে। হাসি মুছে গেল মুখের। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'ভুলেই গিয়েছিলাম।'

খাওয়ার প্রয়োজনে বের হওয়া ছাড়া দিনের বাকি অংশ রুমেই কাটাল ওরা সবাই। রানা বাদে অন্যরা টিভি দেখা, গল্প-গুজব আর ঘুম, এই করে পার করল। রানা পড়ে থাকল র‍্যালেতে কেনা সরঞ্জাম ও ডজনখানেক ডায়মণ্ডের দামী নেকলেস, ইয়ার রিং নিয়ে। সলভেন্ট ঢেলে সেটিং থেকে পাথরগুলোকে প্রথমে আলগা করল মাসুদ রানা, তারপর লং নোজড প্লায়ার্সের সাহায্যে ভেতর থেকে তুলে আনল ওগুলো। চেইনগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। প্রথম সুযোগেই গলিয়ে ফেলবে ও টুকরোগুলো পরে তাল বানাবে তাই দিয়ে।

শুনে মনে হয় খুব সহজ কাজ বুঝি, আসলে খুবই কঠিন। অত্যন্ত ধীরে, সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়। নইলে যদি কোনরকমে একটা পাথরের কোনা ভেঙে যায়, বা ঘষা লেগে স্বচ্ছ ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়, ঝপ করে চার ভাগের এক ভাগে নেমে আসবে তার দাম। বেশিরভাগ পাথরই আবার নিচ থেকে উঠে আসা আঙুলের মত দেখতে দাঁড়া দিয়ে আটকানো। আঙুলগুলো যেন মুঠ করে ধরে রেখেছে পাথরটাকে, যাতে পড়ে না যায়।

দাঁড়াগুলো একটা একটা করে টেনে সোজা করা, তারপর ভেতরে সলভেন্ট ঢেলে সেটিং থেকে পাথর আলগা করা, সেটা

বের করে আনা, প্রচুর সময় সাপেক্ষ কাজ। কেবল বড় পাথরগুলো খুলল মাসুদ রানা, ছোট ডেকোরেটিভ ডায়মণ্ড চিপস্ রেখে দিল সেটিঙের সঙ্গেই। গভীর রাতে ক্ষ্যান্ত দিল মাসুদ রানা। এক ডজন ছোটবড় ডায়মণ্ড এবং কেজিখানেক সোনা জমেছে তখন টেবিলে।

'এগুলো বেচলে আগের দাম পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ও থাকল না আর। কোন্ পাথর কোন্ দোকান থেকে খোওয়া যাওয়া কোন্ নেকলেস বা ইয়ার রিঙের, বিন্দুমাত্র উপায় নেই বোঝার। ক্রেতাকে সহজেই বোঝাতে পারবে তুমি, পাথরগুলো ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিনে জমিয়েছ তুমি নগদ টাকার বদলে। এখন ক্যাশ দরকার, তাই বেচতে চাইছ। কেউ কোন প্রশ্ন করতে যাবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তোমরা।' টুলসগুলো চামড়ার একটা ব্যাগে ভরে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল মাসুদ রানা।

এদিকে নাদিরা, ফয়েজ ও বিল্লাহ অনুমান করতে বসল কোন পাথরটার দাম কত হতে পারে।

পরের দিনটা কেটে গেল কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই। খেয়ে, শুয়ে-বসে আর নিচের পার্কিং-লটে চোখ রেখে সময় পার করল ওরা। রানা আগেরদিনের মতই ভাঙাচোরার কাজে ব্যস্ত থাকল। দুপুরে খাওয়ার সময় কি চিন্তা করে বুইকটা হোটেলের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছে মাসুদ রানা। রেখে এসেছে পাশের এক ডিপার্টমেন্ট স্টোরের জেনারেল পার্কিং-লটে। হোটেলের সামনে তেমন একটা গাড়ি নেই, ফাঁকা জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বুইকটা থেকে থেকে খোঁচাচ্ছিল চোখে।

আরও একদিন কাটাল ওরা হার্ডিভিলে। পরদিন দুপুর থেকে শুরু হলো বাঁধা-ছাদার কাজ। ধীরেসুস্থে গোছগাছ করে নিল

ওরা। সন্ধের পর নিচ থেকে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে এল। কিছু সময় বিশ্রাম নিল। আটটার সময় শেষ সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'আমি নিচে যাচ্ছি,' বলল ও। 'গাড়িটা হোটেলের সামনে রেখে অপেক্ষা করব। ঠিক দশ মিনিট পর নেমে আসবে তোমরা।'

'আপনি কেন, মাসুদ ভাই?' বলল মুত্তাকিম। 'আমরা একজন যাই!'

'না, আমিই যাচ্ছি। জাস্ট ওয়েট।'

বেরিয়ে গেল মাসুদ রানা। দশ মিনিট নয়, মাত্র দু'মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরেও এল। চেহারা থমথমে। 'ঝামেলা।'

ছাঁৎ করে উঠল নাদিরার বুক। 'কি!'

'এসে পড়েছে ওরা।'

'রবার্টো?'

'আর কে?'

'হায় আল্লাহ্!' ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল মেয়েটি। চেহারা দেখে ভয় হলো এখনই কেঁদে উঠতে যাচ্ছে। 'এখন কি হবে?'

'নিচে কোথায় দেখেছেন ওকে?' জানতে চাইল বিল্লাহ।

'ডেস্কে। কথা বলছে রিসেপশনিস্টের সাথে।'

'ওপরে উঠে আসবে না তো?' সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত আচরণ করতে শুরু করেছে নাদিরা। ভালই জানে ও, এটা গেম কক নয়। পালাতে হলে নিচে নামতে হবে, হয় সিঁড়ি দিয়ে, নয়তো এলিভেটর দিয়ে। অথচ তার একটাও সম্ভব হবে না যদি রবার্টো নিচে বসে থাকে পথ আগলে। যদি উপরে উঠে আসে সে দলবল নিয়ে···।

'না, তা করবে না। হোটেলে গোলাগুলির ঝুঁকি নেবে না ওরা। ওরা নিশ্চই নিচে পাহারা বসাবে, অপেক্ষায় থাকবে কখন আমরা নামব।'

অস্ফুটে বলে উঠল ফয়েজ, 'সেরেছে!'

উঠল মাসুদ রানা। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল। 'হ্যালো! স্যাম মরিসন বলছি রুম নাম্বার ফোর টেন থেকে। আমার কয়েকজন বন্ধু আসার কথা ছিল, এসেছে কেউ? আচ্ছা! গুড! কয়জন? আট জন, না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। লবিতে অপেক্ষা করছে ওরা? আই সী! না, কিছু বলতে হবে না। আমি নিজেই আসছি। ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'যা ভেবেছিলাম! নিচে অপেক্ষা করছে ওরা লবিতে।'

'আট জন?' প্রশ্ন করল বিল্লাহ।

'হ্যাঁ। তবে আমার ধারণা সংখ্যাটা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে। নিশ্চই আরও লোকজন ডাকবে এখন রবার্টো, পুরো এলাকা সীল করে দেবে যাতে আর কোন চাল চাললেও ব্যর্থ করে দেয়া যায় আমাদের।'

'আরেকবার ফায়ার আর পুলিস ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?' বলল নাদিরা।

মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'এ জায়গা গেম ককের তুলনায় অনেক বড়। পালাতে পারব না আমরা।'

চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে লাগল মাসুদ রানা। অস্বাভাবিক গম্ভীর। কোন আশা দেখতে পাচ্ছে না ও উদ্ধারের।

'আমার প্ল্যানটা এখানে খাটালে কেমন হয়, মাসুদ ভাই?' সাহস করে বলে উঠল বিল্লাহ।

'উঁহুঁ, চলবে না। কেবল আমরা হলে নেয়া যেত ঝুঁকিটা।

কিন্তু নাদিরা আছে আমাদের সঙ্গে। কাজেই ওরকম কিছু করতে যাওয়া হবে চরম বোকামি। মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে।'

নীরবতা।

পায়চারি করছে মাসুদ রানা। ওদের তিন জোড়া চোখ অনুসরণ করছে তাকে। এক সময় থেমে পড়ল রানা। তাকাল বিল্লাহ ও ফয়েজের দিকে। 'আর কোন আইডিয়া পেয়েছ কেউ?'

'ফায়ার এস্কেপ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি আমরা,' বলল ফয়েজ।

'ওখানে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে গেছে অনেক আগেই।'

'বেজমেন্ট?' বলল বিল্লাহ।

'ওখান থেকে বেরুতে হলে ফায়ার এস্কেপের দরজার পাশ দিয়েই বেরুতে হবে, আমি দেখেছি চেক্ করে।'

আবার কিছুক্ষণ চলল রানার পায়চারি। এবং আচমকা থমকে দাঁড়াল ও, মুচকে হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে।

'কি?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা।

'আমরা সবাই নিচে নামার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেবল। কারণ যুক্তিমতে পালাবার রাস্তা নিচেই।'

'কি বলতে চাও?' চোখ কোঁচকাল মেয়েটি।

'ওপরদিক থেকে একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'মানে?'

ফয়েজ ও বিল্লাহর দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'হোটেলের ছাদ থেকে লাফিয়ে যদি পাশের দালানের ছাদে যেতে পারি, তাহলে একটা চান্স আছে, কি বলো তোমরা?'

খুশিতে লাফিয়ে উঠল পাহাড়। 'তাই তো! ঠিক বলেছেন, মাসুদ ভাই!'

ফয়েজ হাসল দাঁত বের করে। 'চলুন। শালারা বসে বসে

আণ্ডা পাড়ুক, আমরা হাওয়া হয়ে যাই।'

'দাঁড়াও। এখনই এত আশাবাদী হয়ো না। আগে ছাদ থেকে ঘুরে দেখে আসি অবস্থা। ফয়েজ এসো আমার সাথে। বিল্লাহ, দরজা লাগিয়ে দাও। আমার গলা না শোনা পর্যন্ত দরজা খুলবে না কিছুতেই। ওকে?'

'ওকে।'

বেরিয়ে গেল ওরা।

পাঁচ

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে রানা-ফয়েজ বেরিয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই। নিজের খাটে ফ্যাকাসে মুখে বসে আছে নাদিরা, বিল্লাহ বসেছে দরজার দিকে মুখ করে, একটা আর্মচেয়ারে। ঘন ঘন টেনে তিনটে সিগারেট পুড়িয়েছে সে এর মধ্যে, চতুর্থটা ধরাবার আয়োজন করছে। দরজার কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওদের সব লাগেজ।

এক জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল দরজার বাইরে, এদিকেই আসছে। স্থির হয়ে গেল বিল্লাহ, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল দরজার দিকে। পরক্ষণেই মাসুদ রানার গলা শুনে ছুটে গিয়ে খুলে দিল সে দরজা। হাসি মুখে ভেতরে ঢুকল ওরা দু'জন।

'চলো,' নাদিরার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। বিল্লাহর দিকে ফিরল। 'ছাদ দিয়েই পালাতে হবে। পাশেরটা একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর, উচ্চতা এটার সমান। মাঝখানের ফুট পাঁচেক ব্যবধান লাফিয়ে পার হতে পারলেই হলো।'

'পাঁচ ফুট মাত্র!' তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল পাহাড়ের মুখে।

'কিন্তু নাদিরা? ও পারবে লাফিয়ে পার হতে?'

'ভয় করবে ঠিকই। কিন্তু সাহস করে লাফ দিলে ঠিকই উৎরে যাবে। চলো, চলো। সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।'

যেটুকু রং ছিল চেহারায়, সেটুকুও গায়েব হয়ে গেল নাদিরার পরিকল্পনা শুনে। আবার বসে পড়ল সে ধপ করে। 'অসম্ভব, রানা। আমি পারব না। তোমরা বরং আমাকে রেখে চলে যাও।'

'বাজে বোকো না!' ধমকে উঠল মাসুদ রানা। 'আগে ওপরে চলো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে ফাঁকটা কত সরু। একটা বাচ্চা মেয়েও অনায়াসে লাফিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবে।'

জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল মেয়েটি। মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে দেহে। 'সম্ভব নয়। ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না কোনদিনও। দোহাই লাগে, তোমরা চলে যাও। আমার জন্যে নিজেদের বিপদ আর বাড়িয়ো না, প্লীজ!'

'আচ্ছা, বেশ। ওপরে গিয়ে ফাঁকটা দেখতে তো অসুবিধে নেই! আগে চলোই না। দেখে যদি অসম্ভব মনে হয় তোমার, তখন বোলো। তখন না হয় অন্য চিন্তা করা যাবে। এখন দয়া করে ওঠো, রবার্টো যদি সিদ্ধান্ত পাল্টে ওপরে চলে আসে, তাহলে বিপদ হয়ে যাবে। চলো।'

বেরিয়ে এল ওরা। বিল্লাহ আর ফয়েজের হাতে দুটো করে সুটকেস। মাসুদ রানার বাঁ হাতে নাদিরার ব্রিফকেস, একই কাঁধে একটা শোল্ডার ব্যাগ, এবং ডান হাতে সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার। নাদিরার কাঁধে একটা শোল্ডার ব্যাগ। সামনে থাকল রানা, তারপর নাদিরা। ওর পিছনে ফয়েজ, সবশেষে বিল্লাহ। নির্জন করিডর দ্রুত অতিক্রম করে পিছনের ফায়ার এস্কেপের সামনে চলে এল ওরা। এলিভেটরে চড়ার ঝুঁকি নেয়নি রানা ইচ্ছে করেই, কারও চোখে পড়ে যেতে পারে ওদের আকাশ পথে

পালানোর কসরত।

লোহার পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে প্রায় নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল ওরা মিছিল করে। টপ ফ্লোরে উঠে শেষ হয়ে গেছে লোহার সিঁড়ি। তার পাশেই শান বাঁধানো চওড়া সিঁড়িঘর, ছাদ থেকে সোজা নেমে গেছে বেসমেন্টে।

বেশ শীত পড়েছে আজ। তার ওপর বইছে কনকনে উত্তুরে বাতাস। ঝকঝকে নির্মেঘ নীল আকাশ, তার গায়ে হীরের দ্যুতি নিয়ে জ্বলছে অগুনতি নক্ষত্র। পায়ের নিচে ছড়ানো পানির পাইপ আর ভেন্টিলেশন গ্যাপ এড়িয়ে সাবধানে কিনারার দিকে এগোল ওরা। এক হাতে নাদিরার বাহু ধরে রেখেছে মাসুদ রানা। কিনারার ফুটখানেকের ব্যবধানে এসে দাঁড়াল সবাই। সামনেই হাঁ করে আছে যেন দুই বিল্ডিঙের মাঝের ফাঁকটা। কালো।

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল নাদিরার। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সে, 'এই গ্যাপ কিছুতেই সাত ফুটের নিচে হতে পারে না।'

'আরে না!' বলল মাসুদ রানা। 'পাঁচ ফুটের এক ইঞ্চিও বেশি হবে না। এই গ্যাপ পেরুনো পানির মত সহজ। বিলিভ মি!'

বোবা জানোয়ারের মত এপাশ ওপাশ মাথা দোলাতে লাগল মেয়েটি, হাত ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে জোরাজুরি করছে। 'ন্না! প্লীজ, রানা! আমি পারব না। ছেড়ে দাও আমাকে। কিছুতেই পারব না আমি।'

'আচ্ছা, শান্ত হও। দেখ। ফয়েজ, একটা লাফ দিয়ে দেখাও তো নাদিরাকে কাজটা কত সহজ!'

সুটকেস রেখে ওভারকোট খুলল সে। ওটা পায়ের কাছে দলা করে ফেলে তিন পা পিছিয়ে গেল। পিচ্চি একটা দৌড় দিয়েই শূন্যে ভেসে পড়ল ফয়েজ আহমেদ, নিঃশব্দে প্রকাণ্ড একটা কালো বাদুড়ের মত উড়ে গিয়ে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ছাদে পড়ল।

পড়েই এক পা এগিয়ে দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল সে, ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার দাঁতের আভাস দেখতে পেল সবাই, হাসছে গরিলা।

'দেখলে? শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ তুমি। একটু সাহস দরকার কেবল, তাহলেই দেখবে কত সহজ এই সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করা।'

উঁকি দিয়ে ফাঁকটা ভাল করে দেখল আরেকবার মেয়েটি। তারপরই সভয়ে পিছিয়ে এল। 'ওরে বাবা!'

'নিচে তাকিয়ো না।'

'আমি পারব না, রানা।'

'নিশ্চই পারবে! নিজের চোখেই তো দেখলে মোটেই কঠিন নয় কাজটা।'

'না, পারব না।'

'মনে করো সামান্য কাদা-পানি জমে আছে পথের ওপর, লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছ তুমি। সামান্য একটা কাজ।'

'অসম্ভব! কিছুতেই পারব না আমি!' ফুঁপিয়ে উঠল নাদিরা।

'একশোবার পারবে! পারতেই হবে তোমাকে।' খেপে গেল মাসুদ রানা।

শব্দ করে কেঁদে উঠল মেয়েটি। 'না না, পারব না আমি! কিছুতেই পারব না। তুমি জানো না, উঁচু জায়গার ভীতি আছে আমার। হাজার চেষ্টা করলেও এ ভয় মন থেকে যাবে না এখন, বিশ্বাস করো।' নাক টানল নাদিরা। 'তারচে' সময় নষ্ট না করে তোমরা চলে যাও, রানা। দোহাই লাগে! আমার জন্যে নিজেদের জীবন বিপন্ন কোরো না। চলে যাও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। কোমরে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকাল। কথা নেই কারও মুখে। 'কি হলো?'

পাশের ছাদ থেকে চাপা গলায় ডাকল ফয়েজ। 'আসছেন না কেন কেউ? দেরি হয়ে যাচ্ছে তো!'

'বিল্লাহ, সুটকেসগুলো ছুঁড়ে দাও ফয়েজের দিকে। ওর ওভারকোটটাও।'

নীরবে নির্দেশটা পালন করল পাহাড়। সুটকেস, শোল্ডার ব্যাগ, ওভারকোট, সব একে একে ছুঁড়ে দিল পাশের ছাদে। ক্যাচ ধরে পায়ের কাছে সব সাজিয়ে রাখল ফয়েজ।

'চলে যাও তোমরা, রানা,' কাঁপা গলায় বলল নাদিরা। 'প্লীজ, চলে যাও। আমাকে নিয়ে...'

'শাটাপ্!' ধমকে উঠল রানা। 'বিল্লাহ, এদিকে এসো তো!'

চিলেকোঠার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। পরখ করছে রানা দরজাটা। দুই ইঞ্চি পুরু কাঠের তৈরি ছয় বাই সাড়ে তিন হবে দরজাটা। তিনটে কবজার ওপর ঝুলে আছে। 'পাল্লাটা খুলে ফেলার চেষ্টা করে দেখা যাক, কি বলো?'

কবজাগুলো স্পর্শ করে দেখল বিল্লাহ। মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় পারা যাবে, মাসুদ ভাই।'

'এসো, দু'জনে মিলে ট্রাই...'

'তার কোন দরকার নেই। সরে যান। আগে আমি একা চেষ্টা করে দেখি খানিক। তারপর প্রয়োজন হলে...।' বলতে বলতে মস্ত দুই থাবায় সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল পাহাড় দরজার ওপরটা, মেঝেতে পা বাধিয়ে দেহের সব শক্তি এক করে এক হ্যাঁচকা টান মারল বাইরে এবং নিচের দিকে। নাক দিয়ে আপনাআপনি একটা 'হুঁক্' জাতীয় আওয়াজ বেরুল তার। কিচ্ছু হলো না, কবজায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে কাষ্ঠ-কপাট।

সোজা হয়ে দাঁড়াল পাহাড়। বুক চিতিয়ে দম নিল, রানাকে এগোতে দেখে হাত তুলে নিষেধ করল, পরমুহূর্তে আরেক হ্যাঁচকা

টান মারল পাল্লা ধরে। এবারের 'হুঁক্'টা হলো আরও জোরাল। কট কট দুটো আওয়াজ উঠল পর পর, ভেঙে গেছে ওপরের কবজার দুটো স্ক্রু। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল বিল্লাহর। পরের টানে আরও দুটো স্ক্রু ভাঙল। পাঁচ মিনিটের মাথায় আস্ত পাল্লাটা একাই মেঝেতে শুইয়ে ফেলল বিল্লাহ। তর্জনী দিয়ে কপাল আঁচড়ে ঘাম ঝরাল। প্রকাণ্ড বুকের ছাতি ঘন ঘন ওঠানামা করছে, দম ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস।

দু'জনে মিলে উঁচু করে ছাদের কিনারায় নিয়ে এল পাল্লাটা, দুই ছাদের মধ্যে সেতু বানাল ওটা দিয়ে। সতর্কতার সঙ্গে করতে হলো কাজটা। দেহের প্রায় সবটুকু শক্তি এক করে পাল্লাটা এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে পাশের ছাদের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিল রানা ও বিল্লাহ। ওপাশ থেকে যতটা সম্ভব সামনে ঝুঁকে ওটার প্রান্ত ধরল ফয়েজ, তারপর টেনে নিয়ে বসাল কিনারায়। দেখা গেল, ওদের অনুমানই ঠিক, মাপা পাঁচ ফুটের ব্যবধান দুই ছাদের মধ্যে। দুই দিকেই ছয় ইঞ্চি করে বাড়তি রয়ে গেল সেতুর দুই প্রান্ত।

সেতুর ওপর উঠে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'চোখ বন্ধ করে আমার হাত ধরো,' নাদিরাকে বলল ও। 'এসো।'

চোখ বুজল ঠিকই মেয়েটি, কিন্তু কাঁপুনি বেড়ে গেল বহু গুণ। হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত এগোল। ওকে ধরে সেতুর ওপর সঠিক জায়গায় পা রাখতে সাহায্য করল বিল্লাহ। 'আল্লার নাম নিয়ে পা বাড়ান, কোন ভয় নেই। আপনার পিছনেই আছি আমি। পড়লে সবাই এক সঙ্গে পড়ব,' বলেই আঁতকে উঠল সে নাদিরাকে ব্রেক কষতে দেখে। 'না না, পড়ব না! ও একটা কথার কথা। চলুন চলুন।'

যেন কয়েক যুগ পর মাসুদ রানার গলা শুনতে পেল নাদিরা।

'হয়েছে। এসে গেছি আমরা। চোখ খুলতে পারো এবার।'

চোখ মেলে তাকাল নাদিরা। হোটেল বিল্ডিঙের দিকে তাকাল মুখ ঘুরিয়ে। তারপর ওদের দিকে। মুখে সলজ্জ হাসি।

দরজাটা টেনে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হলো এবার ওরা তিনজন। ভীষণ ওজন, ছাদের কিনারা গলিয়ে নেমে আসতেই ঝপ্ করে নিচের দিকে রওনা হয়ে যেতে চাইল পাল্লাটার ওপ্রান্ত, পতনটা রোধ করতে শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করতে হলো ওদের তিনজনকেই। এপাশের মিলিত শক্তির কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য হলো দরজাটা। খানিকটা নেমে থেমে গেল, দোল খেলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর টান খেয়ে রওনা হয়ে গেল পাশের ছাদের দিকে।

একই কায়দায় তার পাশের মুভি থিয়েটার ভবনের ছাদে চলে এল ওরা। প্রথমবারের মত এবারও সেতুতে চড়ার সুযোগ হলো না ফয়েজের, অগ্রবর্তী সাহায্যকারী হিসেবে লাফিয়ে পেরুতে হলো তাকে। থিয়েটার ভবনের দূরত্ব বেশি, প্রায় দশ ইঞ্চি মত। ফলে দুই ছাদের কিনারায় সেতুর মার্জিন থাকল মাত্র এক ইঞ্চি করে। সবার শেষে পার হলো বিল্লাহ। প্রায় নাচতে নাচতে এল সে মাঝখান পর্যন্ত। থেমে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। থুথু ফেলল শব্দ করে। তারপর দুই পদক্ষেপে এপারে। থিয়েটারের ওপাশের বাড়িটা অনেক নিচু, কোনমতেই যাওয়া যাবে না ওটায়। তাই এটা দিয়েই নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা।

'দরজাটার কি ব্যবস্থা করা যায়, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফয়েজ। 'নিয়ে আসব এপাশে, না ফেলে দেব?'

'এপাশে এনে রাখাই নিরাপদ। ফেলে দিলে শব্দ হবে খুব। জানাজানি হয়ে যাবে তাহলে।'

কাজটা সারতে প্রচুর সময় লাগল এবার। ছাদের ওপর

পাল্লাটা শুইয়ে রাখা হলো নিঃশব্দে। 'এবার এদের ফায়ার এস্কেপ খুঁজে বের করতে হয়,' বলল রানা। 'একেক জন একেক দিকে যাও, খোঁজো। ওটা বাইরের দিকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি!'

ছড়িয়ে পড়ল ওরা তিনজন। নাদিরা দাঁড়িয়ে থাকল মাঝখানে। ওর খোঁজার প্রশ্নই আসে না। কারণ এ দালানের ফায়ার এস্কেপ রুট নিশ্চই অন্তত এক ফ্লোর নিচে, এবং বাইরে। ওটা বের করতে হলে কিনারা দিয়ে নিচে ঝুঁকতে হবে তাকে। অসম্ভব! অবাক হয়ে তিন পুরুষ সঙ্গীর কার্যকলাপ দেখতে থাকল সে। ভেবে পেল না ওরা কোন্ সাহসে দেহের অর্ধেক বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

সিঁড়িটা আবিষ্কার করল ফয়েজ আহমেদ। এক ফ্লোর নিচেই। ছাদে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে নেমে এল ওরা। যদিও তার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। মানুষজনের ছায়াও নেই ধারেকাছে। ভেতরে ছবি চলছে। মারামারির 'ধাঁই' 'ধুঁই', আর গোলাগুলির, 'ঠাঁই' 'ঠুঁই' শব্দে গরম হয়ে আছে হল। এটার ফায়ার এস্কেপের সিঁড়িও লোহার, তবে পেঁচানো নয়, আঁকাবাঁকা, জিগজ্যাগ। নিচের দিকে তাকাতেই মাথার মধ্যে চক্কর মেরে উঠল নাদিরার। চোখের পাতা জোরে বুজে রেখে, এক হাতে মরচে পড়া রেলিং শক্ত মুঠোয় ধরে এক পা এক পা করে নামতে লাগল সে।

একেবারে শেষ ফ্লোরের সিঁড়িটা বিশেষ সিঁড়ি, কাউন্টারওয়েইটেড সুইং স্টেয়ার। ফার্স্ট ফ্লোরের কার্নিস বরাবর ঝুলছে ওটা হাতলসহ। এক হাতে হাতল ধরে সিঁড়ির একমাত্র বেরিয়ে থাকা ধাপটায় পা রাখল বিল্লাহ, অন্যহাতে একটা সুটকেস। ওর দেহের ভারে শক্তিশালী স্প্রিং ফিট করা সিঁড়িটা মাটির দিকে নামতে শুরু করল সড় সড় করে।

ধাপের ওপর থেকে পা না সরিয়ে ঝুঁকে সুটকেসটা মাটিতে রাখল বিল্লাহ, তারপর নেমে পড়ল। এক হাতে টেনে ধরে রেখেছে সিঁড়ির হাতল, যাতে ভারশূন্য হয়ে পড়ায় স্প্রিঙের টানে উঠে না যায়। সবাই নেমে এলে হাতল ছেড়ে দিল বিল্লাহ, সাঁ করে উঠে গেল সিঁড়িটা, নাগালের বাইরে চলে গেল।

মুভি হাউস ও ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মাঝখানের ফাঁকায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনের কমপ্লেক্সে লোকজন, গাড়িঘোড়ার আসা-যাওয়া, ব্যস্ততা দেখতে পাচ্ছে ওরা পরিষ্কার, কিন্তু ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। অবশ্য থিয়েটার এবং স্টোর, দুটোরই কোণে, রাস্তার দিকের প্রান্তে বাঁকানো পাইপের মাথায় জোরাল আলো জ্বলছে। পিছনে শেড আছে বলে এদিকে আসছে না আলো। মাত্র কয়েক গজ সামনে গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলেই বুইকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে ওরা। ডিপার্টমেন্ট স্টোরের সামনের জেনারেল পার্কিং লটে রয়েছে ওটা।

বাঁ হাতে একটা সুটকেস তুলল বিল্লাহ, আরেকটা ভরল বাঁ বগলের তলায়। ডান হাতে শোভা পাচ্ছে তার ভয়ঙ্কর দর্শন এক লুগার। 'আমি আগে যাই, মাসুদ ভাই,' বলল সে। 'বুটে রেখে আসি মালপত্র।'

'দাঁড়াও। আমিও যাব।' রানা নিল একটা সুটকেস আর নাদিরার ব্রিফকেস। 'ফয়েজ, তুমি আর নাদিরা অপেক্ষা করো। আমরা আসছি।'

সতর্ক পায়ে গলিটা পেরিয়ে দুই বিল্ডিঙের মুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বাঁয়ে। মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বুইক রিভেরা। তার আরও গজ দশেক ওপাশে, চার-পাঁচটা গাড়ির আড়ালে দেখা গেল পাশাপাশি দুটো প্রকাণ্ড কালো গাড়ি। রবার্টোর গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল।

ভেতরটা ফাঁকা, নেই কেউ। এগোল ওরা, বেরিয়ে এল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের সামনের খোলা প্রান্তরে।

চেরিব্লসমের প্রবেশ পথের ওপর সতর্ক নজর রেখে দ্রুত পায়ে বুইকের পিছনে এসে দাঁড়াল ওরা। বুট খুলে ঝটপট ভেতরে ঢোকাল বোঝা চারটে, লাগিয়ে দিল বুটের ডালা। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল মাসুদ রানা। 'নিয়ে এসো ওদের তাড়াতাড়ি।'

পা চালাল বিল্লাহ। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে দুই বোঝা নিয়ে বেরিয়ে এল সে কানা গলি থেকে। তার পিছনে ভীত সন্ত্রস্ত নাদিরা, সবশেষে ফয়েজ। হাতে অবশিষ্ট সুটকেসটা রয়েছে তার। পেভমেন্টে উঠে কয়েক পা এগিয়েই দীর্ঘদেহী এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেলো বিল্লাহ। বিড় বিড় করে ক্ষমা চেয়ে তার সামনে থেকে সরে গেল ও। কিন্তু লোকটা নড়ল না। চোখ কুঁচকে পালা করে দেখছে ওদের। ব্যাপারটা লক্ষ করে আঁতকে উঠল মাসুদ রানা, দেখামাত্র বুঝেছে, লোকটা রবার্টোর সেলসম্যানদের একজন।

লম্বা। গায়ে টপকোট, মাথায় চওড়া কিনারাওয়ালা ফেডোরা হ্যাট। স্টোর থেকে বেরিয়ে আসছিল লোকটা, হাতে এক প্যাকেট সিগারেট ও একটা বীয়ারের ক্যান। একটু দেরিতে হলেও, রানার মত ফয়েজও টের পেল বিপদটা, থমকে গেল সে। হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল লোকটা। সিগারেট, বীয়ার ফেলে চট করে ডান হাত টপকোটের পকেটে সেঁধিয়ে দিল, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার। পলকে বের করে ফেলেছে সে একটা কোল্ট।

এক লাফে ওদের আর লোকটার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ফয়েজ, সুটকেসটা দু'হাতে বুকের সামনে বর্মের মত ধরে ষাঁড়ের মত ছুটে গেল লোকটার মাঝে। 'বিল্লাহ, সাবধান!' বলেই ঝাঁপ

দিল সে। একই মুহূর্তে ফয়েজকে লক্ষ্য করে গুলি করল লম্বা, প্রচণ্ড 'কড়াক!' শব্দে আঁতকে উঠল পুরো কমপ্লেক্স। মৃদু ধাতব একটা আওয়াজ উঠল, সুটকেসের নরম চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে বুলেটটা, বাধা পেয়েছে সোনার স্তূপে।

বুনো শুয়োরের মত 'ঘোঁৎ' করে উঠল ফয়েজ প্রচণ্ড রাগে। দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরে গেছে। ওদিকে দুই বোঝা এক হাতে নিয়ে অন্যহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে নাদিরাকে কাঁখে লটকে তীরবেগে গাড়ির দিকে ছুট লাগিয়েছে বিল্লাহ। পলকে দূরত্বটুকু পেরিয়ে গেল সে। অন্যদিকে এক পা বাইরে বের করে, হাতে ওয়ালথার ধরে আকস্মিক আপদটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। উদ্বিগ্ন। খুব সহজ একটা টার্গেট, কিন্তু ফয়েজের গায়ে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে গুলি করতে সাহস হচ্ছে না।

ছোট একটা লাফ দিয়েই সুটকেসসমেত লম্বার ঘাড়ে চড়াও হলো ফয়েজ অসুরের শক্তি নিয়ে। আগের মতই বর্ম হিসেবে বুকের সামনে ধরে রেখেছে সে ওটা। টলে উঠল লোকটা, পরমুহূর্তে আক্রমণকারীর দেহের ভারে হুড়মুড় করে পড়ে গেল চিত হয়ে, তার অজান্তেই আঙুলের চাপ লেগে বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় গুলি। সোজা আকাশের দিকে ছুটল ওটা।

পেড়ে ফেলেই লোকটার বুকের ওপর চেপে বসল প্রাক্তন হেভিওয়েট বক্সার। বাঁ হাতে নারকেল থ্যাঁতলানো প্রচণ্ড এক ঘুসিতে নাকমুখ সমান করে দিল তার পেভমেন্টের সঙ্গে। অসহ্য যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লম্বা, হাত থেকে ছুটে গেছে আগ্নেয়াস্ত্র। দু'হাতে সুটকেস তুলল ফয়েজ, ওটা দিয়ে ভয়ঙ্কর এক আঘাতে কপাল এক ইঞ্চি ভেতরে দাবিয়ে দিল তার। মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে, পর মুহূর্তে থেমে গেল

সে চিরতরে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল এত কিছু। রাগের মাথায় আবার সুটকেস তুলল ফয়েজ, এই সময় পায়ের শব্দ পেল। ধুপ ধাপ পা ফেলে ছুটে আসছে কয়েকজন।

গুলির শব্দে হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরও দুই টপকোট। এপাশের দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল তারা, তারপরই কোটের প্রান্ত উড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে শুরু করল। দুটোরই ডান হাত বাঁ হাতের চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা। 'ফয়েজ!' চাপা কণ্ঠে হাঁকল মাসুদ রানা। 'চলে এসো!' বলেই পিস্তল তুলল ও। ছুটতে ছুটতেই সামনের টপকোট অস্ত্র তুলে ফেলেছে, গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা ফয়েজকে।

'দুপ!'

সোজা তার মাথায় গিয়ে বিদ্ধ হলো রানার ছোঁড়া গুলিটা। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠেই আছড়ে পড়ল লোকটা, হাতের আগ্নেয়াস্ত্র খসে গেছে। শান বাঁধানো পেভমেন্টে খটাখট আওয়াজ তুলে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে থেমে পড়ল ওটা। সঙ্গীর অবস্থা চাক্ষুস করে ঘাবড়ে গেল অন্যজন, ঝপ্ করে বসে পড়ল পথের ওপর।

পুরো এলাকা কাঁপিয়ে দিয়ে ব্যাক করল বুইক রিভেরা, কয়েক গজ পিছিয়ে এসে তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে চিতার মত লাফ দিল সামনে, ঘুরেই বড় রাস্তার দিকে ছুটল তীরবেগে। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেরিব্লসমের আলোকিত প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রবার্টো গার্সিয়ার ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। কোন রকম চাঞ্চল্য নেই তার মধ্যে। ওদের ধাওয়া করার ব্যস্ততা নেই।

দুই কোমরে হাত রেখে স্থির চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা। প্রশস্ত ঢালু কাঁধ, অসম্ভব চওড়া বুক। দাঁড়ানোর মধ্যে

রাজকীয় একটা ভাব আছে মানুষটার। পিনস্ট্রাইপড ভেস্টেড সুট পরে আছে রবার্টো, গলায় বো টাই। মাথায় বসানো রয়েছে দামী ব্রিটিশ বাউলার হ্যাট। গাড়ি বাঁক নেয়ার সময় স্থির চোখে একবার নাদিরা, আরেকবার মাসুদ রানাকে দেখল রবার্টো। সরাসরি ওদের চোখে চোখ রেখে। ভাবের লেশমাত্র নেই সে দৃষ্টিতে। চোখ দুটো যেন কোন মূর্তির, পাথুরে চোখ।

গায়ের মধ্যে শির শির করে উঠল মাসুদ রানার। মনে হলো কপাল ভেদ করে ওদের মগজে সেঁধিয়ে গেছে বুঝি রবার্টোর দৃষ্টি। কি ভাবছে ওরা, সব যেন দেখতে পাচ্ছে লোকটা। হঠাৎ কেমন খটকা লাগল যেন মাসুদ রানার। ব্যাটা কি হাসল শেষ মুহূর্তে? হ্যাঁ, তাইতো! কেন হাসল রবার্টো? কি অর্থ হতে পারে হাসিটার? মনে হলো যেন ব্যঙ্গ করল ওদের লোকটা। যেন বোঝাতে চাইছে, পালিয়ে যাবে কোথায় তোমরা? কত দূরে?

ছয়

কোথায় আছে ওরা সে সম্পর্কে তিলমাত্র ধারণা নেই নাদিরার। কোনদিক থেকে কোনদিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদের মাসুদ রানা, কে জানে! জানতে ইচ্ছেও করছে না তার। কেমন এক ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে যেন নাদিরা, কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, মন চাইছে এক ঘুমে পার করে দেয় বাকি জীবন।

সাভান্না অতিক্রম করে ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা, উঠে এল রুট সেভেন্টিন-এ। মিডওয়ের সামান্য আগে আরেকবার ডানে ঘুরে রুট এইটি টু-তে পড়ল। পশ্চিমে চলেছে। মাঝরাত নাগাদ

হাইনসভিল অতিক্রম করল ওরা। সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের জেসাপ। পথে দু'বার কিছুক্ষণের জন্যে থামল মাসুদ রানা। প্রথমবার কফি খাওয়ার জন্যে, মিডওয়ের আউটস্কার্টে। পরেরবার জেসাপে, তেল নেয়ার জন্যে।

জেসাপে বিল্লাহর হাতে স্টিয়ারিঙের দায়িত্ব দিল মাসুদ রানা, নিজে উঠল পিছনের সীটে, নাদিরার পাশে। রুট থ্রী ও ওয়ান ধরে ফোকস্টোনের দিকে চলেছে এখন ওরা। সেখান থেকে যাবে জ্যাকসনভিল, আবার হাইওয়ে নাইন্টি ফাইভ ধরবে সেখানে। রাত আড়াইটায় খুদে শহর ওয়েক্রসে পৌঁছল ওরা। হার্ডিভিল তিনশো কিলোমিটারেরও কিছু বেশি পিছনে ফেলে এসেছে এরমধ্যে।

একটা মোটেলে ভ্যাকান্সি নোটিস ঝুলতে দেখে যাত্রাবিরতি করল মাসুদ রানা। মোটেলটা তেমন একটা পরিচ্ছন্ন নয়, তবে সেদিকে নজর দেয়ার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থা কারও নেই। অন্যান্যবারের মত এবার রাত জেগে পাহারায় বসতে দিল না রানাকে বিল্লাহ ও ফয়েজ। প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দিল বিছানায়, ওরা পালা করে পাহারা দেবে আজ।

বিছানায় পিঠ ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম জয় করে নিল মাসুদ রানাকে, এক টানে তলিয়ে নিয়ে গেল সগভীর অতলে। সকাল আটটায় ঘুম ভাঙল ওর বিকট শব্দে। মাথার কাছের বন্ধ জানালার বাইরে কোন আহাম্মক যেন ট্র্যাশ ক্যান খালাস করছে ডাম্প ট্রাকে। হাতের সঙ্গে সমান তালে মুখ চলেছে তার, শিস বাজাচ্ছে লোকটা বেদম জোরে। বিছানা ছাড়ল মাসুদ রানা। কান ঝালাপালা করা উৎকট আওয়াজ তুলে চলে গেল ডাম্প ট্রাক।

পাশের বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে নাদিরা। এক জোড়া পুরু কম্বলের নিচ থেকে দু'চোখ আর নাকের ডগাটা বেরিয়ে আছে

তার। এই প্রথম লক্ষ করল রানা, চেহারা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। চোখের নিচে হালকা কালির ছাপ পড়েছে মেয়েটির। খুব স্বাভাবিক, ভাবল রানা, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার, প্রাণ হারানোর আতঙ্ক তাড়িয়ে ফিরছে ওদেরকে। এ সময় এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শব্দ না করে বাথরুমে ঢুকল মাসুদ রানা। শাওয়ার-শেভ সেরে ঝকমকে হয়ে বেরুল পনেরো মিনিট পর। তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রুম থেকে। বিল্লাহ ও ফয়েজ আরও আগে থেকেই তৈরি হয়ে বসে আছে। মোটেলের রেন্টিং অফিসের দিকে চলল ওরা। ডেস্কের পিছনে ইয়া মোটা এক বুড়ি বসা আছে, নখে পালিশ লাগাচ্ছে যত্নের সঙ্গে। দৈর্ঘ্যে মাসুদ রানার অর্ধেকের সামান্য বেশি হবে হয়তো বুড়ি, কিন্তু প্রস্থে মাশাল্লাহ! ওর তিনটের কম হবে না কোনমতেই।

ওদের দেখে হাতের কাজ থেমে গেল বৃদ্ধার, রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'গুড মর্নিং, সানি! কি চমৎকার ঝলমলে সকাল, তাই না?'

'রাইট, ম্যাম।' বাউ করল মাসুদ রানা। 'সত্যিই চমৎকার।'

'তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?'

'আপাতত তিন কাপ কফি চাই আমরা।'

'নিশ্চই!' পালিশ রেখে উঠল বৃদ্ধা। 'প্রতি কাপ পঁয়ত্রিশ সেন্ট।'

চেক-ইন ডেস্কের মাথায় দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। একটা ইলেক্ট্রিক কফি মেকার থেকে তিন কাপ কফি ঢালল। 'ক্যান্ড্ দুধ চলবে, সানি?'

'না, ধন্যবাদ। কালো কফি চাই।'

'চিনি?'

'এক চামচ করে, প্লীজ।'

কাপে কাপে চামচ নাড়তে লাগল বৃদ্ধা। 'তোমার চার্মিং ওয়াইফকে দেখছি না যে? এখনও ঘুমাচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।' গলা খাঁকারি দিল মাসুদ রানা। 'ওর ঘুম বেশি।'

'কিসের বেশি?' তেড়ে উঠল সে। 'এই বয়সে ঘুমাবে না তো কি বুড়ি হলে ঘুমাবে? আমার মত বয়সে? জানো, আজকাল ঘুম আমার একেবারেই হয় না? বুড়ো হলে ঘুম কমে যায় সবার, জানো? এটাই হচ্ছে আসল ঘুমের সময়, এই বয়সটা।'

ওদের কফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘুম সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা চালিয়ে গেল বৃদ্ধা। তারপর সরে গেল অন্য প্রসঙ্গে। 'তোমরা চলেছ কোনদিকে, বাছা?'

'দক্ষিণে।'

'বুঝেছি, মায়ামি!' আপনমনে মাথা দোলাতে লাগল সে। 'ডিজনিল্যাণ্ড গিয়েছ কখনও? যাওনি! বিরাট মিস করেছ। আমি আর আমার স্বামী গত বছর গিয়েছিলাম বেড়াতে। ওখানে মিকি মাউসের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেছি আমি, জানো? কল্পনা করতে পারো মিকি মাউসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি আমি?'

'এখানে থাকলে বক্ বক্ করে বুড়ি মাথাটা আমার বিগড়ে দেবে,' নিচু কণ্ঠে বলল বিল্লাহ। 'মাসুদ ভাই, চলুন কেটে পড়ি।'

একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। 'কীপ চেঞ্জ।'

'থ্যাঙ্ক ইয়া, সানি! গড ব্লেস ইয়া!' খুশিতে চকচক করে উঠল বৃদ্ধার প্রকাণ্ড মুখটা।

বেরিয়ে এসে সঙ্গী দু'জনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে জরুরী কিছু আলোচনা করল মাসুদ রানা। কি করতে চায় ও জানাল। এক বাক্যে সম্মত হলো ফয়েজ ও বিল্লাহ। রূমে ফিরে

নাদিরার ঘুম ভাঙাল মাসুদ রানা। তৈরি হয়ে নিল সে। মোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। শহরের এক রেস্টুরেন্টে নাস্তা খেলো পেট পুরে, তারপর রওনা হয়ে গেল উত্তর-পশ্চিম দিকে।

হু-হু করে তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল বুইক রিভেরা। মাথার ওপর প্রকাণ্ড এক কড়াইয়ের মত ঝুলে আছে কড়া সূর্য, গনগনে উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছে নির্বিকার চিত্তে। দিনে এই, অথচ রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ে। একে একে আলমা, হ্যাজেলহার্স্ট, ম্যাকরে এবং ইস্টম্যান ছাড়িয়ে এল ওরা। ম্যাকরে-তে আধঘণ্টা থেমেছিল ওরা নিজেদের এবং বুইকের পেট ভরার কাজে, তারপর আবার বিরামহীন চলা। প্রথমে গাড়ি চালাচ্ছিল ফয়েজ, ম্যাকরে-তে তাকে সরিয়ে মাসুদ রানা বসেছে হুইলে।

চলছে তো চলছেই ওরা, যেন শেষ নেই এ চলার, কোনদিন ফুরোবে না এ পথ। কোথায় চলেছে মাসুদ রানা, বুঝতে পারছে না নাদিরা। প্রশ্ন করে যে জেনে নেবে, সে ইচ্ছেও নেই। বসে আছে তো বসেই আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। এর মধ্যে চার লেনের প্রশস্ত কংক্রিটের হাইওয়ে তিন লেনে এসে ঠেকেছে প্রথমে, তারপর দুই লেন, তারও পরে এক লেনে। এরপর নুড়ি আর আলকাতরার কার্পেটিং করা অমসৃণ, সরু রাস্তা ধরে ছুটল কিছুক্ষণ বুইক। সবশেষে এসে পড়ল দুটো গাড়ি কোনরকমে পাশ কাটাতে পারে, এমন এক সরু গ্রাম্য রাস্তায়। পিছনে ঘন ধুলোর চওড়া লেজ নিয়ে ছুটতেই থাকল বুইক।

একটার পর একটা ক্রসরোড টাউন পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা, ওয়েস্টার্ন ছবিতে যেমন ছোট ছোট শহর দেখানো হয়ে থাকে, তার চার ভাগের এক ভাগও নয় এগুলো। দু'দিকে রং জ্বলে যাওয়া পুরানো ওভারলস পরা পুরুষ, সুতির পোশাক পরা মহিলা, খচ্চর টানা ওয়াগন, এবং হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা ষাঁড় টানা

লাঙলের সাহায্যে কৃষকের জমি চাষ ইত্যাদি দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। এদিককার মাটি একেবারে খটখটে শুকনো, মানুষগুলোও তাই। অতি খাটুনি সময়ের অনেক আগেই বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে এদের। মেজাজ খিটখিটে করে তুলেছে।

যত্রতত্র থুথু ফেলছে এরা এবং অনবরত। ওদের দেখছে এমন দৃষ্টিতে, যেন পারে তো কাঁচা চিবিয়ে খায়। আরও একটা জিনিস লক্ষ করার আছে এসব ক্রসরোড টাউনে। পুরুষদের শতকরা প্রায় চল্লিশজনই একটা না একটা অঙ্গ হারিয়েছে। হয় একটা হাত অথবা এক পা নেই। ছেলে-কিশোরদেরও এক অবস্থা।

'ফার্ম মেশিনারী,' অন্যদের অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে বলল মাসুদ রানা। 'এ ধরনের অঙ্গহানির জন্যে দায়ী ট্রাক্টর, বাইণ্ডার অথবা থ্রেশার। কাজ করতে করতে কখন যে বিপদ ঘটে যায়, বোঝা মুশকিল।' একটু বিরতি। 'সন্ধে হয়ে এল প্রায়। এখানেই চেষ্টা করে দেখা যাক, কি বলো?'

কাউকে নির্দিষ্ট করে কথাটা বলেনি রানা, কাজেই বিল্লাহ-ফয়েজ দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। 'সেই ভাল,' বলল ফয়েজ। শহরের একমাত্র গ্যাস স্টেশন থেকে বুইকের ট্যাঙ্ক ভরে নিল রানা। নাদিরা দেখল, স্টেশনের সামনে একটা টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছেগু হুইটার, জর্জিয়া।

'এখানে কেন এলাম আমরা, রানা?'

'কয়েকদিন থাকব বলে।'

বিস্মিত হলো নাদিরা। 'এখানে! এটা কোন থাকার জায়গা হলো?'

'সে জন্যেই তো এসেছি। আমরা এখানে আসতে পারি কল্পনাই করবে না কেউ। একটা ছাড়া কোন কিছু দুটো নেই

এখানে। গ্যাস স্টেশন, জেনারেল স্টোর, রেস্তোরাঁ, হার্ডওয়্যার স্টোর ইত্যাদি সবকিছু একটার বেশি দুটো নেই। এমন জায়গায় আমরা আছি ভাববেই না কেউ। এবং সেটাই আমি চাইছি।'

'মোটেল নেই কোন?'

'মোটেল! এখানে মোটেল আসবে কোত্থেকে?'

'তাহলে? থাকব কোথায় আমরা?'

'খুঁজে দেখতে হবে। এ ধরনের টাউনে সাধারণত বয়স্ক চিরকুমারী অথবা বিধবা পরিচালিত ট্যুরিস্ট অ্যাকোমোডেশন হাউস থাকে। ''ট্যুরিস্টস ওয়েলকাম'' অথবা শুধু ''বোর্ডারস'' সাইন ঝোলে সামনে।'

'যদি না থাকে?' সংশয় প্রকাশ করল নাদিরা।

'আছে।' নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'অন্তত একটা থাকতেই হবে।' ফুয়েলের দাম পরিশোধ করল ও। আবার গাড়ি ছাড়ল। পাঁচ মিনিট পর পাওয়া গেল বাড়িটা। প্রকাণ্ড, ছবির মত সুন্দর সাদা একটা বাড়ি। সামনের বড়সড় লনটা অসম্ভবরকম সবুজ। সামনে দুটো খুঁটির মাথায় ঝোলানো আছে একটা নোটিসগু ট্যুরিস্ট অ্যাকোমোডেশনস্—ডে, উইক, মানথ।

সামনের বিশাল পোর্চে রকিং চেয়ারে বসে আছে ঢ্যাঙামত এক বৃদ্ধা, দোল খাচ্ছে ধীরগতিতে। একভাবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হাতে একটা তাল পাতার পাখা, তাই দিয়ে থেমে থেমে বাতাস করছে নিজেকে। একটা গাড়ি সামনের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে, আমলই নেই।আসন ত্যাগ করা তো দূরের কথা।

'বুড়ি খুব দেমাগী মনে হচ্ছে!' বলল বিল্লাহ।

'চোখ দুটো লক্ষ করেছ, কেমন খাই খাই করছে?' মহিলার চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পন্ন করল ফয়েজ।

'নামো সবাই,' বলল মাসুদ রানা। 'ফয়েজ, তুমি খুঁড়িয়ে হাঁটো। বুড়িকে বোঝাতে হবে পায়ে ব্যথা পেয়েছ তুমি।' খুলল আর দড়াম দড়াম বন্ধ হলো বুইকের তিন দরজা। রানা নামল শেষে। এয়ার কণ্ডিশনিং ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে স্টার্ট বন্ধ করল না ও। দরজা লাগিয়ে নাদিরার এক হাত ধরল, পা বাড়াল সামনের দিকে। ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে পোর্চের দিকে এগোচ্ছে এখন। আগের মতই স্থির চোখে ওদের দেখছে বৃদ্ধা। ভীষণরকম ধীরস্থির। দুলুনি বন্ধ হলো না তার মুহূর্তের জন্যেও। সামান্য এদিক-ওদিক হলো না পাখার দোল।

আরও কাছে আসতে বোঝা গেল যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মহিলার। কম করেও সত্তর। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য হালকা-পাতলা। মুখটা কুড়ালের মত, চাউনি কঠোর। চওড়া কবজি। সুতির স্কার্ট ব্লাউজ পরে আছে মহিলা, মুখ চলছে সারাক্ষণ। কিছু চিবাচ্ছে সে। চুইংগাম, অথবা তামাক। পরে জেনেছে ওরা, আলকাতরার দলা চিবাচ্ছিল বৃদ্ধা। কে নাকি তাকে পরামর্শ দিয়েছে, ওই জিনিস সারাক্ষণ চিবালে দাঁত ঝকঝকে সাদা থাকে।

'গুড আফটারনুন, ম্যাম।' থেমে দাঁড়াল রানা বৃদ্ধার পাঁচ হাত তফাতে। হ্যাট নামিয়ে নড করল লম্বা করে। ফয়েজ আর বিল্লাহ ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

উত্তরে নড করল বৃদ্ধা অভিজাত ভঙ্গিতে। পাখা চালাতে লাগল ধীরগতিতে। 'খুব গরম পড়েছে।'

'ঠিক বলেছেন, ম্যাম,' সায় দিল মাসুদ রানা। একটু সময় নিল। 'আমার নাম স্যাম মরিসন। আর এ আমার স্ত্রী, মেরি। ওরা আমার দুই বন্ধু, ডিক আর রিচার্ড। ম্যাকন থেকে আসছি আমরা, দক্ষিণে যাব। পথে হঠাৎ রিচার্ড ব্যথা পেয়েছে পায়ে, ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে। মারাত্মক কিছু নয় অবশ্য।

ডাক্তার বলেছে কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। তাই ভাবলাম এখানেই কোথাও থেকে যাই দু'দিন। নতুন জায়গাও দেখা হবে, সঙ্গে বিশ্রামও হবে ওর। আপনার এখানে যদি দুটো রুম পাওয়া যায়, খুব উপকার হয় আমাদের।'

কথা বলল না বৃদ্ধা। রকিং চেয়ারের দুলুনি বা হাত পাখা, দুটোই আগের মত চলছে একই তালে-ছন্দে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল রানা ও বৃদ্ধা। মাসুদ রানার মনে হলো, কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে যেন। চারদিক অসম্ভবরকম নীরব। মাঝেমধ্যে এক আধটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। বৃদ্ধার স্থির, পলকহীন চাউনি দেখে রানার কেন যেন মনে হলো, ও যে সত্যি কথা বলেনি, কিছু লুকাচ্ছে, তা সে ধরে ফেলেছে।

অবশেষে মুখ খুলল বৃদ্ধা। 'কি নাম বললেন আপনার? স্যাম মরিসন?'

'হ্যাঁ। আমার জন্ম ব্রিটেনে। তবে বহু বছর ধরে এ দেশে আছি। ম্যাকনে ছোটখাট একটা ইণ্ডাস্ট্রি আছে আমার। আর আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ি উত্তরে।'

এমনভাবে মাথা দোলাল বৃদ্ধা, যেন ব্রিটেন থেকে যারা এ দেশে আসে তাদের ম্যাকনে থাকাই স্বাভাবিক, এবং তারা সবাই অবশ্যই উত্তরে বিয়ে করে।

'প্রতিদিন দশ ডলার,' পাখা দোলাতে দোলাতে বলল বৃদ্ধা। 'মাথাপিছু। নাস্তা সরবরাহ করা হবে। তবে দুপুর ও রাতের খাবার টাউনে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে আপনাদের। হক্সির রান্না খুব আহামরি কিছু নয়, তবে একেবারে মন্দও নয়। দিন কয়েক চালিয়ে যেতে পারবেন। রুমে রান্না করা চলবে না। আমার এখানে কোন হার্ড-লিকার নেই, রাখি না। যদি আপনারা চান,

রূমে বসে খেতে পারবেন, আমি বাধা দেব না। আইস কিউব প্রয়োজন হলে কিচেন রেফ্রিজারেটর থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। পার্লারে একটা টিভি আছে আমার, যদি দেখার ইচ্ছে হয়, দেখতে পারবেন।' এক চিলতে হাসির আভাস ফুটল যেন বৃদ্ধার পাতলা ঠোঁটের কোণে। 'ইউ আর ওয়েলকাম।' এখন আর আগের মত কঠোর মনে হচ্ছে না কুড়ালমুখো বৃদ্ধাকে। 'আমি মিসেস পার্ল হক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম। বোঝা যাচ্ছে আপনার এখানে চৎমকার কাটবে আমাদের সময়।' পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল মাসুদ রানা।

'আমিও সেটাই আশা করব।'

পুরো সাত দিনের টাকা তার হাতে তুলে দিল রানা। বুড়ির কথাটার মানে কি? এমনিই বলল, না কিছু বোঝাতে চাইল? ভাবছে ও।

'বাড়ির পিছনে আমার গ্যারেজে আপনাদের গাড়ি রাখতে পারেন। গ্যারেজটা বেশ বড়। আমার পুরানো একটা প্লিমাউথ থাকে। আর থাকে কয়েকটা মুরগি, একটা বকরি, আর একটা হাউণ্ড। ওরা কোন সমস্যা করবে না।'

সম্ভাবনাটা প্রায় অবশ্যম্ভাবি, তবু জানতে চাইল রানা, 'মিস্টার হক···?'

'মারা গেছে। অনেক আগে।'

'শুনে দুঃখ পেলাম।'

যে রূম দুটো দেয়া হলো ওদের, অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর। খুব যে দামী বা দুর্লভ আসবাবে সাজানো তা নয়। তবে ও দুটো দেখলে পঞ্চাশ বছর আগের মধ্যবিত্ত গ্রাম্য মার্কিনীদের জীবনধারা, রুচি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

মোম পালিশ করা ঝকঝকে কাঠের ফ্লোর। প্রকাণ্ড জানালায় ঝুলছে ফিনফিনে সাদা কাপড়ের হাতে সেলাই করা পর্দা। ম্যাপেল কাঠের ফার্নিচার, এত স্বচ্ছ পালিশ করা যে চেহারা দেখা যায় আয়নার মত। স্প্রিণ্ডলের ওপরে বসানো খাট, ইচ্ছে করলেই ঘোরানো যায় যেদিক খুশি। চমৎকার প্রিন্ট ভেলভেটে মোড়া পুরু গদির আর্মচেয়ার। চার দেয়ালে ছোট বড় কয়েকটা করে বাঁধানো ফ্রেম ঝুলছে। কারও ছবি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের নয়, ফার্নের পাতা ইস্ত্রি করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে ওতে।

সবকিছু এত সুন্দর করে সাজানো-গোছানো, এত পরিচ্ছন্ন যে মোহিত না হয়ে পারল না ওরা। বাতাসে ল্যাভেণ্ডারের মৃদু সুবাস ভাসছে। পাতলা পর্দা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা পড়ন্ত রোদের আলো স্বপ্নীল করে তুলেছে পরিবেশ। ওদের দুই রূম লাগোয়া আরও তিনটে বড় আকারের বেডরূম আছে। একই ভাবে সাজানো-গোছানো। খালি সব।

পরিবেশের এমনই গুণ, বিপদ, শঙ্কা সব ভুলে গেল ওরা ঘরে পা দিয়েই। বুইক গ্যারেজে রেখে মালপত্র নিয়ে এল ওপরতলায়। নাদিরা নেই ওদের সঙ্গে। নিচের পোর্চে মিসেস হকের সঙ্গে জমে গেছে সে। 'মহিলা ওপরতলায় থাকেন না,' আধঘণ্টা পর ফিরে এসে জানাল নাদিরা। 'নিচতলার পার্লারে থাকেন, সোফায় ঘুমান।'

'কেন?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'বাত আছে পায়ে। আর্থ্রাইটিস। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়, তাই। তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে তাঁর। অনেক প্রশংসা করলেন তোমার।'

'আমার! বলো কি?'

'হ্যাঁ, খুব!'

'অবিশ্বাস্য!'

'খুব সরল সোজা মানুষ।'

'তাই ভাবছ তুমি?'

'কেন, তুমি অন্য কিছু ভাবছ নাকি?'

'হ্যাঁ, ভাবছি।'

'কেন?'

'কেন? কারণ মিসেস হক মোটেই সরলসোজা নয়। বরং যথেষ্ট চতুর।'

চোখ কোঁচকাল নাদিরা। 'যেমন?'

'মহিলা খুব ভাল করেই টের পেয়ে গেছেন যে আমরা পালাচ্ছি। সে পুলিসের তাড়া খেয়েই হোক, বা আর যার তাড়া খেয়ে হোক।'

হাসি শুকিয়ে গেল মেয়েটির। 'মানে?' একটা ঢোঁক গিলল সে। 'তা মিসেস হক বুঝলেন কি করে?'

'খুব সহজ! আমি কি বলেছি ওঁকে, দক্ষিণে যাচ্ছি আমরা, এই তো? দক্ষিণে বলতে ফ্লোরিডা বোঝায় সাধারণত, যতক্ষণ না আর কোন স্থানের নাম উল্লেখ না করা হচ্ছে। এবং কোত্থেকে? ম্যাকন থেকে। ব্যাপারটা যদি সত্যিই হত, তাহলে হুইটারের ত্রিসীমানার মধ্যেও আসার কথা নয় আমাদের। সেক্ষেত্রে রুট ষোলো ধরে রুট পঁচানব্বইয়ের দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল আমাদের। অথবা দক্ষিণে গিয়ে রুট পঁচাত্তর হয়ে পঁচানব্বই ধরে অরল্যাণ্ডো যাওয়া। অথচ তার কোনটাই না করে চলে এসেছি আমরা জর্জিয়া। রাতে সূর্য ওঠা যেমন অসম্ভব, এ-ও তেমনি। মহিলা আর যাই হোক, বোকা নয়। ভালই বুঝতে পেরেছে আমরা পালাচ্ছি, এবং আমাদের আত্মগোপনের উপযুক্ত জায়গা দরকার। অন্তত কিছুদিনের জন্যে।'

'তাহলে কেন···?'

'সোজা। টাকা চাই, অথবা মানুষের সঙ্গ চাই। যে কোন একটা, অথবা দুটোই হতে পারে এর কারণ। কথা বলার সময়ই তার চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে পরিষ্কার, আমার একটা কথাও সে বিশ্বাস করেনি। তবে···' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা, অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকল বাইরে। 'এটাও সে ভালই বুঝতে পেরেছে যে আমরা তার ক্ষতি করব না। তেমন খারাপ মানুষ আমরা নই। তাই থাকতে দিয়েছে। নইলে হাঁকিয়ে দিত। কে সাধ করে ঘাড়ে ঝামেলা নিতে চায়?'

'কিন্তু···কিন্তু যদি কাউকে জানিয়ে দেয় আমাদের কথা?'

মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'না, তা-ও সে করবে না। আমরা যার লেজ-ই মাড়িয়ে থাকি, তাতে কিছু আসে-যায় না মিসেস হকের। কাজেই মুখ বন্ধ রাখবে সে। এদের প্রকৃতিই এমনি, যার যার নিজের ধান্ধায় থাকে। কাজটা যদি কেউ করে, টাউনের কেউ করবে, মিসেস হক নয়। সে যাক্, চলো নিচে যাই। ঘুরে ফিরে দেখে আসি জায়গাটা।'

নেমে এল ওরা। পোর্চে মিসেস হকের সঙ্গে দু'য়েকটা বাক্য বিনিময় করল রানা ও নাদিরা। অন্য দু'জন মুখ বুজে থাকল। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল বাড়ির সীমানার বাইরে। চারদিকের সৌন্দর্যের প্রাচুর্য দেখে মনে হলো রানার জীবনটা এখানে কাটিয়ে দেয়া গেলে মন্দ হত না। সূর্য ডুবতে বসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। কুয়াশার চিহ্নও নেই কোথাও। খুব হালকা বাতাস বইছে। সারাদিনের অসহ্য গরমের পর বাতাসের শীতল পরশ দেহমনে স্বর্গীয় আবেশ ছড়িয়ে দিল সবার।

মাথার ওপর ফত্ ফত্ আওয়াজ শুনে চোখ তুলল ওরা। খাটো, মাথা বাঁকা তরবারির মত কালো একটা কি পাখি যেন,

গোল হয়ে ঘুরছে। রকেটের মত খাড়া হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে, আবার একই ভাবে ডাইভ দিয়ে ফিরে আসছে আগের উচ্চতায়, ফের শুরু হচ্ছে তার চক্কর।

'চিকেন হক,' বলল ফয়েজ আহমেদ। 'বহুত বজ্জাত।'

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। আরও দু'তিনবার ওপরে উঠল ওটা, গোঁত্তা খেয়ে নেমে এল। তারপর মিলিয়ে গেল। সামনে একটা বড়সড় জলাশয় দেখে সেদিকে এগোল ওরা। একটা সরু খাল, চওড়া বিশ ফুটের মত। পানি খুব ঘোলা, একেবারে কাদাগোলা রং। নাক কোঁচকাল নাদিরা, শব্দ করে শ্বাস টানল কয়েকবার। 'কিসের গন্ধ লাগছে না? কেমন কাদা কাদা গন্ধ?'

মাসুদ রানাও নাক টানল। 'ক্যাটফিশ। মাগুর-শিং, কাদার ভেতর গর্ত করে থাকে। কাদা খোঁচাখুঁচি করছে ওরা।'

সাত

সাড়ে সাতটায় ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে নেমে এল ওরা। পার্লার থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এল মিসেস হক। 'টাউনে চললেন?'

'হ্যাঁ, ম্যাম,' বলল মাসুদ রানা। 'লম্বা জার্নির ফলে খিদে লেগে গেছে খুব। তেমনি পাচ্ছে ঘুম।'

'সোজা হক্সিতে চলে যান। হুইটারে হক্সিই যা একটু রাঁধতে পারে।'

'ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। পাঁচ মিনিট ধুলো উড়িয়ে পৌঁছে গেল

শহরে। এটা পথে পেরিয়ে আসা অন্য শহরগুলোর থেকেও ছোট। গ্যাস স্টেশন ছাড়া একটা জেনারেল স্টোর, একটা হোটেল, একটা হার্ডওয়্যার স্টোর, একটা ব্যাংক, একটা লিকার স্টোর এবং হক্সি'স রেস্টুরেন্ট। ব্যস।

গেম কক আর হক্সি'স-এর গঠন প্রকৃতি অবিকল এক। যেন একই ডিজাইনারের কাজ। সেই উলঙ্গ কাঠের ফ্লোর, বার, টেবিল-চেয়ার, বুদ, পিছনের কিচেন, খাড়া কফিন, ফোন বুদ, সব একরকম। ভেতরের মশলার ঝাঁঝও। কেবল একটা জিনিস নেই এখানে, ভেনডিং মেশিন, এবং পাবলিক বুদ একটা কম। গেম ককের মতই, ওরা ভেতরে ঢুকতে উপস্থিত অন্যদের আলাপ-হাসাহাসি বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওদের প্রত্যেকে। দলটা একটা বুদে ঢুকে পড়তেই আবার নিজেদের ফিরে পেল তারা।

এদের ওয়েট্রেসের সঙ্গে আগেরটার পার্থক্য কেবল বয়সের। চার-পাঁচ বছর বেশি হবে এর বয়স। একটু মোটাও। তবে বেশ হাসিখুশি। 'ইভনিন, ফোকস,' দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। 'ড্রিঙ্কিন, ইটিন, অর বোথ? আমি রোজ।'

'বোথ,' পাল্টা দাঁত দেখাল মাসুদ রানা। 'প্রথমে ভদকা দাও, বরফসহ। তারপর তোমাদের মেন্যুতে চোখ বোলাব, অবশ্য যদি থাকে।'

'অবশ্যই আছে! থাকবে না কেন?' চোখ পাকাল রোজ। 'যা-তা ভেবেছ নাকি আমাদের? রাখ, উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

প্রপিতামহের আমলে ছাপানো চারটা মেন্যু দিয়ে গেল ওদের রোজি। তেল-মশলা আর হাতের ময়লায় লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ভাল করে পড়া যায় না সব। কাগজগুলো দেখে মনে হয়

কোন মেমো প্যাড থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে বুঝি। যেমন ময়লা, তেমনি মলিন। মলাটে লেখাগু হক্সি'সগু হোয়্যার দি এলিট মীট টু ইট।

প্রথম আইটেম সুপ। তারপর ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার। মিট। স্যালাড। পটস অ্যাণ্ড ভেজিটেবলস। আইসক্রীম অর জেল্লো। কফি। আইটেমগুলোর বিশদ এন্ট্রিতে চোখ বোলাতে লাগল ওরা। মলাটের নিচে বড় করে একটা সতর্কবাণীগু ডোন্ট টেক দিস মেন্যু ফর আ স্যুভেনিয়ার।

'খুব খারাপ,' ওটা পড়ে মন্তব্য করল ফয়েজ। 'স্মৃতির অ্যালবামে রাখব বলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।'

ভদকা নিয়ে এল রোজ। প্যাড-পেন্সিল নিয়ে রানা ও নাদিরার দিকে তাকাল। 'ক্যাটফিশ বল্‌স্ কি জিনিস?' জিজ্ঞেস করল নাদিরা।

'গোল করে কাটা ক্যাটফিশের মাংস, ডীপ ফ্রাইড। খেতে দারুণ! সঙ্গে সুপ।'

'কিসের সুপ?' মুখ তুলল মাসুদ রানা।

'টম্যাটো। এ অঞ্চলের সেরা সুপ।'

'ব্রেডেড ভীল কাটলেট?'

'ডিল-লিশিয়াস!'

'ভীল খুঁজে পাওয়া যাবে তো ওতে?'

'ওয়েল, কিছু না কিছু পাবে।'

টম্যাটো সুপ, কাটলেট, ক্যাটফিশ বলস্, ভেজিটেবলস্, বীন অর্ডার দিল ওরা। গলা পর্যন্ত খেলো সবাই। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হওয়ার জোগাড় হয়েছিল, কাজেই রান্নার স্বাদ নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। তবে মন্দ নয় রান্না, ভালই লাগল খেতে। এরপর আইসক্রীম। এবং সবশেষে কফি। কফি রেখে বেরিয়ে

যাচ্ছিল রোজ, রানার প্রশ্ন শুনে থেমে দাঁড়াল।

'বারের ওপাশের লোকটি বুঝি হক্সি?'

'নাহ্। হক্সি ওর মত গাধা না, বুদ্ধি রাখে সে মাথায়। রাখে বলেই এটা বেচে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় সটকে পড়েছে। নামটা ইচ্ছে করেই বদলাইনি আমরা।'

'কি নাম ওর?'

'হাইম গোর।'

'তোমার একমাত্র প্রেমিক?' হাসল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, ও তাই ভাবে বটে,' রোজও হাসল।

'তোমার কথা শোনে গোর?'

ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। 'শুনবে না মানে? কিন্তু বিষয়টা কি, মিস্টার?'

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমাদের জন্যে।' ওয়ালেট থেকে গুণে গুণে আড়াইশো ডলার বের করল মাসুদ রানা। 'এটা রাখো, অ্যাডভান্স। কাজ শেষ হলে আরও আড়াইশো পাবে।'

প্রকাণ্ড এক ঢোক গিলল রোজ। চোখ কপালে তুলে চেয়ে থাকল নোটগুলোর দিকে। লোভ, সন্দেহ, ভয় ইত্যাদি ভাবের খেলা চেহারায়। 'কাজটা কি, মিস্টার?'

'কঠিন কিছু নয়। খুব সহজ কাজ। ধরো এটা।'

কাঁপা হাতে টাকাগুলো নিল রোজ। এদিক ওদিক, বিশেষ করে হাইম গোরের দিকে তাকাল একবার আড়চোখে। তারপর চট করে ব্লাউজের ভেতর পুরে ফেলল। 'বলুন, কি করতে হবে আমাকে।'

নিচু গলায় এক মিনিট কথা বলল মাসুদ রানা। ওর কথা শেষ হতে আবার ভুরু কোঁচকাল সে। 'ব্যস! আর কিছু না?'

'তুমি নিশ্চই স্বীকার করবে কাজের তুলনায় ফী-টা অনেক বেশি দিচ্ছি আমি?'

'স্বীকার না করলে কি প্রশ্নের উত্তর অন্যরকম হতে পারে আশঙ্কা করছেন আপনি?' হাসল রোজ। 'এ কাজে এত টাকা অবিশ্বাস্য। ভাববেন না, মিস্টার। খবরটা সময় থাকতে পাবেন। অবশ্য যদি ঘটে তেমন কিছু।'

'গুড। হ্যাঁ, তোমাদের রান্না ভালই লাগল।'

হাসিটা আরও বিস্তার লাভ করল মেয়েটির। 'মিথ্যে বলার আর্ট আপনি খুব ভালই জানেন।'

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, মন্থর গতিতে রওনা হলো মিসেস পার্ল হকের বাড়ির দিকে। 'মেয়েটিকে বিশ্বাস করো তুমি?' প্রশ্ন করল নাদিরা।

'না করে উপায় কি? আমাদের খোঁজাখুঁজি করা হলে গোরই প্রথম জানতে পারবে। গোর জানা মানেই রোজ জানা। তাছাড়া, আমার মনে হয়েছে, মেয়েটিকে বিশ্বাস করলে ঠকব না আমরা।'

পোর্চে রকারে বসে আছে মহিলা। চাঁদের আলোয় হাসছে যেন হুইটার। পরিষ্কার নীল আকাশ। নুড়ি বিছানো ড্রাইভওয়েতে গাড়ি রেখে নেমে এল ওরা। মাসুদ রানার হাতে বাদামী কাগজের একটা প্যাকেট। বেশ বড় প্যাকেটটা। বারোটা ঠাণ্ডা বীয়ারের ক্যান আছে ওতে।

'ইভনিং, ম্যাম।' সঙ্গীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল নাদিরা। 'কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, তাই না?'

মুচকে হাসল কুড়ালমুখো মিসেস হক। মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ। সে জন্যেই বাইরে এসে বসেছি। খুব ভাল লাগছে। তোমরা বসতে চাইলে বসতে পারো।'

ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে কয়েকটা পোর্চ চেয়ার, নিয়ে

এসে মহিলাকে ঘিরে গোল হয়ে বসল ওরা। 'আমরা স্মোক করলে আপনার অসুবিধে নেই তো, মিসেস হক?' বলল রানা।

'না। ধূমপানের অভ্যেস আছে আমারও। তবে কম।'

নাদিরা ছাড়া আর সবাই সিগারেট ধরাল। বৃদ্ধাকে সাহায্য করল রানা সিগারেট ধরাতে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরে ওটায় চুমুক দিতে লাগল মহিলা। ভঙ্গি দেখে মনে হয় খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। বোঝা গেল পরিবেশটা খুব উপভোগ করছে সে। খুশিই হয়েছে ওদের সঙ্গ পেয়ে। ঠিকই ধারণা করেছিল রানা, ভাবল নাদিরা, মানুষের সঙ্গ চাইছিল বৃদ্ধা, টাকাটা মুখ্য ছিল না।

'হক্সি থেকে কয়েক ক্যান বীয়ার এনেছি আমরা। আপনি আমাদের সঙ্গে পান করলে খুব খুশি হব।' প্যাকেটটা হাঁটুর ওপর রাখল মাসুদ রানা। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল মহিলার দিকে।

'নিশ্চই! ধন্যবাদ।'

কয়েক সেকেণ্ড পর। বাডওয়েইজারের ঠাণ্ডা ক্যানে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ধূমপান করতে লাগল ওরা। এটা ওটা নিয়ে আলাপ করছে। এক সময় দেখা গেল, নিজের জীবন কাহিনী শুরু করে দিয়েছে মিসেস হক, ওরা শুনছে মন দিয়ে। তার বলার ব্যগ্রতা দেখে মনে হয় যেন ওদের এসব শোনাবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে।

জানা গেল, আলবামার এভারগ্রীনের মেয়ে মিসেস পার্ল হক। আমেরিকার রাজ্যগুলো সে সময়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখনই হুইটারে এসে বসবাস শুরু করে তার স্বামী, অ্যারনের পরিবার। অ্যারন ছিল বাবা-মার বড় ছেলে। জর্জিয়ার এথেন্সে এক চার্চ কনভেনশনে পরিচয় হয় পার্ল-অ্যারনের। পরিচয় থেকে প্রণয়। বেশ কিছুকাল পত্র বিনিময় চলে তাদের।

তারপর একদিন জর্জিয়া ছেড়ে আলবামা রওনা হয় অ্যারন, পার্লের পরিবারের কাছে, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে।

এর এক বছর পর এভারগ্রীনে বিয়ে হয় তাদের, এবং স্বামীর সঙ্গে হুইটারে চলে আসে পার্ল। অ্যারনের মা বেঁচে ছিল তখন। মহিলার সঙ্গে বনিবনা হত না পার্লের, প্রায়ই এটা-ওটা নিয়ে খিটিমিটি লেগে থাকত। এই পর্যায়ে এসে বিরতি দিল বৃদ্ধা। অন্যমনস্কের মত চেয়ে থাকল সামনের দিকে। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'মহিলা মারা গেছেন। তাঁর ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না আমি। তাঁর ভাল-মন্দ, সবকিছু সঙ্গে নিয়ে গেছেন তিনি। মৃতদের সমালোচনা করলে তাঁদের আত্মা কষ্ট পায়।'

আরেকটা ক্যানের ট্যাব খুলে তার হাতে ধরিয়ে দিল মাসুদ রানা। হাসির ভঙ্গি করল মহিলা। 'থ্যাঙ্কস, সানি।' লম্বা এক চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে গিলল পানীয়টুকু। আবার শুরু হলো কাহিনী।

দুই ছেলে, চার মেয়ের জন্ম হয় অ্যারন-পার্লের সংসারে, আট বছরের মধ্যে। প্রথম ছেলে, জন্মের পর পরই মারা যায়। তার পরের মেয়ে, সে-ও মারা যায় শ্বাসকষ্টজনিত রোগে, তিন মাস বয়সে। পরে ছোট ছেলেটিও মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নৌ-বাহিনীর পাইলট ছিল সে। জাপানে বোমা ফেলার সময় বিধ্বস্ত হয় তার বিমান। অবশিষ্ট তিন মেয়ে স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘরকন্না করছে শিকাগো, অ্যারিজোনা আর টরোন্টোয়।

এগারো নাতি-নাতনীর নানী মিসেস পার্ল। আগে মাঝেমধ্যে মেয়েরা স্বামীদের নিয়ে বেড়াতে আসত, কিন্তু এখন আর আসে না। তবে চিঠি লেখে নিয়মিত। নাতি-নাতনীদের ছবি পাঠায়, বৃদ্ধার জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা কার্ড, গিফট পাঠায়।

'ওদের এবারের বড়দিনের উপহারও পেয়েছি। জমিয়ে রেখেছি সব। বড়দিনের দিন সকালে গির্জা থেকে ফিরে খুলব।'

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট। চুপ করে বসে আছে সবাই। চাঁদের আলোর মোহনীয় রূপ দেখছে।

'আপনার নিজের পরিবারের কেউ নেই?' নরম গলায় জানতে চাইল নাদিরা।

'না। কেউ নেই? সবাই চলে গেছে। আমি ছিলাম পরিবারের একমাত্র সন্তান। বাবা-মা মারা গেছে অনেক আগে। তারপর চাচা-চাচী, মামা-মামী, তাদের ছেলে-মেয়েরা, সবাই। দুই চাচাতো ভাই অবশ্য বেঁচে আছে এখনও, যতদূর জানি। কিন্তু কোথায় থাকে তারা, কি করে কিছুই জানি না। তারাও হয়তো জানে না আমার কথা। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।'

মাথা দোলাল নাদিরা। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। 'হ্যাঁ। হয় এরকম।'

'কি জানি!' চিন্তিত, অন্যমনস্ক মনে হলো বৃদ্ধাকে। 'কম তো দেখলাম না জীবনে। কিন্তু একটা পরিবার এত তাড়াতাড়ি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, আর কোথাও দেখিনি আমি। শুনিওনি। চোখের সামনে এখনও ভাসে, ওরা ছিল, অনেকেই ছিল। সংসার আলো করে ছিল। এখন কেউ নেই। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল সব।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিসেস হক। 'কেউ থাকে না। এটাই নিয়ম। মানুষ আসে কেবল চলে যাওয়ার জন্যে। অথচ আমি? আটাত্তর বছর বয়স আমার, পৃথিবীকে দেয়ার মত অবশিষ্ট কিছুই নেই। যা ছিল, অনেক আগেই দিয়ে অবসর নিয়েছি। তবু বেঁচে আছি আমি। অথচ দেখো, যাদের বয়স ছিল, ক্ষমতা ছিল পৃথিবীকে কিছু দেয়ার, তাদের কেউ নেই। কী আজব খেলা ঈশ্বরের! মাঝেমধ্যে তাঁকে বড্ডো খেয়ালী মনে হয় আমার। কেন

যে এমন উল্টোপাল্টা করেন, ভেবে পাই না। যার সময় হয়নি, তাকে ছিনিয়ে নেন। আর যার কাজ ফুরিয়ে গেছে অনেক আগেই, তাকে ফেলে রাখেন।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল সবাই। মনটা কেমন করে উঠল মাসুদ রানার। পৃথিবীর আরেক প্রান্তের অজানা-অচেনা এক গ্রাম্য বৃদ্ধার দুঃখে বুকের ভেতরটা টন টন করছে।

'আসলে,' অনেকক্ষণ পর বলে উঠল নাদিরা, মৃদু কণ্ঠে। 'সময় বদলে গেছে, মিসেস হক। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে মানুষের জীবনও ওলোটপালট হয়ে গেছে। আগে যা স্বাভাবিক ছিল, এখন তা স্বাভাবিক নেই।'

'বুঝি। কিন্তু মেনে নিতে পারি না। দেখ, এত বড় একটা বাড়িতে ভূতের মত একলা পড়ে থাকি আমি। গ্রামের এক মহিলা সপ্তায় একবার আসে, ঘরদোর ঝাড়মোছ করে দিয়ে যায়। ও ছাড়া মাঝেমধ্যে যদি এক-আধজন ট্যুরিস্ট এল তো ভাল, নয়তো একাই থাকতে হয় আমাকে মাসের পর মাস। কথা বলার একজন সঙ্গীও নেই। অথচ ইচ্ছে করলে আমার তিন মেয়েই সপরিবারে থাকতে পারে আমার সঙ্গে। নাতি-নাতনীদের নিয়ে সময় কাটাতে পারি আমি। প্রচুর জমি আছে আমার, চাষ-বাস করে রাজার হালে চলতে পারবে ওরা, অথচ আসবে না।

'শহরে কাজ করতে করতে নাকমুখ দিয়ে রক্ত ছোটাবে, ভেজাল খেয়ে আয়ু কমাবে। তবু গ্রামে আসবে না। তোমরা অল্প বয়সী, রক্ত গরম, তোমরা মেনে নিতে পারো এ সব, আমি পারি না। ওখানেই কষ্ট। তোমরা এসেছ বলে ভালই লাগছে আজ আমার। খুব ভাল লাগছে।' ক্যানটা শেষ করল বৃদ্ধা। আরেকটা সিগারেট ধরাল রানার বাড়ানো প্যাকেট থেকে। পরমুহূর্তে বুড়ির প্রশ্ন শুনে চেয়ার উল্টে পড়ার দশা হলো ওর।

'পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছ?' সরাসরি মাসুদ রানার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল মিসেস হক।

'জ্বি!' শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল ওর।

'কাদের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছ, পুলিস, না আর কারও?'

নড়ছে না কেউ একচুল। জমে গেছে সবাই যার যার আসনে। মাসুদ রানার ধারণা যে কতটা নির্ভুল, বুঝতে পেরে ভড়কে গেছে নাদিরা। গেল বুঝি ছুটে এত সুন্দর একটা আশ্রয়, ভাবছে সে। এখনই বোধহয় আবার গাট্টি-বোঁচকা গোল করতে হবে। কিন্তু নাদিরা জানে না, আরও কত চমক অপেক্ষা করছে সামনে। ওদিকে ভাষা হাতড়াচ্ছে মাসুদ রানা।

'গাড়ি থেকে নামানোর সময় একটা সুটকেসের গায়ে ফুটো দেখেছিলাম তখন। কিসের ফুটো ওটা, বুলেটের না?'

এবারও মুখ খুলল না কেউ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বৃদ্ধা উত্তরের আশায়। তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'ঠিক আছে, বলতে হবে না। আর আমি কিছু একটা সন্দেহ করেছি বলে দুশ্চিন্তাও করতে হবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো এখানে তোমরা, যতদিন খুশি। তোমাদের উপস্থিতি ভাল লাগছে আমার। তারচেয়েও বড় কথা, আমার মন বলছে তোমরা অন্যায় কিছু করোনি। যারা অপরাধী, তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারি আমি। তোমাদের কারও মধ্যে সেরকম কিছু নেই। সে জন্যেই তোমাদের থাকতে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার। থাকো তোমরা। আর হ্যাঁ, কাল থেকে আর টাউনে যেতে হবে না তোমাদের। আমার এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে। নতুন মানুষ দেখলে সন্দেহ করবে মানুষ, ফাঁস হয়ে যেতে পারে খবরটা।

'আর তুমি,' ফয়েজের দিকে তাকাল মিসেস হক। 'সত্যি

রিচার্ড বা মিথ্যে রিচার্ড, যা-ই হও, একদম অভিনয় করতে পারো না তুমি। অভিনেতা হিসেবে থার্ড ক্লাসও নও। খামোকা খোঁড়ার অভিনয় করতে হবে না আর। আমি জানি পায়ে কিছুই হয়নি তোমার।' হাসি ফুটল বৃদ্ধার কুড়াল মুখে। 'এই খুঁড়িয়ে হাঁটো, পরক্ষণেই দেখি সোজা হয়ে হাঁটো।'

মুখ ঘুরিয়ে প্রথমে নাদিরা, পরে মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে। 'চমৎকার বীয়ারের জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে, সানি। আমি চলি, ঘুম পাচ্ছে খুব। তোমরা বোসো যতক্ষণ মন চায়।' ওরা কেউ কিছু বলল না। বলার মত খুঁজে পেল না কিছু। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পার্লারে গিয়ে ঢুকল বৃদ্ধা।

টানা পাঁচ মিনিট পর নীরবতা ভঙ্গ করল নাদিরা। 'সাংঘাতিক মহিলা তো!'

মাসুদ রানা কোন মন্তব্য করল না, ঠোঁট টিপে হাসল কেবল।

'ফয়েজই আসলে ডুবিয়েছে,' বলল মুত্তাকিম বিল্লাহ। 'খোঁড়ানোর অভিনয় আমি করলে কিছুতেই ধরতে পারত না মহিলা।'

'ওরে আমার ইয়েরে!' তেড়ে উঠল ফয়েজ আহমেদ। 'বড় আমার হেনরি ফণ্ডা এসেছেন! সুটকেসের ছেঁদাটা দেখানোর সময়...'

'থামো তোমরা,' বলল মাসুদ রানা। 'তোমরা কেউ দায়ী নও এ জন্যে। ওসব পরের ঘটনা। আসলে আমরা এখানে আসামাত্রই মহিলা ব্যাপারটা আঁচ করেছে। বুঝে ফেলেছে ভেতরে কোন ব্যাপার আছে। আমি যে মিথ্যে বলছি, তখনই টের পেয়েছে সে, অথচ ভান করেছে যেন বোঝেনি।'

হাঁ হয়ে গেল বিল্লাহ। 'অ্যাঁ?'

'আপনি জানতেন?' জানতে চাইল ফয়েজ।

'জানতাম।'

'কি করে? মানে...'

'কঠিন কিছু নয় কাজটা। মাথা খাটালে তোমাদেরও বুঝতে অসুবিধে হবে না।' নাদিরাকে যা বলেছিল, কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল মাসুদ রানা। 'অতএব বুঝতেই পারছ, ভুল যা করার, করেছি আমি। আমিই দায়ী এ জন্যে।'

আবার চুপ হয়ে গেল ওরা। চিন্তিত।

'মহিলার কথা তো সবাই শুনলে তোমরা, কাজেই তাকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই,' ওদের আশ্বস্ত করল রানা। 'আমাদের ব্যাপারে মুখ খুলবে না মিসেস হক। কাজেই ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্তে ভাবতে পারি এখন আমরা। কাল সকালে বেরুব আমি।'

'কোথায় যাবে?' পরিষ্কার উদ্বেগ নাদিরার কণ্ঠে।

'জ্যাকসনভিল যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

'কেন?'

'প্রথম কাজ বুইকটা খালাস করে আরেকটা গাড়ি জোগাড় করা। হার্ডিভিলে গাড়িটা চোখে পড়ে গিয়েছিল রবার্টোর, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মুখস্থ করে রেখেছে কি না, কে জানে। তোমরাও অবশ্য যাচ্ছ আমার সঙ্গে, কিছুদূর পর্যন্ত।'

'মানে!' হতভম্ব দেখাল মেয়েটিকে। ফয়েজ আর বিল্লাহও তাকিয়ে আছে।

'চিন্তাটা হঠাৎ করেই মাথায় এল, মিসেস হকের নিশ্চয়তা পাওয়ার পর।'

'কি সেটা?'

'এতক্ষণে হুইটারের প্রায় সবাই জেনে গেছে আমাদের এখানে আসার কথা, মিসেস হকের বাড়িতে ওঠার কথা। ছোট্ট শহর, কয়জনই বা থাকে এখানে, কানে কানে ছড়িয়ে গেছে

কথাটা। তাই ঠিক করেছি, সবাইকে কাল সকালে আমরা দেখাব যে আমরা চলে যাচ্ছি হুইটার ছেড়ে। এখানে থাকছি না আমরা।'

'তাতে লাভ?'

'সোজা। কেউ যদি আমাদের খোঁজ জানতে আসে টাউনে, সবাই বলবে আমরা এসেছিলাম। এক রাত থেকে আবার চলে গিয়েছি।'

'অথচ?'

'অথচ আসলে আমরা যাইনি। এখানে ছিলাম, এবং আছি। ব্র্যানসউইক পর্যন্ত এক সঙ্গে থাকব আমরা। ওখান থেকে আরেকটা গাড়ি ম্যানেজ করে সন্ধের দিকে হুইটার রওনা হবে তোমরা, যাতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। তোমাদের ফিরে আসা কারও চোখে না পড়ে। আর আমি ওখান থেকে বুইক নিয়ে চলে যাব। জ্যাকসনভিলের কাজ সেরে ওটা ওখানকার কোন হোটেলের সামনে রেখে ফিরে আসব।'

'জ্যাকসনভিলে কি কাজ তোমার?'

'প্রথম কাজ একটা প্লেন চার্টার করা, মনট্রিয়ল অথবা অটোয়া পর্যন্ত। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে কয়েকটা পাথর বিক্রি করতে হবে। কারণ ওদের অ্যাডভান্স দিতে হবে। অথচ এদিকে টাকা তেমন নেই। প্লেন চার্টার করা গেলে অনেক সহজে এবং নিরাপদে তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়, একটা কিল্‌ন্ কিনে নিয়ে ফিরে আসব আমি।'

'কিল্‌ন্ কি জিনিস?' প্রশ্ন করল ফয়েজ।

'সোনা গলানোর ইলেক্ট্রিক চুল্লি।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। বিল্লাহ আর ফয়েজের দিকে তাকাল। 'পরশু রাত বারোটা ডেডলাইন। তার মধ্যে যদি ফিরে না আসি, বুঝবে গোলমাল হয়ে

গেছে। এক মিনিটও দেরি না করে সরে পড়বে তোমরা। যদি দেখো রবার্টোকে বাধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, এসওএস কল পাঠাবে শওকতকে। তারপর যা করার ও করবে।'

নড়াচড়া ভুলে বসে আছে ফয়েজ আর বিল্লাহ। এসওএস অর্থ চূড়ান্ত আঘাত হানার নির্দেশ, ওরা জানে। নিউ ইয়র্ক এজেন্সির বারোজন বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ এজেন্ট বেরিয়ে আসবে তাদের গোপন আস্তানা ছেড়ে। এজেন্সির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য। তারা ডন পাওলো গার্সিয়াকে যে ভাবে হোক, আটক করবে জিম্মি হিসেবে। প্রয়োজনে তার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারাত্মক ক্ষতি করে হলেও বাধ্য করবে তাকে রবার্টোকে ফিরিয়ে নিতে।

মাফিয়া আর যা-ই হোক, জাত ব্যবসায়ী। যেখানে বুঝবে লাভ নেই, সেখানে পা-ও এগোয় না ওরা। কাজেই ডন পাওলা যখন দেখবে প্রকাশ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ে গড়িয়েছে বা গড়াতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, একটা ব্যবসা বাঁচাতে গিয়ে রবার্টো তার আর দশটা ব্যবসাকে মারাত্মক হুমকির মুখে নিয়ে ফেলেছে, লোকসানের পাহাড় জমতে যাচ্ছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিউজ মিডিয়ার মাধ্যমে তার পুত্রধনের কীর্তি ফাঁস হয়ে মারাত্মক কেলেঙ্কারি ঘটাতে চলেছে, তখন নিঃসন্দেহে রবার্টোকে ফিরে আসতে বাধ্য করবে সে।

জানা কথা, এই বিপদে ডন পাওলোকে সাহায্য করতে অন্য ডনদের কেউ এগিয়ে আসবে না। কারণ তাদের সঙ্গে পাওলোর সম্পর্ক বর্তমানে খুব খারাপ। তারা বরং দূর থেকে মজা দেখবে, প্রতিদ্বন্দ্বী একজন কমে যাক, মনে মনে তাই চাইবে।

যেন বহু দূর থেকে কথা বলছে, এমনভাবে বলল ফয়েজ, 'মালপত্র, আর্মস সব কি করব? সঙ্গে নিয়ে যাব?'

'সুটকেসগুলো নিয়ে যাব শুধু। আর সব বাড়ির সামনের ওই খালের পাশে মাটির নিচে পুঁতে রেখে যাব ভাল একটা জায়গা

দেখে। রাত আরও গভীর হোক, তারপর।' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

ব্যাপারটা লক্ষ করল ফয়েজ। 'আর কিছু?'

নাদিরার দিকে ফিরল ও। 'আমি টেলিফোন করে তোমাকে চাইতে পারি। হয়তো বলব, সব কিছু নিয়ে অমুক জায়গায় চলে এসো, কোন অসুবিধে নেই। সেক্ষেত্রে যদি কেবল নাদিরা সম্বোধন করি, তাহলে বুঝবে সত্যিই সব ঠিক আছে। আর যদি নামের আগে মিস যোগ করি, বুঝবে ঘাড়ে পিস্তল ঠেসে ধরে টেলিফোন করানো হচ্ছে আমাকে দিয়ে। সেক্ষেত্রেও এসওএস কল পাঠাবে তোমরা।' শেষ বাক্যটা ফয়েজ আর বিল্লাহর উদ্দেশে বলল ও।

পাথর হয়ে বসে থাকল নাদিরা। এতক্ষণ ভুলেই ছিল যেন কী মারাত্মক বিপদে জড়িয়ে ফেলেছে সে এই সিংহ হৃদয় যুবককে। কত বড় এক হুমকির মুখে এনে ফেলেছে মাসুদ রানা এবং তার সঙ্গীদের। বুক কেঁপে উঠল নাদিরার, যদি কিছু ঘটে যায় মাসুদ রানার? আর ভাবতে পারল না সে, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে দৃষ্টি। বুকের ভেতর শুরু হয়ে গেছে অজানা আবেগের উন্মত্ত মাতামাতি।

'রানা, একটা কথা বলব?' কোন রকমে উচ্চারণ করল সে।

'অবশ্যই! বলো।'

'মালপত্র যা আছে, সব ফিরিয়ে দিই আমরা রবার্টোকে। তাহলে নিশ্চই আমাদের পিছু লাগা বন্ধ করবে ও। ফিরে যাবে।'

'যাবে না। তুমি বন্ধু সেজে ওকে বোকা বানিয়েছ, আমি ওর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। কাজেই আমাদের রক্ত দিয়ে গোসল না করা পর্যন্ত রবার্টো শান্ত হবে না। নো ওয়ে, নাদিরা। তুমি ওকে ছেড়ে দিলেও আমি ছাড়ব না। রবার্টো গার্সিয়ার ধ্বংস না

দেখা পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি।'

আট

গভীর রাত। পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল ওরা সবাই। মাসুদ রানা, বিল্লাহ ও ফয়েজ, সবার হাতে একটা পুঁটলি। নাদিরার হাত খালি। বেরিয়ে এল ওরা সাবধানে দরজা খুলে। ওটা আলতো করে ভিড়িয়ে দিয়ে গ্যারেজের দিকে চলল। গ্যারেজে একটা খন্তা দেখেছিল ফয়েজ গাড়ি রাখার সময়, ওটা দরকার।

কয়েক পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা, পথ আগলে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড এক হাউণ্ড। জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে ওদের। ছোট করে একটা হাঁক ছাড়ল ওটা। চট করে দু'পা পিছিয়ে এল নাদিরা। 'ভয় পেয়ো না,' বলল মাসুদ রানা। 'আমি সামলাচ্ছি ওকে।' এগোল ও ধীর পায়ে।

কান খাড়া হয়ে গেল হাউণ্ডের, জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে শব্দ করে, সন্দেহ ভরা চোখে দেখছে সে রানাকে, দ্বিধান্বিত। কয়েক ঘণ্টা আগে এই মানুষটার সঙ্গে মোটামুটি আলাপ পরিচয় হয়েছে তার। তখন তো বেশ ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল, ভাবছে হয়তো হাউণ্ড, এখন দেখি চোরের মত আচরণ করছে! কি ওগুলো ওদের হাতে? আবার হাঁক ছাড়তে গেল হাউণ্ড, কিন্তু সামলে নিল শেষ পর্যন্ত, অতি পরিচিত একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে। শিস বাজাচ্ছে লোকটা তাকে উদ্দেশ করে, নিঃশব্দ শিস। শব্দটা কেবল কুকুরেরাই শুনতে পায়। অভয়বাণী ও বন্ধুত্বের আহ্বান পাওয়া যাচ্ছে ওতে।

গলে গেল সারমেয়র আওলাদ। ঘন ঘন লেজ নাড়তে নাড়তে

উঠে এল। খুশিতে হাত চেটে দিল মাসুদ রানার। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রানা। এই ফাঁকে দ্রুত কাজ সারল ফয়েজ, নিয়ে এল জিনিসটা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খালপাড়ে পৌঁছে গেল ওরা। চাঁদ হেলে পড়েছে তখন, গাছপালার আড়ালে চলে গেছে। আবছা অন্ধকারে দ্রুত কাজে লেগে পড়ল ওরা।

জায়গা বাছাই করে প্রথমে কয়েক চাপড়া আস্ত মাটি তুলল বিল্লাহ ঘাস সমেত, তারপর তিন হাত গর্ত করে বোঁচকা তিনটে রাখল তার মধ্যে। গর্ত ভরাট করল ওরা চেপেচুপে, তার ওপর চাপড়াগুলো যত্নের সঙ্গে বসিয়ে দিল যার যার জায়গায়। পায়ের আলতো চাপে কিনারাগুলো মিলিয়ে দিল। খালের পানিতে খন্তাটা ধুয়ে নিল ফয়েজ, নইলে শুকিয়ে দাগ ফুটে উঠবে মাটির। কাজ সেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল ওরা।

'একটা কথা ভাবছি,' খানিক উসখুস করে বলল ফয়েজ।

'কি?' সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘ এক টানে ধোঁয়ায় ফুসফুস ভরে নিল রানা।

'আমরাও আপনার সঙ্গে গেলে কেমন হয়? এখানে তো কাজ নেই আমাদের। অনর্থক...'

'ওখানেও কোন কাজ নেই তোমাদের। যে কাজে আমি যাচ্ছি, তাতে এতজনের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা জানো, ওরা এখন চারজনের একটা দল খুঁজছে, তিনজন পুরুষ আর এক মেয়ের একটা গ্রুপ, ঠিক?'

'জ্বি।'

'কেন তাহলে শুধু শুধু এক্সপোজড হওয়ার ঝুঁকি নিতে যাব? এমনিতেও কিছু দূর পর্যন্ত সেই ঝুঁকি মাথায় করেই তো যেতে হবে আমাদের।'

আর কিছু বলল না কেউ। পরদিন সকালে মিসেস হকের সঙ্গে একান্তে কথা বলল মাসুদ রানা, তারপর নয়টার সময় রওনা হয়ে গেল ওরা। শহরে গ্যাস স্টেশন থেকে তেল নিল রানা। যদিও দরকার ছিল না, আগের দিন বিকেলেই বুইকের ট্যাঙ্ক ভরে নিয়েছিল ও। তবু নিল যেটুকু আঁটে, যাতে তেল ভরার ফাঁকে স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট ওদের জোর গলার আলোচনা শুনে বুঝতে পারে যে ওরা ম্যাকন চলে যাচ্ছে।

ওখান থেকে হক্সিতে এল। নাস্তা খেল পেট ঠেসে। রাজকীয় নাস্তা। অরেঞ্জ জুস, ভেড়ার মাংস, ডিম, প্যান কেক, গ্রিটস, কর্ন মাফিন, সুইট বাটার, জ্যাম এবং কফি। অর্ডার লিখতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল রোজের। 'পেটে দেখছি সবার রাক্ষস ঢুকেছে একটা করে।'

'তা বলতে পারো,' হেসে উঠল রানা। 'তাছাড়া হুইটারের শেষ খাওয়াটা স্মরণীয় করে রাখতে চাই আমরা।'

'মানে?' পেন্সিল কানে গুঁজে কপাল কোঁচকাল ওয়েট্রেস। রানার দিকে তাকাল। 'চলে যাচ্ছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। ম্যাকন যাচ্ছি, খুব জরুরী।'

মুখ কালো হয়ে গেল মেয়েটির। রানা বুঝল, এতগুলো টাকা ফেরত দিতে হবে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেছে। 'ভেবো না। টাকাটা ফেরত দিতে হবে না, রেখে দাও। ওটা তোমার।'

'কিন্তু, বিনা কাজে এতগুলো টাকা...'

'ভুলে যাও। খেতে দাও জলদি, পেট জ্বলছে।'

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে গিলল ওরা। তারপর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে চুমুক দিল কফির কাপে। দশটার সামান্য আগে হক্সি ত্যাগ করল ওরা, গড়াতে শুরু করল বুইক রিভেরা। বিল্লাহ ড্রাইভ করছে, মাসুদ রানা বসেছে তার পাশে, হাতে ম্যাপ। অনেকটা পথ ঘুরে

হুইটারের ব্যাকরোডে উঠল গাড়ি, তারপর পঙ্খিরাজের মত ছুটল ইন্টারস্টেট হাইওয়ের উদ্দেশে।

একটার দিকে ফারগো অতিক্রম করল ওরা। পেটে কারও খিদের আলামত নেই দেখে থামতে বারণ করল মাসুদ রানা। টানা চালিয়ে সন্ধের আগে ফ্লোরিডার লেক সিটি পৌঁছল ওরা। পথে কেউই তেমন কথাবার্তা বলেনি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া। নাদিরা সবচেয়ে বেশি চুপচাপ। গতরাতে রানার পরিকল্পনা শুনেই চুপ হয়ে গেছে মেয়েটি। রাতে ঘুম প্রায় হয়নি তার, জানে মাসুদ রানা। পাশের খাটে নাদিরার বারবার এপাশ ওপাশ করা টের পেয়েছে, কিন্তু এ নিয়ে কথা তোলেনি ও। ইচ্ছে হয়নি। ব্যস্ত ছিল ভবিষ্যৎ চিন্তায়। রানা জানে এ মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় আছে নাদিরা, কিন্তু সে শুধুই রানার আর নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত। আর মাসুদ রানার দুশ্চিন্তা আরও গভীর, আরও ব্যাপক। এক সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। তাই মন চাইলেও কথা আসছে না মুখে।

লেক সিটিতে যাত্রাবিরতি করল মাসুদ রানা। মুখে রুচি নেই, তবু খেলো ওরা সবাই। খুঁজেপেতে একটা ইউজড কার লটে হাজির হলো। ছয় বছরের পুরানো একটা ডজ পছন্দ করল বিল্লাহ, দেখে শুনে কিনে ফেলা হলো ওটা। পুরানো হলেও লক্কড় মার্কা নয়, এঞ্জিনটা বুইক রিভেরার এঞ্জিনের চাইতে ভাল। সুটকেসগুলো চাপানো হলো ডজে। ওদের সঙ্গে দু'মিনিট কথা বলল মাসুদ রানা। নাদিরার মনোভাব বুঝতে পেরে তার বাহুতে হাত বুলিয়ে দিল। 'ভেবো না। ঠিকই ফিরে আসব আমি।'

মনের জমাট বাষ্প আচমকা গলে পানি হয়ে গেল মেয়েটির, মোটা ধারায় গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল তার দু'গাল বেয়ে। মাসুদ রানা, মুত্তাকিম বিল্লাহ, ফয়েজ আহমেদ, ওদেরও মন

খারাপ, কিন্তু কারও চেহারায় তার প্রকাশ নেই। ওরা প্রফেশনাল, এসব মেয়েলী আবেগ ওদের প্রকাশ করতে নেই, মানায় না। কোন বিদায় সম্ভাষণ না, কিচ্ছু না, ঘুরে বুইকের দিকে হাঁটা ধরল মাসুদ রানা। ডজ ফিরে চলল হুইটার, বুইক ছুটল জ্যাকসনভিল।

পথে দু'বার গাড়ি থামাল মাসুদ রানা। এক ড্রাগ স্টোর থেকে হেয়ার ব্লিচ, ডাই ইত্যাদি কিনল। আরেক ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে কিনল মেরুন প্যাকস, সাদা মোজা, চামড়ার স্ট্র্যাপওয়ালা স্যাণ্ডেল, হাফ হাতা প্রিন্টেড স্পোর্টস শার্ট, মিররড সানগ্লাস ও একটা সস্তা ক্যামেরা।

বেশ রাত হয়ে গেল ওর পৌঁছতে। এক থ্রী স্টার হোটেলের পার্কিং লটে বুইকটা বিসর্জন দিয়ে ট্যাক্সি চেপে মাইল দু'য়েক দূরের আরেক হোটেলে উঠল মাসুদ রানা। চুল এবং ভুরুর রং পাল্টাতে গিয়ে ঝাড়া ছয় ঘণ্টা ব্যয় হলো ওর। ঘুমাবার সময় খুব কমই জুটল। সকালে ফোলা ফোলা চেহারা নিয়ে চেক আউট করল শুকনো খড় রঙের চুল, ভুরুওয়ালা, ট্যুরিস্টবেশী মাসুদ রানা। এক কাঁধে শোল্ডার ব্যাগ, আরেক কাঁধে ক্যামেরা। বাসে চেপে অরল্যাণ্ডো পৌঁছল ও দুপুরের পর।

পকেটের অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয়, তাই প্রচুর দর কষাকষি করে দশ বছর বয়সী একটা ওল্ডসমোবাইল কাটলাস কিনল রানা এখান থেকে। ওটা নিয়ে উঠে এল আবার সেই রুট নাইন্টি ফাইভে। একে একে কোকোয়া, পাম বে, ভেরো বীচ, পাম বীচের পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল মায়ামির দিকে। যতই শহরটা এগিয়ে আসছে, ততই ঘন হচ্ছে ট্রাফিক। প্রচণ্ড চাপ গাড়ি ঘোড়ার। সীজনাল ট্রাফিক। গতি কমতে কমতে শামুক গতিতে এসে ঠেকল। সামনে তাকালে মনে হয় স্থবির হয়ে গেছে ট্রাফিক, নড়ছে না।

শহরে ঢুকতেই লাগল দুই ঘণ্টা। অভিবাসী কিউবানদের সেকশনে চলে এল মাসুদ রানা। খুদে আরেক হাভানা যেন এলাকাটা। এদেশীরা তেমন একটা পাত্তা পায় না এখানে। এদের সঙ্গে আছে সাউথ আমেরিকান বিভিন্ন দেশের নাগরিক, এক জোট হয়ে হেন কুকাজ নেই যা করে না এরা। জুয়া, জালিয়াতি, বেশ্যাবৃত্তি, খুন-গুমখুন, ড্রাগ, সব খোলামেলাভাবে চলে এখানে। বিরাট এক সশস্ত্র গ্যাং পোষে এখানকার দু'নম্বরি কিউবান ব্যবসায়ীরা। এতই শক্তিশালী এ গ্যাং যে স্থানীয় মাফিয়াও তার কাছে পাত্তা পায় না।

একটা পার্কিং লেখা সাইনের নিচে কাটলাস দাঁড় করাল মাসুদ রানা। দরজা লক করে ফুটপাথে উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে মিনিট পাঁচেক হাঁটল রানা, এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে একটা গলিতে এসে ঢুকল। বাঁ দিকের চারটে বাড়ি ছেড়ে পঞ্চমটার দরজায় মৃদু টোকা দিল। ঘিঞ্জি এলাকা, অনেকটা ঢাকার বনগ্রাম রোডের মত। বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে লাগানো।

দেরি দেখে আবার নক করতে যাচ্ছিল মাসুদ রানা, এই সময় দরজার ওপাশে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। খুলে গেল দরজা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট তাগড়া এক কিউবান। সাদামাঠা চেহারা, গায়ের রং প্রায় কালো। জিজ্ঞাসু চোখে মাসুদ রানার দিকে চেয়ে থাকল সে। চেহারা দেখে মনে হয় যেন ওকে চেনার চেষ্টা করছে কিউবান।

ডান তর্জনী পিস্তলের মত তার বুকে ঠেকাল মাসুদ রানা, চাপ দিয়ে দু'পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল তাকে। 'ভেতরে ঢুকতে দাও, আরমান্দো।'

এইবার চিনল ওকে কিউবান। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। 'মা···মা···!'

'শাটাপ!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল ও। 'ভেতরে চলো।'

'আঁ-হ্যাঁ, আসুন আসুন!' দ্রুত পিছিয়ে গেল আরমান্দো। কেমন এক দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, আরেকবার আপাদমস্তক দেখল ওর। 'আসুন, ভেতরে চলুন।'

দশ বাই দশ একটা রুমে ঢোকাল রানাকে আরমান্দো। বসার ঘর। এক সেট আধ ময়লা কভারের সোফা, একটা সেন্টার টেবিল, দুটো কাঠের চেয়ার আর একটা রাইটিং টেবিল, এই হলো রুমটার আসবাব। দ্বিতীয় টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে নানান হাবিজাবি। ওর মধ্যে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসও আছে। আর আছে একটা টেলিফোন।

'বসুন।'

একটা চেয়ারে বসল মাসুদ রানা। ভাল করে তাকাল কিউবানের দিকে। লোকটার পুরো নাম আরমান্দো সোকারাস। পেশা দালালি। যে কোন জিনিস কেনাবেচায় সমান পারঙ্গম আরমান্দো। সবার হাঁড়ির খবর রাখে। অতীতে অনেকবার অর্থের বিনিময়ে কাজ আদায় করেছে রানা এর কাছ থেকে।

'আমাকে দেখে চমকে উঠলে মনে হলো? নাকি ভুল দেখেছি?' স্থির দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখছে মাসুদ রানা।

ধপ করে সোফায় বসল আরমান্দো সোকারাস। মাথা নাড়ল জোরে জোরে। 'ভুল দেখেননি, বস্,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল সে। 'ভুল দেখেননি। ঠিকই দেখেছেন।'

'চমকাবার কারণ?'

'মাই গড, বস্! আপনি···না জানার ভান করছেন?'

কড়া চোখে লোকটাকে শাসাল রানা। 'ফালতু এবং বাড়তি কথা, কাজের সময় এর কোনটাই আমি পছন্দ করি না, তুমি

জানো। যা বলতে চাও সরাসরি বলো, আরমান্দো।'

খানিক আমতা আমতা করল কিউবান, মনে হলো কথা গুছিয়ে উঠতে পারছে না। 'ও-ওরা এসেছিল, বস্!'

'বলে যাও।'

'রবার্টো গার্সিয়া। আজই এসেছিল। আপনার ব্যাপারটা বাজারে জানাজানি হয়ে গেছে, বস্। আমার মনে হয় এখনও যায়নি ওরা, মায়ামিতেই আছে।' একটু বিরতি দিল আরমান্দো, মোনাজাতের মত ঘন ঘন মুখ ডলল দু'হাতের তালু দিয়ে। 'হুমকি দিয়ে গেছে রবার্টো। বলে গেছে, যে মাসুদ রানাকে সাহায্য করার দুঃসাহস দেখাবে, সে যেন আগেই কথা বলে রাখে নিজের আণ্ডারটেকারের সঙ্গে। আজ সারাদিন আপনিই ছিলেন বাজারের আলোচনার বিষয়বস্তু, বস্। একমাত্র বিষয়বস্তু।' ঢোঁক গিলল কিউবান।

একটু চিন্তা করল মাসুদ রানা। 'তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

ঝট করে মুখ তুলল আরমান্দো। 'নিজের কথা ভেবে? রবার্টোকে? না, বস্। ওকে আমি ভয় পেতে যাব কেন? ওসব মাফিয়া-টাফিয়া কেয়ার করি না আমরা। আমি আপনার জন্যে ভয় পাচ্ছি। সবাইকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে গেছে রবার্টো, "মাসুদ রানা গোজ নোহোয়্যার"।'

'মাসুদ রানা গোজ এভরিহোয়্যার,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। মুখে কঠিন হাসি। 'তুমি সেটা ভাল করেই জানো।'

থমকে গেল কিউবান। অপলক চোখে দেখল ওকে। মুখে হাসি হাসি ভাব, কিন্তু সেটার বিস্তার ঘটাতে সাহস পাচ্ছে না। 'হ্যাঁ, বস্। জানি।'

'গুড। এবার আমার দুটো প্রশ্নের সোজা উত্তর দাও। স্রেফ হ্যাঁ, অথবা না। একজনের নামে নতুন কাগজপত্র তৈরি করতে

হবে। পাসপোর্ট, ভিসা, আইডি, সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি। সম্ভব?'

'নাদিরার নামে?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। দুই ভুরুর মাঝখানে সামান্য কুঞ্চন দেখা দিল ওর।

'সরি, বস্। অভ্যাসের দোষ। উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ।'

'এবং একটা প্লেন চার্টার করে দিতে হবে। সম্ভব?'

খানিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলল আরমান্দো। 'হ্যাঁ। আশা করি।' মাসুদ রানা বিরক্ত হতে পারে ভেবে দ্রুত যোগ করল তার সঙ্গে, 'এর কোনটাই আমি নিজে পরিচালনা করি না, বস্। ইউ নো। দুটোর ব্যাপারেই বিশ্বস্ত আউটফিটের সঙ্গে আগে আলোচনা করতে হবে আমাকে। তবে এটুকু নিশ্চিত থাকুন, আরমান্দো জানে তার দৌড় কতদূর। সেই ভরসাতেই "হ্যাঁ" বলে দিয়েছি আমি অলরেডি।'

'অল রাইট। খোঁজ নাও তাহলে। কথা বলো।'

'কাল সকালেই...'

'কাল নয়। আজই।'

'আজই?'

'আমার তাড়া আছে, আরমান্দো।'

একটু চিন্তা করল কিউবান। 'ওকে, বস্। আপনি যা বলেন। আলোচনার ফলাফল কোথায় জানাতে হবে? কোথায় পাব আপনাকে?'

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। 'ঠিক দু'ঘণ্টা পর তোমাকে টেলিফোন করব আমি।'

'ঠিক আছে,' আসন ছাড়ল আরমান্দো। 'এখনই তাহলে বেরুতে হয়।'

মাসুদ রানাও উঠল। আলতো করে একটা হাত রাখল কিউবানের কাঁধে। প্রায় চমকে উঠল লোকটা। 'কি!'

'আমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো তুমি, কেবল একটা বিষয় ছাড়া,' গম্ভীর, থমথমে গলায় বলল রানা। চাউনি শীতল।

রক্ত হিম হয়ে গেল আরমান্দোর। আতঙ্কে ঘাড়ের খাটো চুল দাঁড়িয়ে গেল তার। 'কি, বস্?'

'আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাঁচতে পারেনি কেউ কোনদিন। বিশ্বাসঘাতকদের নিজ হাতে যমের বাড়ি না পাঠানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেই না আমি।'

'এ-এসব কি বলছেন, বস্?' ঘাম ছুটে গেল কিউবানের। 'আমি আপনার সঙ্গে···!'

'আমি কেবল যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, তাদের পরিণতির কথা তোমাকে জানালাম। ফর ইওর ইনফর্মেশন। আর একটা কথা মনে রেখো, রবার্টোর সঙ্গে তোমার ব্যবসা হলে একবারই হবে, এবং সেটাই হবে তোমার শেষ ব্যবসা। আর আমার সঙ্গে হবে আজীবন। যদি লোভ সামলে বিশ্বস্ত থাকতে পারো তুমি। চলি। সময় হলে টেলিফোন করব। আর হ্যাঁ, কাজটা কার জন্যে করছ তা যেন কেউ না জানে।'

বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। মাথায় রবার্টোর চিন্তা। সত্যিই আছে সে এখানে? নাকি বাজারে হুমকি ছড়িয়ে দিয়ে ওদের খোঁজে ফিরে গেছে? কেমন ভ্যাপসা গরম লাগছে। আকাশের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। মেঘ করেছে খুব। বাতাস আছে, তবে আর্দ্র। ঝড় উঠবে নাকি? একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেয়ে নিল রানা। দুপুরের খাওয়া মিস গেছে আজ, মোটামুটি পুষিয়ে নিল সেটা। ওখান থেকে বেরিয়ে ছুটল জুয়েলারি মার্কেট।

এক ঘণ্টায় তিনটে দোকান ঘুরল রানা, পাথরের বোঝা অর্ধেকের মত কমিয়ে ফেলল পঁচাশি হাজারে। নগদ টাকার ভ্রাম্যমাণ গুদামে পরিণত হলো ওর শোল্ডার ব্যাগ। তবে ব্যাটারা বড্ডো হারামী। তিন ভাগের দু'ভাগ দামও দেয়নি। ব্যাপারটা টের পেয়েও বিশেষ ঝোলাঝুলি করেনি মাসুদ রানা। কারণ এই মুহূর্তে ক্যাশ প্রয়োজন, পকেট প্রায় খালি। আরমান্দো যদি কাজ দুটো করে দেয়ার উপযুক্ত আউটফিটের সন্ধান পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম দিতে হবে তাকে। কাজ দুটোর জন্যে কত হেঁকে বসে ব্যাটারা কে জানে!

যা-ই দাবি করুক, ভাবল মাসুদ রানা, ওর তাতে কিছু আসবে যাবে না। মাছের তেলে মাছ ভাজবে ও। টাকার এই ঘাটতি পরে অবশ্য আবার পূরণ করতে হবে রানাকে, কারণ ও স্থির করেই রেখেছে, এসব বিক্রির পুরো টাকাই বনোমোর নিহত হেলপারের পরিবারকে দেবে। ঠিক সময়মত আরমান্দো সোকারাসের নাম্বারে টেলিফোন করল রানা। ফোনের কাছেই বসা ছিল লোকটা, রিসিভার তুলল প্রথম রিং পুরো হওয়ার আগেই।

'ইয়েস!'

'আরমান্দো?' মাসুদ রানার কর্তৃত্বপূর্ণ ভরাট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে দিল কিউবানটিকে। একটা ঢোঁক গিলল সে নিঃশব্দে।

'জ্বি, বস্।'

'বলো।'

'সম্ভব, বস্।'

'দুটোই?'

'জ্বি, দুটোই। ও, একটা কথা, বস্।'

'আমি শুনছি।'

'পাসপোর্টে কোন দেশী ভিসা স্ট্যাম্প করতে হবে?'

'অস্ট্রেলিয়া।'

'এই যা! আমি তো ধরে নিয়েছিলাম···ইউ নো, বস্, এখান থেকে অল দ্যা রোড গোজ টু হাভানা!'

'এদিক-ওদিক, যেদিকেই হোক, কিছু আসে-যায়?'

'না, বস্। পয়সা কিছু বেশি লাগবে, এই যা।'

'কত?'

আবার ঢোঁক গিলল আরমান্দো। 'অনেক দাবি করছে ওরা, বস্।'

প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল মাসুদ রানা। 'কত?'

'হাফ আ মিল।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে। বুঝে ফেলেছে, এই টাকায় যদি রাজি হয় ও, অর্ধেকের বেশিই আরমান্দোর পকেটে যাবে। 'ওর অর্ধেক।'

'কি বললেন, বস্?'

'ওদের বলো, দু'লাখ পর্যন্ত দিতে রাজি আমি। তার বেশি এক পয়সাও নয়। আর কমিশন বাবদ তুমি পঞ্চাশ পাবে। ফিফটি থাউজেণ্ড। দ্যাট'স অল।'

'কিন্তু···'

'কথা বলো ওদের সঙ্গে। তুমি নিশ্চই ওদেরকে আমার কথা বলোনি?'

আঁতকে উঠল কিউবান। 'হোলি গড, নো!'

'তাহলে ওদের এত চার্জ করার কোন কারণ আমি দেখি না। স্বাভাবিক রেটের চাইতে বহুগুণ বেশি দাবি করছে ওরা।'

'সে আমিও খুব ভালই জানি, বস্। কিন্তু জেনেও কিছু করতে পারছি না। এ নিয়ে যত বেশি কথা বাড়াব, ততই কথা ছড়ানোর আশঙ্কা আছে। তাছাড়া, আমি নাম না বললেও ওরা হয়তো

অনুমানে আপনাকেই মক্কেল ধরে নিয়েছে, যে জন্যে এত দাবি করে বসেছে। অ্যাজ দা সে গোজ, আপনার কাছে আছে। তাই। আজই ও এলো, আর আমিও মাঠে নামলাম, সন্দেহ তো করতেই পারে, বস্!'

আবার খানিক চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। যুক্তি আছে আরমান্দোর কথায়। ব্যাপারটা ভেবে দেখার বিষয়। 'ঠিক আছে। ওদের জন্যে আড়াই, তোমার জন্যে পঞ্চাশ। দ্যাট'স ফাইনাল। আবার আলাপ করো। এখনই। এক ঘণ্টা পর আবার যোগাযোগ করব আমি।'

'জানি না আলোচনার ফল কি হবে, তবে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, বস্। যদি সফল হই, অগ্রিম প্রয়োজন হবে।'

'পাবে। রাখলাম।'

'বস্?'

'বলো।'

'সতর্ক থাকবেন। বি ভেরি কেয়ারফুল, বস্।'

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। রাখি।'

রিসিভার রেখে পাব থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। সাড়ে বারোটা বাজে। কমে এসেছে মানুষের ব্যস্ততা। কাটলাস ছোটাল রানা, মিশে গেল গাড়ির মিছিলে। আপাতত কোন কাজ নেই, অতএব কোথাও বসে সময়টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়?

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। গাড়ি ঘুরিয়ে কিউবান সেকশনে চলে এল মাসুদ রানা। আগের সেই সাইনটার নিচে পার্ক করল কাটলাসটা। লক করল বেরিয়ে এসে। তারপর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল আরমান্দো সোকারাসের আস্তানার দিকে। কাঁধে ঝুলছে

টাকার থলে। স্পোর্টস শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে শোল্ডার হোলস্টার।

আরমান্দোর বাড়ির উল্টোদিকের এক বাড়ির বন্ধ ফটকের সামনে অন্ধকারে দাঁড়াল মাসুদ রানা। অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এলাকা, মানুষজনের আনাগোনা তেমন চোখে পড়ছে না। হাত দিয়ে চেপে দরজাটা বন্ধ আছে কিনা দেখে নিল রানা। আছে। ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল আরমান্দোর বন্ধ দরজার দিকে। কোন আলো জ্বলছে না বাড়িটায়। অন্ধকার। অনড় দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ঘড়ির কাঁটা খুব ধীর গতিতে ঘুরছে। কয়েকবার পা বদল করল ও। চাপ পড়ছে নার্ভের ওপর।

পায়ের আওয়াজ পেল ও। গলা সামান্য বাড়িয়ে উঁকি দিল গলির মাথায়। দুটো ছায়ার ওপর চোখ পড়ল, এদিকেই আসছে। একটা ছায়া খাটো, অন্যটা লম্বা। ঢ্যাঙা। আরেকটু এগোতে খাটো ছায়াটাকে চিনল মাসুদ রানা, আরমান্দো। ওর সঙ্গে ওটা কে? আস্তানার দরজায় এসে থেমে দাঁড়াল কিউবান, দরজা খুলে ঢ্যাঙাকে ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল। ঢুকে পড়ল লোকটা। পা বাড়াল মাসুদ রানা। ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আরমান্দো, চমকে উঠল ওকে দেখে। 'জেসাস ক্রাইস্ট! আপনি?'

'ঢোকো ভেতরে।' দরজাটা রানা নিজেই বন্ধ করল। 'চলো, ভেতরে বসা যাক।'

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে কিউবান। 'নিশ্চই, আসুন। আপনি আসায় ভালই হলো, বস্।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। কাগজপত্র কার নামে, কোন ঠিকানায় হবে, টেলিফোনে

জেনে ওকে জানাব ভেবেছিলাম। সে জন্যেই নিয়ে এসেছি ওকে। ওসব তৈরিতে ওস্তাদ মানুষ।' ঢ্যাঙাকে দেখাল আরমান্দো চোখের ইশারায়।

'তার মানে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তোমার পার্টি?'

'করেছে। অনেক চাপাচাপির পর। জান খারাপ করে দিয়েছে ব্যাটারা আমার। মুখ দিয়ে ফেনা বের করে ছেড়েছে।'

'যাক, সফল হয়েছ শুনে খুশি হলাম।' ঘুরে ঢ্যাঙার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ছয় ফুট চারের কম হবে না মানুষটা। বয়স ষাটের মত সম্ভবত। চকচকে কাপড়ের কালো রঙের সুট, কালো জুতো, কালো মোজায় আণ্ডারটেকারের মত লাগছে লোকটাকে। গায়ে আধ ময়লা সাদা শার্ট। গলায় জুতোর ফিতের মত সরু কালো টাই। মুখটা লম্বা, কফিন আকারের। গালে, কপালে ছোট ছোট বীচি আর স্মল পক্সের শুকনো দাগ।

রানার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে লোকটা। অস্থির দৃষ্টিতে ঘরের মেঝেতে কি যেন খুঁজছে সে, অন্তত চোখ দেখে তাই মনে হয়। মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকছে না নজর, মুহূর্তে মুহূর্তে ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে করছে। অনেকের চোখের মণি কাঁপা রোগ আছে, রানা ভেবেছিল এর-ও আছে বুঝি সে রোগ। কিন্তু একটু পরই ভুলটা ভাঙল। আসলে ভয়ে কাঁপছে মানুষটা, আতঙ্কিত হয়ে আছে। নীল শিরা জেগে থাকা দু'হাতে বাদামী রঙের একটা বড় খাম ধরে বসে আছে সে, কাঁপছে সেটা। এতই জোরে যে অনবরত খসর খসর আওয়াজ উঠছে।

মাসুদ রানার সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিল না আরমান্দো সোকারাস। রানাও আগ্রহ দেখাল না।

'তাহলে?' কিউবানের দিকে তাকাল ও।

'অর্ধেক টাকা অগ্রিম চায় ওরা।'

'সম্ভব না। অত টাকা নেই এখন আমার কাছে।' ব্যাগ থেকে আগেই আলাদা করে রাখা পঁচাত্তর হাজার বের করল মাসুদ রানা। 'পঁচাত্তর আছে এখানে। রাখো এটা। বাকিটা পাসপোর্ট, চার্টারের ডকুমেন্টস ইত্যাদি নেয়ার সময় দেব।'

'কিন্তু, বস্…'

'তুমি জানো আমি ফালতু কথা বলি না, ফালতু ওয়াদা করি না। সময়মত পুরো টাকাই পাবে তুমি, আরমান্দো। নিশ্চিত থাকো।'

কিছু সময় চুপ করে বসে থাকল আরমান্দো। হাতে ধরা টাকাগুলো দেখছে। 'ওকে, বস্। হোয়াটএভার ইউ সে।'

খুব সম্ভব টাকা দেখেই মণি কাঁপা রোগ সেরে গেছে ঢ্যাঙার। হাতের কাঁপুনিও কমে গেছে। 'পেপার্স যার নামে হবে, তার ছবি লাগবে। আর নাম-ঠিকানা… আর কখন ওসব ডেলিভারি দিতে হবে…।'

'ছবি কয় কপি?' প্রশ্ন করল রানা।

হিসেব করল লোকটা। 'আঠারো কপি।'

'কাগজপত্র তৈরি করুন। যখন ডেলিভারি নেব, ছবি নিয়ে আসব সঙ্গে। তখন সাঁটিয়ে দেবেন শুধু। আর সব সেরে ফেলুন।'

'ঠিক আছে।' খামের ভেতর থেকে কাগজ-কলম বের করল আণ্ডারটেকার। 'কি নামে হবে কাগজপত্র?'

আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। গাড়ি নিয়ে তুফান বেগে ছুটল চল্লিশ মিনিট দূরত্বের পমপানো বীচের দিকে। ওখানকার এক মোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল ন'টায় ফিরে এল মায়ামি। ঘণ্টা দুয়েক চষে বেড়াল জুয়েলারি মার্কেট। প্রায় লাখ দেড়েক ডলার রোজগার করে রওনা হয়ে গেল রানা হুইটারের

দিকে।

নয়

চলতে চলতে ভাবছে মাসুদ রানা। আরমান্দো সোকারাসের একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। প্রশ্নটা ছিল, কাগজপত্র কোথায় বসে ডেলিভারি নিতে চায় ও। রানা বলে এসেছে, উপযুক্ত জায়গা ঠিক করে পরে তাকে ফোনে জানাবে। এবং কাগজপত্র নিয়ে একা আরমান্দো যাবে সেখানে। সঙ্গে আর কেউ যাবে না।

প্রথমটা মেনে নিলেও শেষ পয়েন্টে আপত্তি জানিয়েছে কিউবান। বলেছে, আর কেউ না হোক, অন্তত ঢ্যাঙাকে থাকতেই হবে তার সঙ্গে। পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ছবি সে-ই সেট করবে, প্রয়োজনে ছবির কিনারা ছাঁটতে হবে, ছবি বসিয়ে তাতে সীল মারতে হবে ইত্যাদি অনেক কাজ। ঢ্যাঙার (পরে জেনেছে রানা তার নাম ম্যানুয়েল গার্সিয়া) কাজ ওসব, আরমান্দোর নয়, অতএব তাকে থাকতেই হবে। আর যদি বস্ এখনই ছবিগুলো দিয়ে দেন, তাহলে আরমান্দো একাই যাবে সেখানে।

অকাট্য যুক্তি, এরপর আর কোন কথা চলে না। অতএব মেনে নিয়েছে মাসুদ রানা। যেখানে ওকে কাগজপত্র হস্তান্তর করবে, সেখানে থাকবে ম্যানুয়েল গার্সিয়া। তা-ও সই, তবু আগেভাগে নাদিরার ছবি হাতছাড়া করতে রাজি নয় রানা। তাতে বিপদে পড়ার মারাত্মক ঝুঁকি আছে। একদিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে।

গরম ক্রমেই বাড়ছে। রাতে বৃষ্টি হবে মনে হয়েছিল আকাশের অবস্থা দেখে, কিন্তু হয়নি। সারা আকাশ জুড়ে ব্যস্ত-

সমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে ঘন কালো মেঘ, যেন মহাজরুরী কোন কাজ পড়ে আছে কোথাও, এখনই সেখানে না পৌঁছলেই নয়। মাঝেমধ্যে দূর থেকে মেঘ ডাকার গুড় গুড় আওয়াজ আসছে। যে-কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে ঝড়-বৃষ্টি। লক্ষণ সেরকমই। জানালার কাঁচ তুলে দিল মাসুদ রানা। শীত শীত লাগছে।

আরমান্দোর কথা ভাবতে বসল ও। লোকটা কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? রবার্টোকে জানিয়ে দিতে পারে? পারে। লোভ যখন গ্রাস করে মানুষকে, স্বাভাবিক যুক্তি-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে সে। তখন এমন অনেক কিছু করে বসতে পারে মানুষ, সুস্থ স্বাভাবিক মাথায় যা ভাবাও যায় না। বেশি টাকার লোভে পড়ে রাবার্টোকে আরমান্দো সব কথা জানিয়ে দিতেও পারে।

তবে বেশ কয়েক বছর থেকে লোকটাকে চেনে মাসুদ রানা। অতীতে অনেকবার ওর কাজ করে দিয়েছে আরমান্দো, অনেক কাজ, কখনও তেড়িবেড়ি কিছু করেনি। এমন কোন রেকর্ডও নেই তার যে অমুকের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। ওটাই যা ভরসা।

তাছাড়া··· থেমে পড়েছে মাসুদ রানা। শুধু শুধু মাথা গরম করে লাভ আছে কিছু? ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ-ই। বর্তমান নয়। এক মিনিট পরের ভবিষ্যৎও ভবিষ্যৎ, আবার এক যুগ পরের ভবিষ্যৎও ভবিষ্যৎ। দুটোই অজানা। কে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে আগামী এক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হবে না মাসুদ রানার? এই যে উল্টোদিক থেকে ঝড়ের বেগে একের পর এক বাস-লরি, কার-ট্যাক্সি আসছে, এর যে কোন একটা ছুটে এসে যদি আছড়ে পড়ে ওর গাড়ির ওপর?

কি হবে ফলাফল? মুহূর্তে মৃত্যু। তেমন কিছু এড়াতে হলে

সতর্ক থাকা চাই, চোখ-কান খোলা রেখে চলা চাই। ব্যস্। মানুষের দৌড় ওই পর্যন্তই। সতর্ক থাকার পরও যদি বিপদ এড়ানো না যায়, করার আছেটা কি? উল্টোপাল্টা ভাবনার জন্যে নিজেকে কষে কয়েকটা চড় লাগাল রানা কল্পনায়, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে গাড়ি চালনায় মন দিল। সময়মত সতর্ক থাকবে ও, চোখ-কান খোলা রাখবে।

বৃষ্টি নামল। বাতাসের তাড়নায় খানিক ডানে কাত হয়ে, খানিক বাঁয়ে কাত হয়ে ঝরল। আস্তে আস্তে কমে এল বাতাস, কিন্তু বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল। চেপে আসছে ক্রমেই। গাড়ির ছাদে বড় ফোঁটার বৃষ্টি ড্রাম বিটের মত শব্দ তুলছে। সামনের কাঁচ বেয়ে স্রোতের মত গড়িয়ে নামছে পানি। বন্যা দেখতে দেখতেই বুদ্ধিটা এল মাথায়। আরমান্দোর কাছ থেকে কাগজপত্র নেয়ার মত উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেছে মাসুদ রানা। কাটলাসের গতি আরও বাড়াল ও, জায়গাটা একবার দেখে যাবে হুইটার যাওয়ার আগে। পথেই পড়বে।

জ্যাকসনভিল শহরের মাইল তিনেক আগে ডানে বাঁক নিল মাসুদ রানা। মিনিট দশেক সোজা এগিয়ে কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে বাঁক নিল, পড়ল এসে মোটামুটি দুটো গাড়ি চলে এমন এক রাস্তায়। দু'দিকটা ফাঁকা, কোন বাড়ি-ঘর বা আর কিছু নেই। রাস্তাটাও বেশ পুরানো, কার্পেটিং নষ্ট হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। দেখলেই বোঝা যায় বহুদিন যত্ন নেয়া হয় না। বেশ কয়েক বছর আগে এসেছিল রানা এদিকে, বিশেষ এক কাজে।

সে সময়ে উপকূলে একটা ভাঙাচোরা, পরিত্যক্ত হোটেল দেখেছিল, এখনও আছে কি না ওটা, দেখে যেতে চায়। থাকলে এখানেই আরমান্দোর সঙ্গে অ্যাপয়েনমেন্ট করবে মাসুদ রানা। বিরান রাস্তাটা ধরে পাঁচ মিনিট একটানা চালিয়ে গতি কমাল ও,

এসে পড়েছে। আটলান্টিকের গর্জন শোনা যাচ্ছে সামনে। গতি আরও কমাল মাসুদ রানা, ডানের খোলা একটা গেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিল কাটলাসের নাক, তারপর একশো গজ এগিয়ে ব্রেক কষল।

বিরান এক কাঁটাতারের বেড়া দেয়া প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ডান দিকে তিনটে বিল্ডিঙের কঙ্কাল, দু'দিকের দুটো সামান্য ছোট, মাঝখানেরটা বিশাল। বাঁ দিকে জংলা গাছ-পালা, ঝোপঝাড়ের আড়ালে আটলান্টিক মহাসাগর। সাদা ফেনার মুকুট পরা বিশাল একেকটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে এসে তটে। গোল্ডেন বীচ জায়গাটার নাম। স্থানের নামে নাম রাখা হয়েছিল হোটেলটার, গোল্ডেন ভিউ।

চার একর জায়গা নিয়ে ১৯২০ সালে তৈরি হয় এটা। আমেরিকার নাম করা প্রথম শ্রেণীর হোটেলগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। সে সব আজ ইতিহাস। মাঝখানের কাঠামোটা ছিল মূল হোটেল। ওটার সামনের ছাদ ধসে পড়া বিশাল পিলারড পোর্টিকো দেখলে মনে হয় চীনা রূপকথার দৈত্যাকার কোন ড্রাগন। বাঁ দিকের ছোট কাঠামোটায় আগুন লেগেছিল অতীতে কোন এক সময়, পোড়া কাঠ, পোড়া দেয়াল এখনও তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গোল্ডেন ভিউর সামনে সবুজ লন ছিল এক সময়, ছিল মনোরম বাগান, ফুলের ঝাড়-বেড, সারি সারি পাম গাছ–এখন কিছু নেই। কাদা মাটি, আর এখানে ওখানে গর্তে জমে থাকা পানি ছাড়া। মেইন বিল্ডিঙের ছাদের একাংশ খসে পড়েছে। জানালার ফ্রেম নেই একটাও। দরজার অবস্থাও প্রায় এক। এক-আধটা পাল্লা আছে, জং ধরা কবজার সঙ্গে ঝুলছে, সশব্দে এদিক-ওদিক দুলছে বাতাসে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মাসুদ রানা। শোল্ডার ব্যাগ দিয়ে মাথা আড়াল করে এগোল মূল ভবনটার দিকে। ১৯৩৮ সালে প্রচণ্ড এক হ্যারিকেনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় গোল্ডেন ভিউ। ফুলে ফেঁপে তার দোতলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল আটলান্টিক। দেয়ালে এখনও আছে লবণ পানির সেই দাগ। পোর্টিকোর চওড়া সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠে এল মাসুদ রানা।

দেয়ালের গায়ে রং চটা একটা নোটিস দেখা গেল। নোটিসটার বক্তব্য উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হলো মাসুদ রানাকে। ওতে বলা হয়েছেগু বেআইনী অনুপ্রবেশকারীকে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে। কিন্তু ওটা চোরদের নিরুৎসাহিত করতে পেরেছে বলে মনে হলো না ওর, কারণ গোল্ডেন ভিউর কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা, কিছুই প্রায় রাখেনি তারা। সব ফরসা করে আলো বাতাসের মুক্ত চলাচলের পথ করে দিয়েছে।

প্রকাণ্ড ফলেই-এর মেঝেতে স্থানীয় ছেলে-ছোকরাদের পিকনিক, পট পার্টি ইত্যাদির প্রচুর আলামত চোখে পড়ল মাসুদ রানার। কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে আছে থক্‌থকে কাদার মত পচা আবর্জনা। আর আছে ছেঁড়া-ফাটা, পানিতে বরবাদ হওয়া অজস্র ম্যাট্রেস, খালি বীয়ারের কৌটো আর পাখির মল। মাথার ওপর পাখির আনাগোনা টের পেল মাসুদ রানা। উঁচু সিলিঙের ফাঁক-ফোকরে যেখানেই সুবিধে পেয়েছে, সেখানেই আবাস গেড়েছে ওরা। চারদিকের বাতাসে নোংরামি আর মৃত্যুর গন্ধ ভাসছে মনে হলো রানার।

সন্ধে হয়ে আসছে। বেরিয়ে এল রানা। যতটা সম্ভব কাদা-পানি এড়িয়ে উল্টোদিকের ঝোপঝাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল প্রশস্ত লন অতিক্রম করে। দুই আড়াইশো গজ দূরে দেখা যাচ্ছে

গোল্ডেন বীচ। বহু আগেই পরিত্যক্ত। উলঙ্গ একটা জেটি দাঁড়িয়ে আছে তীর থেকে খানিকটা দূরে। ওটায় পৌঁছার কাঠের প্যাসেজের তক্তাগুলো গায়েব। এখানে-ওখানে জেটির লোহার দেহ খসে গেছে। ঢেউয়ের তোড়ে ভীষণভাবে দুলছে ওটা। গোল্ডেন ভিউর সঙ্গে গোল্ডেন বীচও ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসে। আটলান্টিকের নোংরা আবর্জনা বোঝাই পানি ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে এসে ততোধিক নোংরা সোনালী সৈকতে।

আর দেরি করা যায় না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে উঠল মাসুদ রানা। শোল্ডার ব্যাগ থেকে ব্যবহৃত শার্ট-প্যান্ট বের করে পাল্টে ফেলল ভেজা পোশাক। তারপর নাক ঘুরিয়ে ছুটল গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে বাঁয়ে টার্ন নিল, অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে গতি বাড়াল, ছুটে চলল ফিরতি পথে। এটা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই গোল্ডেন ভিউ যাওয়ার বা আসার। হেড লাইট জ্বেলে দিল মাসুদ রানা, আঁধার হয়ে গেছে। জ্যাকসনভিলে ডিনার খেলো ও, সেই সঙ্গে দুপুরের হরিমটরের ক্ষতিটাও পুষিয়ে নিল। আজও মিস করেছে রানা দুপুরের খাওয়া, অবশ্য ইচ্ছে করেই। সময় বাঁচানোর জন্যে থামেনি কোথাও।

শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা পাব থেকে মিসেস পার্ল হকের নাম্বারে টেলিফোন করল মাসুদ রানা। ওর দেয়া ডেড লাইন কাছিয়ে আসছে, তার আগে হুইটারে পৌঁছাতে পারবে না রানা কিছুতেই। কাজেই ফোন করে ওদের জানিয়ে দেয়া দরকার যে এদিকে সব ঠিক আছে, ও ফিরে আসছে। তা না হলে মেয়েটিকে নিয়ে হুইটার ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে বিল্লাহ, ফয়েজ।

'তুমি কেমন আছ, সানি?'

বৃদ্ধার উল্লসিত কণ্ঠ শুনে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। হাসল নিঃশব্দে। 'ভাল।'

'থাকতেই হবে। আজ সারা সকাল তোমার জন্যে গির্জায় বসে প্রার্থনা করেছি যে আমি।'

মুহূর্তে মনটা ভিজে উঠল ওর। 'ধন্যবাদ, ম্যাম।'

'সন্তানের জন্যে মা প্রার্থনা করবে, এতে ধন্যবাদ দেয়ার কি আছে? তুমি ধরো, আমি ওদের কাউকে ডেকে দিচ্ছি।'

ফয়েজ আহমেদের সঙ্গে এক মিনিট কথা বলল মাসুদ রানা, তারপর লাইন কেটে দিয়ে আরমান্দোর নাম্বার ঘোরাল। 'কাগজপত্র তৈরি হতে ম্যানুয়েল গার্সিয়ার কতদিন লাগবে?' ও প্রান্তে পরিচিত কণ্ঠের সাড়া পেয়ে প্রশ্ন করল ও।

'তিন দিন সময় চেয়েছে ও, বস্।'

'মানে আজ, কাল আর পরশু?'

'হ্যাঁ।'

'তার পরদিন হাতে পাচ্ছি আমি ওগুলো?'

'নিশ্চই! কোথায় পৌঁছাতে হবে ওসব, বস্?'

'পরশু সন্ধের পর জানাব তোমাকে কোথায় ওগুলো ডেলিভারি নেব আমি। অল রাইট?'

'অল রাইট।'

লাইন কেটে দিয়ে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। আড়াইটার দিকে হুইটার পৌঁছল ও। ওরা প্রত্যেকে, এমনকি মিসেস হক পর্যন্ত জেগে বসে ছিল রানার অপেক্ষায়। দু'চোখ মেলে রাখতে রীতিমত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তখন ওকে। নিচে কিছু সময় কাটিয়ে ওপরতলায় চলে এল রানা। নাদিরা এল পিছন পিছন। দরজা বন্ধ করল সে। তারপর রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি। কাঁদছে ফুলে ফুলে। বাইরে প্রকৃতিও কাঁদছে অঝোর ধারায়।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ের মাতামাতি। বাতাস, বৃষ্টির এলোমেলো ছোটাছুটি আর ক্রুদ্ধ গর্জনে কান পাতা দায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘন ঘন বজ্রপাত। থেকে থেকে উজ্জ্বল নীলচে আলোয় ঝলসে উঠছে হুইটার, দুনিয়া কাঁপানো কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ছে। পুরো রাত পার হয়ে গেছে, এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না অবস্থা পরিবর্তনের।

কাল বড়দিন। নিচতলার সিটিংরূমে ক্রিসমাস ট্রী সাজিয়েছে মিসেস পার্ল হক। এখানকার একমাত্র জেনারেল স্টোরের মালিক হকিন্স গাছটা পৌঁছে দিয়ে গেছে গতরাতে। প্রতি বছরই এই উপকারটুকু করে থাকে সে বৃদ্ধার। ওটা অলংকরণের কাজে বেশ ব্যস্ত এখন মহিলা। কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তার মুখ। এমন আনন্দের দিনে ওরা থাকতে পারছে না জেনে মন খারাপ হয়ে গেছে, সেটাই বারে বারে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করছে মহিলা।

একই রূমের আরেক প্রান্তে বসে আছে মাসুদ রানা, মুত্তাকিম বিল্লাহ, ফয়েজ আহমেদ ও নাদিরা। জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। মায়ামিতে আরমান্দোর সঙ্গে যোগাযোগ, তার ফলাফল এবং পরবর্তী প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে রানা ওদের। সেই নিয়েই চলছে আলোচনা। সামনে একটা কাগজে ম্যাপ আঁকায় ব্যস্ত এখন রানা, হোটেল গোল্ডেন ভিউর এবং তার আশপাশের এলাকার ম্যাপ। কাজটা শেষ হতে ম্যাপটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও, কোথাও কোন ভুল আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। না, নেই।

সন্তুষ্ট মনে ওটার দুই জায়গায় দুটো খুদে বৃত্ত আঁকল রানা। একটা গোল্ডেন ভিউ যাওয়ার সরু পথের পাশের, হাঁটাপথে আনুমানিক এক মিনিটের দূরত্বে, একটা বড় ঝোপের পিছনে, অন্যটা হোটেলের ফয়েই-এর ঠিক পাশের রূমের দেয়াল ঘেঁষে।

'এখানে তুমি থাকবে, আগে থেকে,' পরের বৃত্তটায় ঠুক ঠুক করে পেন্সিল ঠুকল মাসুদ রানা। তাকিয়ে আছে ফয়েজ আহমেদের দিকে। 'হোটেলের সামনে তোমাকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে বিল্লাহ। গাড়িটা আগেভাগেই আরমান্দো এবং জালিয়াত গার্সিয়ার চোখে পড়া চলবে না।'

'ঠিক আছে,' মাথা দোলাল গরিলা। 'তারপর?'

'তারপর শহরের মাথায় গিয়ে শেষবারের মত আরমান্দোকে ফোন করব আমি, জানাব কোথায় যেতে হবে তাকে কাগজপত্র নিয়ে।'

মাথা দোলাল সে। 'জানালেন।'

'ফোন করে বসে থাকব আমি নাদিরাকে নিয়ে। আমাদের থেকে খানিকটা এগিয়ে থেকে বিল্লাহও অপেক্ষা করবে গাড়ি নিয়ে, যতক্ষণ না ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় আরমান্দো। এরপর, ওরা এগিয়ে যাওয়ার পর নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনুসরণ করবে ওদের বিল্লাহ। ওরা হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়বে, আর বিল্লাহ ওর গাড়ি এই ঝোপের কাছে পথের ওপর আড়াআড়ি করে রাখবে। যথেষ্ট লম্বা ডজটা, পুরো রাস্তা ব্লক হয়ে যাবে তাতে।

'কেউ যদি আমাদের অনুসরণ করে, ওখানে এসে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আটকে যাবে। আড়ালে বসে তাদের আগমন সংবাদ আগেভাগে আমাদের জানিয়ে দিতে পারবে তুমি,' দানবের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'সে ক্ষেত্রে ছুটে চলে আসবে তুমি আমাদের সংকেতটা জানিয়েই। লক্ষ রাখতে হবে কয়টা গাড়ি বা কতজন মানুষ আছে দলে। সংখ্যায় ওরা অল্প হলে লড়ব আমরা। যদি তা না হয়, ছুটে সৈকতে গিয়ে বোটে উঠব।' বোটের আইডিয়া আজই সকালে ঢুকেছে মাসুদ রানার মাথায়।

কি চিন্তা করে প্রশ্ন করল বিল্লাহ, 'আপনি কি আশঙ্কা করছেন

তেমন কিছু ঘটবে, বেঈমানী করবে কিউবানটা?'

'না। আশঙ্কা করছি না। কিন্তু ঘটতে পারে। তাই আগে থেকে সতর্ক থাকা ভাল। বলা যায় না কিছুই।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি রোড ব্লক করে দিলে আপনারা ঢুকছেন কিভাবে?'

'তুমি রওনা হয়ে যাওয়ার পর আমিও গাড়ি ছাড়ব। জোরে চালিয়ে তোমাকে, আরমান্দোকে ওভারটেক করব আমি গোল্ডেন ভিউর প্রাইভেট রাস্তায় প্রবেশ করার আগেই। আমরা জায়গাটা পার হওয়ার পর ব্লক বসছে তোমার, আগে নয়।'

'বুঝেছি। কিন্তু বোটের কি ব্যবস্থা?'

'জ্যাকসনভিলের যে কোন একটা বোট হাউস থেকে ভাড়া নিয়ে নেব।'

'কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত আরমান্দো না আসে?' প্রশ্ন করল নাদিরা।

'আসবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।' নিচের ঠোঁট কামড়ে ভাবল ও। 'জ্যাকসনভিলে প্রথম কাজ হবে আমাদের আরও কিছু পাথর বিক্রি করা। এখনও সোয়া দুই বাকি রয়ে গেছে। আমার কাছে দেড়ের কিছু বেশি আছে, বাকিটা জোগাড় করতে হবে কালকের মধ্যে। তবে, সমস্যা একটা হতে পারে, যদি বড়দিন উপলক্ষে জুয়েলারি মার্কেট বন্ধ থাকে।'

'যদি থাকে?' বলল নাদিরা।

'কি আর করা! এখানে থেকে মিসেস হকের টার্কি রোস্ট আর কেক খাব। ফোন করে আরমান্দোকে দু'দিন অপেক্ষা করতে বলব।'

'কিন্তু, রানা, পাসপোর্ট-ভিসা হাতে পেলেও তো বিপদ কাটছে না আমাদের, তাই না? প্লেনে চড়তে হলে মায়ামি থেকেই

চড়তে হবে। শেষ মুহূর্তে যদি ঝামেলা বেধে যায় ওখানে?'

রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল মাসুদ রানার ঠোঁটে। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না ও।

দুপুরে খেয়েদেয়ে এক ঘুমে সন্ধে করে দিল মাসুদ রানা। ঝড়ের বেগ অনেক কমে এসেছে এখন। বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু দমকা বাতাস। আর থেকে থেকে দূরাগত মেঘের গর্জন। সিটিংরুমে কিছু সময় গল্প-গুজব করে কাটাল সবাই, মিসেস হককে রান্না-বান্নার কাজে সাহায্য করল কিছুক্ষণ। যদিও বেশি সময় ওখানে টিকতে দিল না ওদের মুত্তাকিম বিল্লাহ। টার্কির রোস্ট তৈরির মশলার মধ্যে মনের সুখে গুঁড়ো গোল মরিচ মেশাতে গিয়ে কুকাজটা ঘটিয়ে বসল সে। মশলার লবণ ঠিক হয়েছে কি না চেখে দেখতে গিয়ে প্রথমে চোখ কপালে উঠল বৃদ্ধার। তারপর হাঁ হয়ে গেল মুখ।

প্রচণ্ড ঝালে দিশেহারা হয়ে মিনিট দু'য়েক কিচেনে প্রায় ছোটাছুটি করে বেড়াল মহিলা ওইভাবে। ঘামে ভিজে একাকার অবস্থা। রেগেমেগে বিল্লাহকে ঘাড় ধরে কিচেন থেকে বের করে দিতে গেল ফয়েজ, কিন্তু দেখা গেল ওর ঘাড় ঠিকমত হাতে পায় না সে। পায় ঠিকই, তবে বেশি খাটো হওয়ার দরুন ওই অবস্থায় তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারে না সে দানবের সঙ্গে, হাঁটতে গেলেই তার সঙ্গে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। শেষে বিরক্ত হয়ে মোষের মত গুঁতো মারতে মারতে বের করে নিয়ে গেল ফয়েজ বিল্লাহকে।

হাতে করে এটা-ওটা মুখে তুলে দিয়ে বৃদ্ধাকে শান্ত করল রানা বহু কষ্টে। কিন্তু তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে উল্টে ওকেই বের করে দিল মহিলা কিচেন থেকে। কেবল নাদিরা বেঁচে গেল মেয়ে বলে। বেশ রাত পর্যন্ত চলল তাদের রাঁধাবাড়া, আর বাইরে ছেলেদের আড্ডা। বড়দিনের সব রান্না সেরে রাখল বৃদ্ধা,

সকালে তাকে গির্জায় যেতে হবে। পরদিন রাত পোহাবার অনেক আগে, আরও কয়েকটা পাথর নিয়ে মাসুদ রানা একা চলে গেল জ্যাকসনভিল। একা গেল, কারণ ওর সন্দেহ ছিল আজ হয়তো মার্কেট খোলা পাওয়া যাবে না।

ওর আশঙ্কাই সত্য হলো। বড়দিন উপলক্ষে শহরের প্রায় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। অতএব আরমান্দোকে আরও দু'দিন পর ও যোগাযোগ করবে বলে জানিয়ে দিল রানা। শহর ত্যাগ করার আগে অনেক খুঁজেপেতে মিসেস হকের জন্যে ওদের চারজনের তরফ থেকে চারটে গিফট কিনে নিতে ভোলেনি মাসুদ রানা। চমৎকার এক জোড়া চামড়ার জুতো, একটা দামী কুইল্টেড বেড জ্যাকেট, পারফিউম, একটা পাঁচ পাউন্ডের চকলেট বক্স ইত্যাদি কিনেছে সে।

আরও কিছু কেনাকাটা করল রানা। ও জানে, ওদের খাওয়ার পিছনে প্রচুর ব্যয় হচ্ছে মিসেস হকের। দুধ, কফি, প্যানকেক ফ্লাওয়ার, বীফ, বীয়ার, কোলা, টনিক ওয়াটার ও কয়েক বোতল ভদকা কিনল রানা। ওল্ডসমোবাইল কাটলাসের বুট বোঝাই করে গভীর রাতে হুইটার ফিরে এল ও। এক সঙ্গে এতকিছু উপহার পেয়ে আনন্দে অস্থির হয়ে কেঁদেই ফেলল মহিলা।

হুইটার অবস্থানের শেষ দুটো দিনের স্মৃতি ওদের সবার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাতাশ ডিসেম্বর।

আঁধার থাকতে উঠে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিল ওরা। লোকজন জেগে ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়া ভাল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কেঁদে কেঁদে নাকমুখ ফুলিয়ে ফেলল মিসেস পার্ল হক। নাদিরার অবস্থাও এক। যতক্ষণ দেখা গেল, বার বার পিছনে

তাকাল সে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির সীমানা প্রাচীরের গেটে এসে দাঁড়িয়ে থাকল বৃদ্ধা। হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। ওদের সঙ্গে কিছু দূর পর্যন্ত এল হাউণ্ডটা, তারপর ফিরে গেল। অন্ধকারে খুব দ্রুত হারিয়ে গেল হুইটার।

আগে আগে ছুটছে ওল্ডসমোবাইল কাটলাস, পিছনে ডজ। সামনেরটায় রয়েছে মাসুদ রানা ও নাদিরা। উইগ পরেনি আজ নাদিরা, বারণ করেছে মাসুদ রানা। তার বদলে একটা প্রিন্টের স্কার্ফ পেঁচিয়েছে মাথায়। পরেছে জিনস, উলেন স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে কেডস। সবার ওপর মিঙ্ক কোট। মাসুদ রানা পরেছে সেদিনের কেনা মেরুন প্যাকস, স্পোর্টস শার্ট, তার ওপর কোট।

আগেরবারের মত ব্যাকরোড ধরে হোমারভিল চলল ওরা। একটু একটু করে ফরসা হয়ে উঠছে চারদিক, পাখিরা বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে নীড় ছেড়ে।

'মহিলা ক'দিন খুব কষ্ট পাবেন।' কাত হয়ে রানার দিকে সামান্য ঘুরে বসল নাদিরা। 'বেচারী!'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।'

'অত বড় বাড়িতে কি করে বছরের পর বছর একা আছেন মহিলা, ভেবে পাই না আমি।'

'এসবে অভ্যস্ত ওরা। খুব অসুবিধে হয় না, চলে যায় দিন।'

'আমিও অনেক বছর আছি এদেশে। কিন্তু এদের এই সমাজ ব্যবস্থা মন থেকে মেনে নিতে পারিনি আমি আজও। আমাদের দেশে এসব কল্পনাই করি না আমরা। তোমাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন, রানা?'

'ঐতিহ্যগতভাবে একান্নবর্তী। তবে এখন যুগের হাওয়া বদলেছে। এদের বাতাস আমাদের ওদিকেও যায়। মেয়েরা তো আছেই, কোন কোন পরিবারে বিয়ের পর ছেলেরাও আলাদা হয়ে

যায়। অবশ্য তাদের সংখ্যা এখনও কম।'

'তোমাদের পরিবার কি একান্নবর্তী?'

হাসল মাসুদ রানা। কি উত্তর দেবে ভাবছে।

'হাসছ কেন?'

'আমার কোন পরিবার নেই।'

'নেই মানে?' বিস্মিত হলো নাদিরা।

'নেই মানে? নেই মানে, কেউ নেই আমার।'

'বাবা-মা, ভাই-বোন, কেউ নেই?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'নাহ্। কেউ নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। একভাবে তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে। 'বিয়ে করোনি?'

শব্দ করে হেসে উঠল এবার ও। 'আমার মত বাজে একটা ভবঘুরেকে মেয়ে দেবে কে?'

আর কিছু বলল না নাদিরা।

দশ

দুপুরের একটু আগে জ্যাকসনভিল পৌঁছল ওরা। দেখেশুনে সৈকতের কাছাকাছি এক মোটেলে উঠল। একটা টিলার ওপর, আটলান্টিকের জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ মাত্রারও পঞ্চাশ ফুট ওপরে সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ধপধপে সাদা মোটেলটা। 'ইউ' শেপড। দোতলা। স্পেনীয় ধাঁচের টাইলের ছাদ। 'ইউ'-এর দুই বাহুর মাঝখানে চমৎকার ঘাসমোড়া লাউঞ্জিং এরিয়া। তার ঠিক মধ্যিখানে ছোট একটা সুইমিং পুল। ওঠার আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে মাসুদ রানা, নিজস্ব কার রেন্টাল সার্ভিস তো

বটেই, বোট রেন্টাল সার্ভিসও আছে এদের।

মোটেলের সামনে দাঁড়ালে, তিন-চারশো গজ দূরে সৈকতে এদের নিজস্ব রংচঙে জেটি ও তাতে বাঁধা ডজনখানেক বোট চোখে পড়ে। মাঝারি সাইজের ইয়টও আছে ওর মধ্যে দুটো। আগে-পরে, আলাদা আলাদাভাবে মোটেলে উঠল ওরা। আগে থেকে ঠিক করা পরিকল্পনা অনুযায়ী ফয়েজ ও বিল্লাহ বাইরে থেকে খেয়ে এল প্রথমে। পরে বেরুল মাসুদ রানা ও নাদিরা। লাঞ্চ সেরে ট্যাক্সি নিয়ে মোটেলে ফিরে এল মেয়েটি, রানা গেল জুয়েলারি মার্কেট। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে পাথরগুলো খসিয়ে ফেলল ও। তারপর ফোন করল আরমান্দো সোকারাসের নাম্বারে।

'কাজ কতদূর?'

'কতদূর কি, বস্? সময়মতই কমপ্লিট হয়ে গেছে সব। আপনার ডাকের অপেক্ষায় বসে আছি।'

'কোথায় ওগুলো?'

'আমার সামনেই। টেবিলের ওপর।'

'ঠিক আছে। এখন শোনো, আগামীকাল সকাল দশটায় জ্যাকসনভিল আটলান্টিক বুলেভার্ড পৌঁছবে তুমি।'

'জ্যাকসনভিল, বস্!' ও প্রান্তে প্রায় গুঙিয়ে উঠল কিউবান। 'মাই গড! অতদূর যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু, বস্...'

'কোন কিন্তু নেই, আরমান্দো। ওখানেই কাগজপত্র আমার হাতে তুলে দিচ্ছ তুমি। পরিষ্কার?'

কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেল কিউবান। 'ঠিক আছে, বস্। আপনি যখন বলছেন, কি আর করা।'

'গুড।'

'বাকি টাকা?'

'আছে। ভয় নেই।'

'ছি ছি! আমি তা বলিনি। আচ্ছা যাক, বাদ দিন। ওখানে কোথায় পাব আপনাকে?'

'আটলান্টিক বুলেভার্ড থেকে শহরের দিকে যে রাস্তাটা এসেছে অরল্যাণ্ডের দিক থেকে, তার ঠিক মুখেই একটা ওপেন ফোন বুদ আছে। ওখানে থেকো। ঠিক সোয়া দশটায় ওটার নাম্বারে ফোন করব আমি।'

'ফোন করবেন! শহরের ও মাথায়?' বিস্ময় ফুটল আরমান্দোর কণ্ঠে। 'আপনি থাকবেন না?'

'আমি কোথায় থাকব, তখনই জানতে পাবে তুমি।'

চুপ করে থাকল লোকটা।

'আরমান্দো!'

'আমি শুনছি, বস্।'

'যা বললাম, বুঝতে পেরেছ?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিউবান। 'বস্, এত সবের কি কোন প্রয়োজন ছিল? আশ্চর্য! আমার ওপর বিশ্বাস এতটাই চটে গেল আপনার?'

'বোকার মত কথা বোলো না! প্রয়োজন আছে কি নেই সেটা ব্যাখ্যা করার সময় আসবে পরে। আর এ নিয়ে আবেগপ্রবণ হওয়ারও কিছু নেই। তুমি ভালই জানো আমার কাজের পদ্ধতি। আর যতক্ষণ না উল্টোটা প্রমাণ হয়, ততক্ষণ কারও ওপর থেকে বিশ্বাস হারাই না আমি। তাই যদি হত, কাজটা আমি তোমাকে দিতামই না। ও কাজ করে দেয়ার মত সোর্সের অভাব নেই আমার, সেটাও তুমি জানো।'

'হ্যাঁ। জানি।'

'তবু কেন আমি তোমাকে বেছে নিলাম, ভেবে দেখ। উত্তরটা নিজেই পেয়ে যাবে।'

আবার খানিক বিরতি। 'সরি, বস্। ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না কখনও।'

'ভেরি গুড। তাহলে ওই কথাই থাকল। ঠিক সোয়া দশটায়।'

'শিওর। ছবিগুলো আনতে ভুলবেন না, বস্।'

'না। ভুলব না। ওদের আর কোন খবর আছে?'

'মানে রবা···ইয়ে, ওদের? না, বস্। একদম সাড়া নেই। মনে হয় নেই ব্যাটারা এখানে। চলে গেছে বোধহয়।'

'সতর্ক থেকো পথে। ফেউ লাগে না যেন পিছনে।'

'ফেউ! আমার পিছনে? হাসালেন।'

'হাসালাম নাকি? তাহলে হেসে নাও খানিক। কিন্তু লক্ষ রেখো, পরে যেন কাঁদতে না হয় আবার।'

'ওকে, বস্। সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আপনিও গর্ত ছাড়ার আগে চারদিকটা দেখে নেবেন।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল মাসুদ রানা। ফিরে এল হোটেলে। আরমান্দোর টাকাটা আলাদা করে একটা রুমালে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল। তারপর খানিক গড়াগড়ি করে উঠে পড়ল। বেরিয়ে এসে লাউঞ্জে বসল নাদিরাকে নিয়ে। ফয়েজ আর বিল্লাহও এসেছে। ওদের থেকে খানিকটা তফাতে বসেছে তারা, যেন চেনে না। গল্প করতে করতে কফি খেলো ওরা।

পাটে বসতে চলেছে সূর্য। মেঘের দাপটের কাছে আজ সারাদিন এমনিতেই বেশ নিস্তেজ ছিল ওটা। মেঘ এখনও আছে

আকাশে, তবে ছেঁড়াফাটা। চলছে ধীর গতিতে, ড্রাগনের মত মোচড় খেতে খেতে। আলো-আঁধারীর চমৎকার খেলা চলছে সৈকতে। 'চলো, রানা, বীচে গিয়ে বসি।'

'চলো।' রুম থেকে বড় দুটো তোয়ালে নিয়ে এল মাসুদ রানা। ফয়েজ আর বিল্লাহর পাশ কাটিয়ে আসার সময় চাপা গলায় বলল, 'রুমের দিকে খেয়াল রেখো।'

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা-নাদিরা। বালুকাবেলায় ভেঙে পড়ে গড়িয়ে এসে ওদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে সাগরের ফেনিল পানি। নাকেমুখে আছড়ে পড়ছে সূক্ষ্ম পানির কণা। নীরবে দাঁড়িয়ে বাতাসের মৃদু গোঙানি শুনল ওরা। 'রানা!' দীর্ঘ সময় পর নীরবতা ভাঙল নাদিরা।

'বলো।'

'এ দেশে আর আসা হবে না আমার, তাই না?'

'কেন আসা হবে না?' চোখ কুঁচকে ওকে দেখল মাসুদ রানা।

'আমি ফিরে এলে রবার্টো...' থেমে গেল সে রানাকে মাথা নাড়তে দেখে।

'রবার্টো তখন থাকবে না,' দৃঢ়, নিশ্চিত কণ্ঠে বলল ও।

'বুঝলাম না।'

'বেশি বুঝে কাজ নেই। মোট কথা রবার্টো তখন থাকবে না। নিশ্চিন্তে ফিরে এসো তুমি।'

'উঁম্‌ম্‌! ভাবছি...আর লেখাপড়া করব না। ছেড়ে দেব।'

'কেন?'

'আর ইচ্ছে করে না। কি হবে পড়ে?'

চোখ বড় করে ভাবুকের মত মাথা দোলাল রানা। 'তাইতো! কি হবে পড়ে?'

'যাও।' হেসে উঠল নাদিরা। 'ঠাট্টা কোরো না। আমি

সিরিয়াসলি বলছি।'

'আমিও সিরিয়াসলি জানতে চাইছি, লেখাপড়া না করলে তোমাকে যে না খেয়ে থাকতে হবে না তা আমি জানি, কিন্তু করবেটা কি? সময় কাটাবে কি করে?'

'বিয়ে করে ফেলব।'

'বিয়ে?'

'হুঁম!'

'তা মন্দ নয়। আছে নাকি পছন্দের কেউ?'

'আছে,' মিটিমিটি হাসছে নাদিরা। 'দারুণ স্মার্ট, হ্যাণ্ডসাম ছেলেটা।'

'তাহলে তো ভালই। সেরে ফেল কাজটা।'

'কিন্তু একটা মুশকিল আছে।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা।

'আমি ছেলেটাকে ভালবাসলেও সে আমাকে বাসে কিনা জানি না।'

'একতরফা প্রেম?'

মুখ নামিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে বালি খুঁড়তে লাগল নাদিরা। রানা দেখল, ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে তার। 'প্রথম প্রথম কয়েকদিন তাই মনে হয়েছে আমার,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু...'

'কি?'

'কিন্তু পরশু আর কাল রাতে মনে হয়েছে বুঝি দু'তরফাই।'

আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'পরশু আর কা...' বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে উঠল ও। নিশ্চয়ই গত দু'রাতের ঘনিষ্ঠতার কথা বোঝাতে চাইছে নাদিরা। ব্যাপারটা এতই আচমকা শুরু হয়েছিল, যখন বুঝতে পেরেছে রানা, তখন দেরি

হয়ে গেছে, অন্তত প্রথম রাতে। আর সে জন্যে ওর চেয়ে নাদিরাই বেশি দায়ী। 'নাদিরা! মারাত্মক ভুল করছ তুমি!'

'কেন? আমি কি তোমার যোগ্য নই?'

করুণ এক টুকরো হাসি ফুটল রানার মুখে। 'উল্টো বুঝলে, আসলে আমিই তোমার যোগ্য নই। তুমি কেন, কোন মেয়েরই স্বামী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।'

'কেন নেই? কিসের অভাব তোমার?'

'বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার অভাব। এ কয়দিন তো সঙ্গে থেকে নিজের চোখেই দেখলে প্রতি মুহূর্তে কি ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয় আমাকে। প্রতিবার আমরা জিতে গিয়েছি বলে এখনও বেঁচে আছি, নইলে বহু আগেই আমার লাশের বুকে পা রেখে গলা ছেড়ে হাসত রবার্টো গার্সিয়া। সারাক্ষণ এর মধ্যেই থাকতে হয় আমাকে, নাদিরা। আমি চাই না আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে কেউ নিজের ধ্বংস ডেকে আনুক। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, প্লীজ!'

'তার মানে আমারই ভুল! একতরফাই ছিল তাহলে ব্যাপারটা!'

'না, তোমার ভুল হয়নি। ভাল আমিও বাসি তোমাকে।'

'কি বললে?' অবাক চোখে তাকাল নাদিরা।

'ঠিকই বলেছি। হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসি আমি। ভালবাসি বলেই চাই না তুমি কোন অনিশ্চিত পথে পা বাড়াও। আর যাকে আমি ভালবাসি না, সে সেধে এলেও তাকে আমি গ্রহণ করি না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। মন খারাপ হয়ে গেছে। পরে অবশ্য একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠল। রানার দিকে চেয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'সত্যি?'

'কি?'

'তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস?'

হাসল মাসুদ রানা। 'বিশ্বাস হলো না?'

বাচ্চা মেয়ের মত মাথা দোলাল নাদিরা। 'হয়েছে। তবু আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।' ওর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে। 'বলো না!'

'শোনো মেয়ে, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'আরেকবার,' আবেগে চোখ বুজে এল নাদিরার। 'প্লীজ!'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল মেয়েটির। পাশাপাশি, গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখল ওরা। দূর থেকে একটা জাহাজ চলে গেল কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। মাথার ওপর উড়ছে অনেকগুলো সী-গাল, রাতের মত আশ্রয়ের খোঁজে চলেছে ওরা। সৈকতও খালি হয়ে গেল একটু একটু করে, চলে গেছে সৌন্দর্য পিপাসুরা।

'রানা!'

'বলো।'

'এভাবেই কাটবে জীবন? কোনদিন কি ঘর-সংসার করা হবে না তোমার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল মাসুদ রানা। 'সময়ে যা হয় না, তা কি অসময়ে হয় কখনও?'

'ইচ্ছে করলেই তো সুযোগটা করে নিতে পারো।'

'কি ভাবে?'

'এই পেশা ছেড়ে দিয়ে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। বিষণ্ন। 'পারি না।'

'কেন পারো না?'

পায়ের কাছে এসে পড়া ছোট একটা মরা ডাল লাথি মেরে

পানিতে ছুঁড়ে দিল ও। 'এ ছাড়া নিজেকে কল্পনাই করতে পারি না আমি। যদি কখনও এমন দিন আসে, ছেড়ে যেতে হবে আমাকে এ পেশা, তাহলে হয়তো···,' শিউরে উঠে থেমে গেল মাসুদ রানা। 'ভাবতেও পারি না। তারচে' মৃত্যুও অনেক ভাল।'

ওর বাহু আঁকড়ে ধরে, কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে থাকল নাদিরা। দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

আটলান্টিক বুলেভার্ড জংশন। সকাল দশটা।

টকটকে লাল একটা প্যাকার্ডের ড্রাইভিং সীটে বসে আছে আরমান্দো সোকারাস। পাশের সীটে বসা আণ্ডারটেকার, ম্যানুয়েল গার্সিয়া। আজ আরও বেশি নার্ভাস লাগছে লোকটাকে। ঘামছে সে। ঢোঁক গিলছে ঘন ঘন। হাতের তালু ঘামছে বেশি। থেকে থেকে প্যান্টে হাত ঘষছে লোকটা।

অস্থির চিত্তে স্টিয়ারিং হুইলে তবলা বাজাচ্ছে আরমান্দো। বার বার তাকাচ্ছে ডানদিকের ওপেন বুদটার দিকে। তার পাঁচ হাতের মধ্যে রয়েছে বুদটা। গার্সিয়ার নড়াচড়ায় এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল সে। 'একটু স্থির হয়ে থাকতে পারো না তুমি?' চোখ গরম করে লোকটার দিকে তাকাল আরমান্দো। 'এত কিসের ভয় তোমার? এমন ভীতু মানুষ বাপের জন্মে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি! যত্তোসব!'

মুখ খুলল না গার্সিয়া। এদিকে তাকালও না। তবে উসখুস খানিকটা কমল।

ঠিক সোয়া দশটায় বাজল ফোন। রিং কানে আসামাত্র সশব্দে দরজা খুলল আরমান্দো, ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল। 'হ্যালো!'

'আরমান্দো?'

'ইয়েস, বস্।' হাসি ফুটল কিউবানের মুখে।

'কেনসিংটন রোডের নেভাডা হোটেলের কাছের ফোন বুদে এসো পনেরো মিনিটের মধ্যে। সাড়ে দশটায় ওখানে ফোন করব আবার।'

'অল রাইট, বস্,' একটু ইতস্তত করে বলল সে। ফোন রেখে গাড়িতে উঠেই স্টার্ট দিল, ছুটল কেনসিংটন রোড। শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে জায়গাটা। দশ মিনিট লাগবে পৌঁছতে।

আরমান্দো কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটা ডজ এসে দাঁড়াল ওই পাবের সামনে। ফয়েজ নামল গাড়ি থেকে, একটা নাম্বারে ডায়াল করল। 'ফয়েজ বলছি।'

'বলো।'

'সন্দেহজনক কিছু মনে হলো না ওর আচরণে।'

'শিওর?'

'জ্বি। সোজা এসে গাড়িতেই বসে ছিল আপনার ফোন আসা পর্যন্ত। তারপর কথা সেরেই রওনা হয়ে গেছে। কোথাও কোন ফোন করেনি, কাউকে কোন সঙ্কেতও দেয়নি। কেউ অনুসরণও করেনি ওকে।'

'যাক,' সন্তোষ প্রকাশ পেল মাসুদ রানার কণ্ঠে। 'থার্ড পোস্টে চলে যাও তুমি।'

'জ্বি।' রিসিভার রেখে ডজে উঠল ফয়েজ আহমেদ। ছেড়ে দিল গাড়ি।'

শহরের আরেক প্রান্তে বেজে উঠল আরেকটা টেলিফোন। 'সেনেয়র?'

'হোমার পিকিং পরিষ্কার?' অন্য প্রান্ত থেকে ইটালিয়ানে প্রশ্ন করল গম্ভীর একটা কণ্ঠ।

'একদম পরিষ্কার, সেনেয়র।'

'কোথায় আছে এখন ওরা?'

'একেবারে আমার হাতের মুঠোয়।'

'কীপ ওয়াচ। আমি ফোনের পাশেই আছি। ওদের লোকেশন বদল হলেই আমাকে জানাবে।'

'নিশ্চই, সেনেয়র।'

'আরমান্দো?'

'হ্যাঁ, বস্।'

'গ্র্যাণ্ড প্যালেস হোটেলের উল্টোদিকের পাবে এসো। পনেরো মিনিট পর যোগাযোগ করব আমি। পৌনে এগারোটায়।'

বেকুবের মত রিসিভারের দিকে চেয়ে থাকল কিউবান। লাইন কেটে গেছে। বিড়বিড় করতে করতে প্যাকার্ডে এসে উঠল সে। গাড়িটা সামনের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে কাটলাস থেকে বেরিয়ে এল মুত্তাকিম বিল্লাহ, রিসিভার তুলল। পাবের দশ গজ সামনের একটা পার্কিং লটে আগে থেকেই বসে ছিল সে, ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছনটা দেখছিল।

'একদম ক্লীন, কোন সন্দেহ নেই।'

'ঠিক আছে। অপেক্ষা করো তুমি, আমরা আসছি।'

পাঁচ মিনিট পর একটা ট্যাক্সি এসে থামল দাঁড়িয়ে থাকা ওল্ডসমোবাইল কাটলাসের পিছনে। মাসুদ রানা ও নাদিরা নামল ওটা থেকে। 'ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও জায়গামত,' বিল্লাহর উদ্দেশে বলল রানা। পৌনে এগারোটায় শেষবার যোগাযোগ করল রানা কিউবানের সঙ্গে। হোটেল গোল্ডেন ভিউর অবস্থান ভাল করে বুঝিয়ে দিল তাকে। 'সোজা চলে যাও। ওখানে পাবে তুমি আমাকে।'

ফোন রেখেই দ্রুত কাটলাস ছোটাল মাসুদ রানা। ওদের

থেকে প্রায় দশ মিনিট এগিয়ে আছে আরমান্দো এবং ফয়েজরা, ওভারটেক করতে হবে তাদের।

হাঁ করে কিছু সময় ধ্বংসস্তূপটার দিকে তাকিয়ে থাকল নাদিরা। একটা ঢোঁক গিলল। 'এ যে ভূতুড়ে বাড়ি!'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। গাড়ি ঘুরিয়ে গেটমুখো করে রাখল ও, স্টার্ট বন্ধ করল। তবে চাবিটা বের করল না ইগনিশন থেকে। দ্রুত কেটে পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। নেমে এল ওরা গাড়ি থেকে। অবাক চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মেয়েটি। পাখির ডাক, আর মৃদু বাতাসে গাছপালার দুলুনি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই চারদিকে। গোল্ডেন ভিউর ভৌতিক কাঠামোর সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পরিবেশটা।

ওদের আওয়াজ পেয়ে ফয়েই-এর ভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ফয়েজ, কিন্তু বাইরে এল না। ঘুরে বোটটা দেখে নিল রানা। আছে ওটা জায়গামতই।

'ওপরতলায় একটা স্যুইট পাওয়া যাবে না?' হাসি মুখে বলল নাদিরা। 'বারান্দাসহ লাক্সারি স্যুইট?'

'চলো, খুঁজে দেখা যাক।'

পোর্টিকো অতিক্রম করে ওপরে উঠে এল ওরা হাত ধরাধরি করে। বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল নাদিরা। নাক কুঁচকে উঠল তার। 'ইয়াল্লা!'

'ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ,' বলল মাসুদ রানা। 'মুখ দিয়ে দম নাও।'

'থাক তাহলে। আর গিয়ে কাজ নেই।'

'বেশ।' এগিয়ে গেল মাসুদ রানা। ফয়েজের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিটও হয়নি, গাড়ির আওয়াজ শোনা

গেল। পিছিয়ে এল রানা, ফয়েজ চলে গেল আড়ালে। নাদিরাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। 'একটা গাড়ি, রানা।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। সামান্য সরে এসে সামনে দাঁড়াল। পরক্ষণে টকটকে লাল একটা প্যাকার্ড চোখে পড়ল ওর। হোটেল কম্পাউণ্ডের বাইরে রাস্তার ওপর থেমে পড়েছে গাড়িটা, এদিকে ফিরে উঁকিঝুঁকি মারছে আরমান্দো। সিঁড়ি ভেঙে ছাদহীন পোর্টিকোয় নেমে এল মাসুদ রানা, যাতে লোকটা দেখতে পায়। কিন্তু তার দরকার হলো না, আগেই ওর ওল্ডসমোবাইলটা দেখে ফেলেছে সে।

সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল আরমান্দো। রানাকে দেখামাত্র দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোকটার, আনন্দে না স্বস্তিতে বোঝা গেল না। কাটলাসের মুখোমুখি দাঁড় করাতে যাচ্ছিল সে নিজের প্যাকার্ড, কিন্তু কি ভেবে শেষ মুহূর্তে সরে এল, পাশাপাশি থামল। লক্ষ করল রানা, গাড়িটা ঘোরাল না কিউবান। নেমে এল।

'হাই, বস্!' হাত নাড়ল উচ্ছ্বসিত আরমান্দো।

'হাই!'

'নেমে এসো,' পিছন ফিরে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল কিউবান। ডানে তাকাতেই উঁচু বারান্দায় মিঙ্ক কোট পরা নাদিরার ওপর চোখ পড়তে একটু থমকাল। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল সে তাকে। মাসুদ রানার মুখোমুখি দাঁড়াল এসে। পাশে তাকিয়ে গার্সিয়াকে না দেখে খেপে গেল কিউবান। ঘুরে তাকিয়ে খ্যাক খ্যাক করে উঠল। 'এখনও এলে না? তোমাকে নামাতে স্ট্রেচার লাগবে নাকি?' রানার দিকে ফিরল সে। 'কী যে মুসিবতে পড়েছি একে নিয়ে! এমন ভীতু, টিকটিকির ডাক শুনেও লাফিয়ে ওঠে।'

নেমে পড়ল ম্যানুয়েল গার্সিয়া। সেদিনের মত একই

পোশাকে আছে লোকটা, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। চেহারা তার আরও শোচনীয় লাগছে আজ। মুখটা চকের মত সাদা। কপালে চিকচিক করছে চিকন ঘাম। কাঁপা পায়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল সে। চোখ কাঁপছে ঘন ঘন।

ক্যাটকেটে গাঢ় সবুজ রঙের কমপ্লিট সুট পরেছে আজ আরমান্দো সোকারাস। টু-টোনড, ভোঁতা নাকের জুতো, মাথার দিক বাদামী, বাকিটা হলুদ চকচকে নরম চামড়ার। গায়ে জংলা ছাপার শার্ট, গলায় বিঘৎখানেক চওড়া প্রিন্টের টাই। মাথায় সম্ভবত পমেড মেখেছে লোকটা, রোদের আলোয় চিকচিক করছে চুল। দু'হাতেই দুটো করে হীরের আংটি। এত কড়া পারফিউম মেখেছে যে দম আটকে আসছে মাসুদ রানার।

কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। কি যেন একটা অসামঞ্জস্য চোখে পড়েছে রানার ম্যানুয়েল গার্সিয়ার মধ্যে, এতই সূক্ষ্ম যে ধরতে পারছে না। অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে ব্যাপারটা। সেটা যে কি, বের করার জন্যে ফুল স্পীডে মাথা ঘামিয়েও সুবিধে করতে পারল না মাসুদ রানা। লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার নজর বোলাল ও, কিন্তু লাভ হলো না। বিষয়টা ধরা গেল না।

অস্বস্তি লাগলেও ভাবনাটা আপাতত পাশে সরিয়ে রাখল মাসুদ রানা। কিউবানের দিকে ফিরল। 'তোমার গাড়ির বুট খোলো।'

বিস্মিত হলো লোকটা। 'কেন, বস্?'

আমল দিল না রানা। 'চেক করব।'

'ইশ্!' মাথা দোলাল লোকটা ঘন ঘন। 'ইজ্জত এতক্ষণে যেটুকুও বা ছিল, বস্, দিলেন পাংচার করে।'

বুট দেখল রানা, পিছনের সীটের ফ্লোরবোর্ডের ওপরও চোখ বোলাল একবার। 'বিজনেস ইজ বিজনেস।' নাদিরার দিকে

তাকাল রানা, আগের জায়গায়ই আছে সে।

'নাও,' গার্সিয়াকে বলল আরমান্দো। 'বের করো তোমার কাগজপত্র।'

কাঁপা হাতে ব্যাগের চেইন খুলল আণ্ডারটেকার, একগাদা কাগজ-কার্ড ইত্যাদি বের করল। কাঁপুনির চোটে একটা কার্ড হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল, চট করে তুলে ফেলল সে ওটা। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে একবার রানা, একবার আরমান্দোর দিকে তাকাল। তারপর সব কাগজ এগিয়ে দিল রানার দিকে। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বের করেনি লোকটা এ পর্যন্ত।

একটা একটা করে পরখ করল রানা সবগুলো। পাসপোর্টের প্রতিটি পাতা, সোশাল সিকিউরিটি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বার্থ সার্টিফিকেট, একাধিকবার করে পরীক্ষা করল রানা সতর্ক চোখে। ঠিকই আছে সব, অন্তত কাস্টমসকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এগুলো যথেষ্ট। হঠাৎ করেই হাত থেমে গেল মাসুদ রানার, মাথা তুলল ঝট্ করে।

'একটা শব্দ পেলাম যেন?' নাদিরার দিকে ফিরে বলল ও।

ভুরু কোঁচকাল মেয়েটি। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল। 'কই! শুনিনি তো!'

'মনে হলো যেন পানির শব্দ,' বলে মাথা নামাল রানা। শেষবারের মত ওল্টাতে লাগল কাগজগুলো।

'ছবি এনেছেন, বস্?'

'এনেছি,' বলল রানা মাথা দুলিয়ে। গতরাতে ডিনার খেয়ে ফেরার পথে নাদিরার ছবি তুলিয়ে একবারে ওয়াশ করিয়ে নিয়ে মোটেলে ফিরেছিল ও।

'রানা!' সোজা হয়ে গেল নাদিরা।

মুখ তুলল মাসুদ রানা।

'আমিও শুনেছি একটা শব্দ! এইমাত্র!'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। মাথাটা একটু কাত করে দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু শোনার চেষ্টা করছে। দুই ধাপ সিঁড়ি ভাঙল নাদিরা অস্থির চিত্তে, তারপর আরও দুই ধাপ। মুখের রং পাল্টে যেতে শুরু করেছে দ্রুত।

'ইঁদুর হবে হয়তো,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল আরমান্দো। 'অথবা কোন পাখি-টাখি। নয়তো আর কিসের আওয়াজ উঠবে এমন বাজপড়া জায়গায়?'

কেউ কোন কথা বলল না। জমে গেছে সবাই, শুধু গার্সিয়া বাদে। কাঁপুনি বেড়ে গেছে তার বহুগুণ। ঢোঁক গিলছে ঘন ঘন।

এই সময় আবার উঠল আওয়াজটা। পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই। মনে হলো হাঁটতে গিয়ে কেউ যেন অসাবধানে পা দিয়ে ফেলেছে পানি ভরা নরম গর্তে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল নাদিরা, 'রানা!'

কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মাসুদ রানা, মুহূর্তে ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে হাতে। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'নাদিরা! ভেতরে যাও!' বলেই আরমান্দোকে লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল ও। 'বিশ্বাসঘাতক!'

সশব্দে আঁতকে উঠল কিউবান। চোখ দুটো লাফিয়ে পড়ার জোগাড় কোটর ছেড়ে। দু'হাত সামনে তুলে এক পা পিছিয়ে গেল সে। 'ঈশ্বরের কসম, বস্, আমি কিছু জানি না! আমি ট্রেইটর না! যিশুর কসম, বস্, আমার বউ-বাচ্চার কসম! আমি কিছু জানি না! আমি কিছু জানি না!' ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল লোকটা।

ডানদিকে কয়েক জোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ উঠল। সৈকতের দিকে। পলকে বুঝে ফেলল রানা কি ঘটে গেছে। প্রথম থেকেই ওর নজর ছিল রাস্তার দিকে, শত্রু যে সাগরপথে আসতে

পারে, ভাবেইনি। বরং রাস্তার দিক থেকে ধাওয়া এলে ওই পথে সরে পড়বে বলে একটা স্পীডবোট ভাড়া করেছে ও, সকালে ফয়েজ বেঁধে রেখে এসেছে বোটটা সৈকতে। অথচ, ওদিক থেকেই শত্রু এসে হাজির। ওদিকে মেয়েটির চিৎকার শুনে বুঝে গেছে গার্সিয়া, এখন আর লুকোছাপায় কাজ হবে না। টের পেয়ে গেছে ওরা। তাই কাদা-পানি মাড়িয়ে ছুটে আসছে সে দলবল নিয়ে।

'টাশ্‌শ্‌, টাশ্‌শ্‌!'

নাদিরার ডানদিকে পোর্টিকোর মোটা একটা থামে বিদ্ধ হলো গুলি দুটো। ভয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, চোখ কপালে তুলে প্রায় উড়ে পেরিয়ে এল বাকি ধাপগুলো। দিশা হারিয়ে ফেলেছে। ছুটে বেরিয়ে এল ফয়েজ ভেতর থেকে, বুঝে নিয়েছে আর লুকিয়ে থাকার সময় নেই। মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে আরমান্দো, কাঁপছে এখনও সে। ওদিকে হাতের ব্যাগ ফেলে আড়াল নেয়ার উদ্দেশে ছুটতে শুরু করেছে ম্যানুয়েল গার্সিয়া। চোখের কোণ দিয়ে রাস্তায় একটা নড়াচড়া দেখতে পেল রানা, বিল্লাহও পৌঁছে গেছে।

নাদিরার হাত ধরে বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল মাসুদ রানা। খোলা জায়গায় থাকলে বুলেট খেতে হবে যে কোন মুহূর্তে। 'ওখানে থাকলে মরবে,' ছুটতে ছুটতে আরমান্দোর উদ্দেশে বলল রানা। 'জলদি ভেতরে এসো!'

দৌড়ের ফাঁকে গার্সিয়ার দিকে এক পলক তাকাল রানা, আরমান্দোর গাড়ির আড়ালে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ব্যাঙের মত বসে আছে লোকটা। এক বিন্দু রক্তেরও আভাসও নেই মুখে। কেন যেন তাকে সতর্ক করার ইচ্ছে হলো না মাসুদ রানার। ফয়েই-এ পা রেখে অনেকটা নিরাপদ বোধ করল ও।

ভেতরে এসেই আশ্রয় নিল দরজার পাশে। কাঁধ ধরে চেপে মাটিতে বসে পড়তে বাধ্য করল নাদিরাকে।

ওদের পাশ ঘেঁষে প্রায় উড়ে ভেতরের দিকে ছুটে গেল আতঙ্কিত আরমান্দো। দূর থেকে করুণার চোখে লোকটাকে দেখল ফয়েজ এক পলক, তারপর একটা পাল্লাহীন জানালার পাশে অবস্থান নিয়ে বাইরে তাকাল। উঁকি দিল মাসুদ রানাও। সৈকতের দিকের ঝোপঝাড় ঠেলে হোটেল কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়েছে সাত-আটজন। দেখতে দেখতে কয়েকটা শ্রীহীন পাম গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল তাদের কয়েকজন। দু'জন থামল না, কুঁজো হয়ে ছুটছে তারা, কম্পাউণ্ড ঘুরে হোটেলের পিছনে পৌঁছতে চাইছে সম্ভবত। ওদের আগে আগে যে আরও দু'জন আছে, চোখেই পড়েনি কারও। টার্গেট দুটো খুব পছন্দ হলো ফয়েজের। ছুটন্ত টার্গেট শুইয়ে ফেলার মজাই আলাদা। তার সাব মেশিনগানের আচমকা ঠা ঠা হুঙ্কারে চমকে উঠল বিরান সোনালী সৈকত। মুখ থুবড়ে কাদামাটিতে আছড়ে পড়ল একটা টার্গেট, অন্যটা বিকট এক চিৎকার ছেড়েই বসে পড়ল, পর পর দুটো বুলেটের আঘাতে তার উরুর হাড় পাউডার হয়ে গেছে। তার সামনেই সঙ্গীর নিশ্চল দেহ পড়ে আছে। ওদিকে গার্সিয়া সহ দলের অন্যরা মেশিনগানের আওয়াজে হতভম্ব হয়ে পড়েছে, অভ্যর্থনা জানাতে মাসুদ রানা যে এই মাল সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এ ছিল ওদের কল্পনার বাইরে। ক্ষণিকের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল সে।

ওদিকে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে বিল্লাহর। ও যে ছুটে এসে হোটেলের গেটের কাছে এক ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, লক্ষই করেনি কেউ। দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে নিজের অবস্থান থেকে। পিস্তল উঁচিয়ে বসে আছে মূর্তির মত,

গাছের পিছনে, নজর সামনে। গলা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। দূরেরটা একটু কঠিন, তাই ওটাকেই প্রথম পছন্দ করল বিল্লাহ। কাছেরটাকে পরেও নেয়া যাবে। ওর সরার উপায় নেই, কিন্তু দূরেরটা বিপদ কোন দিক থেকে আসছে টের পেয়ে যদি কয়েক ইঞ্চিও সরে বসে, তাহলে ওকে ঝোলায় পোরা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।

এসএমজি রেখে নিজের ভয়ঙ্করদর্শন লুগার তুলে নিল বিল্লাহ, সতর্কতার সাথে, প্রথম পছন্দের ডান কানের ওপরের খুলি তাক করল। বিকট 'টাশ্‌শ্‌!' শব্দে তপ্ত মৃত্যুবর্ষণ করল তার পিস্তল, হেভি ক্যালিবার বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো লোকটা। চুলসমেত এপাশের খুলির বড় একটা অংশ আকাশে উঠে পড়তে দেখা গেল তার, বাতাসে কয়েকটা এলোপাতাড়ি পাক খেয়ে ভেতরের রক্তাক্ত পেট মেলে দিয়ে চিত হয়ে পড়ল সেটা। কিসের আঘাতে মৃত্যু হলো, টেরও পায়নি সম্ভবত লোকটা।

তাই দেখে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল এ পাশের লোকটির। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত তাকিয়ে থাকল সে কয়েক গজ দূরে পড়ে থাকা দেহটার দিকে। চেহারা হয়েছে বেকুবের মত। এক মুহূর্ত, তারপরই ঝট্ করে এদিকে ফিরল সে, বুঝতে পেরেছে কোন দিক থেকে এসেছে বুলেটটা। বিল্লাহর লুকিয়ে থাকা অবস্থানের দিকে অস্ত্র তুলল সে দ্রুত, কিন্তু ভঙ্গি অনিশ্চিত। গুলি করবে কি করবে না, ভাবছে। ঠিক এই সময় কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হলো লোকটার। পিছন দিকে ভীষণ এক ঝাঁকি খেলো তার মাথা, এতই জোরে যে ঘাড়ের হাড় ফোটার মট্ মট্ আওয়াজও পরিষ্কার শুনতে পেল বিল্লাহ। বিস্ফারিত তিন চোখে আকাশ দেখতে দেখতে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা।

মুহূর্তকয়েক হাত-পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল।

'ইয়াহু!' উল্লাসে চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ফয়েজ। 'আরও দুটো খরচ হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই। নিশ্চই লম্বা আহাম্মক, তোবা, বিল্লাহ নিয়েছে ওদের।'

টাশ্‌শ্‌! টাশ্‌শ্‌!

পর পর দুটো গুলি, তারপরই একটা কাতর, চাপা আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল মাসুদ রানা। গলাটা চিনতে পেরেছে ও, বিল্লাহর গলা। দ্বিতীয়জনকে গুলি করার সুবিধের জন্যে ঝোপের আড়াল থেকে ডান কাঁধ বের করতে হয়েছিল ওকে, কাজ সেরে আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আগেই গুলি খেয়েছে সে। ঠিক কাঁধে লেগেছে গুলিটা। তার অবস্থান থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনে তাকাল মাসুদ রানা। মুহূর্তের জন্যে একটা ছায়া দেখতে পেল। এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়ালে চলে গেল সেটা বাঁদরের মত লাফ দিয়ে।

'বিল্লাহ গুলি খেয়েছে!' বলল রানা। রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। পিস্তলটা কোমরে গুঁজল ও, পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা মেশিন পিস্তল তুলে পিছনদিকে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। ওপাশে দেয়ালঘেঁষে বসে থাকা আরমান্দো বলে উঠল, 'আমাকে একটা কিছু দিন, বস্। যে কোন একটা অস্ত্র দিন।'

তার দিকে তাকাল রানা। এখন আর আগের মত ভীত সন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে না কিউবানকে। বরং মনে হচ্ছে কার ওপর যেন সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে। মুহূর্তখানেক ভাবল ও, তারপর হাতের মেশিন পিস্তলটা দোলাল। 'এটা চালাতে জানো?'

উঠে এল আরমান্দো। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল। 'চালাইনি কখনও, তবে জানি। দেখেছি কি ভাবে চালাতে হয়।'

খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিল মাসুদ রানা।

'বেশিক্ষণ ট্রিগার চেপে রাখবে না। গুলি করার সময় ব্যারেলটা ডানে বাঁয়ে এক ইঞ্চি ঘোরাবে। ওকে?'

'ওকে, বস্,' দৃঢ় আস্থার সুরে বলল আরমান্দো।

'এখানেই থেকো। ফয়েজ, খেয়াল রেখো।' আরেকটা মেশিন পিস্তল তুলে নিয়ে আবার পা বাড়াল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল নাদিরা।

'আসছি। তুমি নড়বে না জায়গা থেকে।' ফয়েই থেকে বেরিয়ে এল রানা। কাদার মত জমে থাকা প্যাচপেচে নোংরার ওপর দিয়ে যথাসম্ভব নিঃশব্দে ছুটল। দূর থেকে কম্পাউণ্ড ঘুরে সামনের দিকে যেতে চায় ও। বিল্লাহর খোঁজ নেয়া জরুরী। ভেতরে আবার গর্জে উঠল ফয়েজের এসএমজি। লম্বা এক করিডর পড়ল সামনে, সেটা ধরে দশ পা মত এগোল মাসুদ রানা, তারপর জমে গেল। চাপা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও, সামনে থেকে আসছে কেউ। সাঁৎ করে দেয়ালের সাথে মিশে নেই হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা। হাতে উদ্যত মেশিন পিস্তল। প্রস্তুত। গার্সিয়া? ভাবল ও। কোথাও যে আড়াল নেবে, সে উপায় নেই। দু'পাশেই টানা দেয়াল।

মনে মনে পাঁচ পর্যন্ত গুণল মাসুদ রানা, ছয় গোণার সময় পেল না। তার আগেই বাঁকের মুখে বেরিয়ে এল রবার্টো গার্সিয়া। হাতে পিস্তল, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ধরা। নল সিলিঙের দিকে। ঠিক পিছনেই আরও একজন রয়েছে। ঘুরে এদিকেই আসতে যাচ্ছিল গার্সিয়া, সামনে চোখ পড়তে থমকে গেল। এ নিশ্চয়ই দলের সাথে ছিল না, ভাবল ও। থাকলে চোখ এড়িয়ে এতদূর আসতে পারত না কিছুতেই। হয়তো আগে থেকেই···সন্দেহটা আবার উঁকি দিল রানার মনে।

'হ্যালো, গার্সিয়া!' অমায়িক হাসি দিল রানা। 'কেমন আছ?'

আহত বাঘের মত লাফ দিল লোকটা। জবাবে বিশ্রী ক্যাট ক্যাট শব্দে হুঙ্কার ছাড়ল রানার জার্মান মেশিন পিস্তল। ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই গার্সিয়ার ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল তার সঙ্গী, অবশ্য তার আগেই হালিখানেক গুলি হজম করতে হয়েছে লোকটাকে। লাফ দিয়েই চোখের আড়ালে চলে গেল গার্সিয়া। পা বাড়াতে গেল রানা ঝোঁকের মাথায়, থেমে গেল শেষ পর্যন্ত। টিপে টিপে এগোল। কোন সাড়া নেই ওপাশে।

ওদিকে ফয়েই থেকে একযোগে দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ ভেসে এল, পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল হোটেল গোল্ডেন ভিউ বিস্ফোরণের ধাক্কায়। গ্রেনেড চার্জ করেছে ফয়েজ বা বিল্লাহ। বিল্লাহর অবস্থা কি, ভাবল রানা, পরক্ষণে চিন্তাটা বিদায় করে দিল। পরে দেখা যাবে, আগে গার্সিয়াকে চাই। বাঁকের মুখে এসে থেমে পড়ল ও, বসে উঁকি দিল। নেই কেউ। সামনে ফাঁকা। এটা আরেক করিডর।

পরক্ষণেই চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। মেঝেতে মোটা একটা রক্তের ধারা। পালাবার সময় পিছনে রেখে গেছে গার্সিয়া। আহত হয়েছে লোকটা মারাত্মকভাবে। ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দ উল্লাস অনুভব করল ও। পায়ের কাছে পড়ে থাকা দেহটার ওপর চোখ বোলাল, বাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝা দায়। পাশে পড়ে থাকা তার পিস্তলটা তুলে পকেটে ভরল মাসুদ রানা, তারপর রক্তের ধারা অনুসরণ করে এগোল। হাতের মেশিন পিস্তল পূর্ণ প্রস্তুত।

করিডরের শেষ মাথায় তিন ধাপ সিঁড়ি, তারপরই খোলা, কর্দমাক্ত প্রান্তর। চোখ তুলতেই ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গার্সিয়ার ওপর চোখ পড়ল ওর। শ'খানেক গজ দূরে, উন্মুক্ত সৈকতের দিকে প্রাণপণে ছুটছে লোকটা ডান পা টেনে টেনে। এগোবার

ভঙ্গি দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না ভালই জখম হয়েছে সে। এক লাফে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। যে গাছগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল গার্সিয়ার লোকেরা, সেদিকে থেমে থেমে দুই-তিন পশলা গুলি বর্ষণ করল। কোন জবাব এল না। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরেই তীরবেগে ছুটল সে গার্সিয়ার দিকে। এরমধ্যেই অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে লোকটা। আহত হলেও প্রাণের দায়ে ছুটছে, কাজেই পায়ের যন্ত্রণা এখন তুচ্ছ তার কাছে। আর এক-দেড়শো গজ যেতে পারলেই নিজের বোটে পৌঁছে যেতে পারবে গার্সিয়া।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ছুটছে মাসুদ রানা। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না। কাদাপানি বড় একটা বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রায়ই পানিভরা গর্তে পা ঢুকে যাচ্ছে, আছড়ে পড়ার অবস্থা হচ্ছে ওর। পিছনে হৈ-হৈ শব্দে না থেমে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। দীর্ঘদেহী এক যুবক ছুটে আসছিল ওর দিকে, কোণাকুণি। হোটেলের সীমানা দেয়ালের কাছে পাম গাছের সারির এপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা ফয়েজ আর আরমান্দো দেখে ফেলেছে। চেঁচিয়ে সতর্ক করছে তারা রানাকে।

অবশ্য ওকে কিছু করতে হলো না। চেঁচিয়ে উঠেই গুলি করেছে ফয়েজ, হুড়মুড় করে আছড়ে পড়েছে যুবক। ওদের খোলা জায়গায় দেখে নিশ্চিন্ত হলো রানা, তার মানে ওদিক ফর্সা হয়ে গেছে। সামনে নজর দিল ও, 'ছপাৎ', 'ছপাৎ', 'প্যাঁচ', 'প্যাঁচ' ইত্যাদি নানান আওয়াজ তুলে ছুটছে রবার্টো।

মাত্র দু'মিনিটে শেষ হয়ে গেল অসম দৌড় প্রতিযোগিতা। তখনও একশো গজ-মত পথ বাকি নিজের বোটে পৌঁছতে, কোনদিনই তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল অসহায় রাগে ক্ষিপ্ত, ঘর্মাক্ত রবার্টো গার্সিয়া। সাথে সাথে রানাও ব্রেক কষল। দু'জনের মাঝে পনেরো বিশ গজ ব্যবধান।

'তোমার দৌড় শেষ, বুঝতে পারছ, গার্সিয়া?' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল রানা। মেশিন পিস্তল ধরে আছে লোকটার বুক সোজা।

উত্তর দিল না সে। জ্বলন্ত চোখে দেখছে ওকে। ব্যারেলের মত বুক প্রচণ্ড পরিশ্রমে ফুলে ফুলে উঠছে তার। ডান পায়ের কাছে রক্ত জমে জমে পুকুর হচ্ছে। প্যান্ট রক্তে ভিজে লেপটে আছে গায়ের সাথে। হাঁটুর সামান্য ওপরে লেগেছে গুলি। কয়টা কে জানে! পিছনে কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে আসছে। নাদিরার গলা শুনতে পেল রানা।

'মৃত্যুর আগে কেন কি ঘটেছে তোমার জানা প্রয়োজন, গার্সিয়া,' নরম গলায় বলল মাসুদ রানা। 'না কি জেনে গেছ তুমি?'

উত্তর নেই। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে লোকটার দু'চোখ। পিস্তল ধরা হাত অসহায়ের মত ঝুলছে। তোলার সুযোগ হয়নি। রানার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। বিল্লাহও আছে দলে। শার্টের একটা হাতা নেই তার, ওটা দিয়ে বাঁধা আছে তার গুলি বিদ্ধ ডান বাহু।

'নিজের সমস্ত সম্পদ কেউ ছিনিয়ে নিলে কেমন লাগে, গার্সিয়া?' হাসল রানা। 'অনুমান করতে পারো? তোমার মত ডাকাতি করা নয়, কষ্ট করে অর্জিত সমস্ত ধনসম্পদ?'

কাঁপতে কাঁপতে নিজের রক্তের পুকুরে বসে পড়ল গার্সিয়া। কাঁপুনিটা ভয়ের, না ক্লান্তির বোঝা গেল না।

'একে তো তুমি চেনোই,' নাদিরাকে দেখাল ও। 'আসল পরিচয় কি জানো এর?' কেবল সামান্য বিস্ময় ফুটল লোকটার চোখে। এবং প্রশ্ন।

'শেখ জাবের আল উবায়েদের নাতনি। মনে পড়ে শেখ জাবের নামটা? এবার বুঝেছ নিশ্চই, কেন এসব ঘটেছে?'

চরম বিস্ময়ে একটু একটু করে হাঁ হয়ে গেল রবার্টো। নাদিরাকে দেখতে লাগল অবাক চোখে। এ সময় এমন চমক হয়তো আশা করেনি। কিছুটা বিরতি দিল রানা। 'আর আমাকেও নিশ্চই চিনে ফেলেছ এতক্ষণে?' অনির্দিষ্ট ইঙ্গিতে সাগর-আকাশ নির্দেশ করল ও। 'প্রকৃতি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছে, গার্সিয়া। তোমার মত নরকের কীটের উপযুক্ত নয় এ স্থান। অতএব...'

'না!' রানাকে অস্ত্র তুলতে দেখে আঁতকে উঠল গার্সিয়া। চোখ বিস্ফারিত। 'আমি...দুঃখিত! ক্ষমাপ্রার্থী! আমাকে...'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'লজ্জা দিয়ো না। ক্ষমার থলেটা সাথে আনিনি, কোথায় যেন ফেলে এসেছি মনের ভুলে। জাহান্নামে যাও তুমি, রবার্টো গার্সিয়া।'

ট্রিগারে তর্জনি চেপে বসল মাসুদ রানার। চার-পাঁচটা গুলি বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। সবগুলোই প্রশস্ত বুক পেতে গ্রহণ করল গার্সিয়া। কাদার ওপর দিয়ে পিছলে কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল সে, তারপর শুয়ে পড়ল পিঠ দিয়ে। চোখ খোলা। বাহুর ওপর হাতের চাপ অনুভব করে ঘুরে তাকাল রানা। নাদিরা খামচে ধরে আছে ওর হাত। দুচোখ বিস্ফারিত।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। বিল্লাহকে দেখল। 'জখম কেমন তোমার?'

'ও কিছু না, মাসুদ ভাই,' হাসল দানব। 'একটা বুলেট লেগেছে কেবল।'

'বুলেট?'

'বের করে ফেলেছে ফয়েজ।'

'গুড। আরমান্দো!'

'জ্বি, বস্?'

'তোমার আণ্ডারটেকার কোথায়?'

হতভম্ব হয়ে গেল লোকটা। 'জ্বি?'

'ম্যানুয়েল গার্সিয়া?'

'ও-ও তো ওখানে,' হাত তুলে গোল্ডেন ভিউ দেখাল সে।

'চলো,' ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

ফয়েজ ইতস্তত করতে লাগল। 'এটার কি হবে, মাসুদ ভাই?' লাশটা দেখাল সে।

'টেনে সাগরে নিয়ে ফেলে দাও।'

ফয়েজ আর বিল্লাহ বাদে ওরা তিনজন ফিরে এল হোটেলে। খামটা কুড়িয়ে নিয়ে আরমান্দোর গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাঙা লোকটা। মুখের ঘাম মুছছে ঘন ঘন। এখনও কাঁপছে একটু একটু। সোজা সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল তার চোখের দিকে।

ওর চাউনি সইতে না পেরে চোখ নামিয়ে নিল লোকটা। চট করে হাত বাড়াল রানা, তার কোটের একটা বোতাম টান মেরে ছিঁড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। অবাক চোখে ওর কাজ দেখছে নাদিরা–আরমান্দো। 'হুম!' বলল রানা। 'তাহলে তুমি?'

'কি হয়েছে, বস্?' তড়পে উঠল আরমান্দো। ঘন ঘন ওদের দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে সে।

বোতামটা দেখাল রানা। 'এই লোকই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে গার্সিয়াকে। এর কোটে হোমার প্ল্যান্ট করেছিল লোকটা।' পায়ের নিচে ফেলে বোতামটা ভেঙে ফেলল ও এক চাপে। ভেতর থেকে চকচকে কি যেন বেরিয়ে পড়ল। 'আগেই সন্দেহ হয়েছে আমার কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে। কিন্তু ধরতে পারিনি তখন। এখন বুঝলে তো, কেন এত সতর্ক...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, বাঘের মত ঢ্যাঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আরমান্দো সোকারাস। 'শালা বেঈমানের বাচ্চা!'

মনের সুখে লোকটাকে ধোলাই করল সে কিছুক্ষণ। এলোপাতাড়ি মেশিন পিস্তলের আঘাত, কিল, চড়, লাথি, ঘুসি বৃষ্টি করে শ্রান্ত হয়ে পড়ল নিজেই। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তখন রক্তাক্ত ম্যানুয়েল গার্সিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল আরমান্দো। কাদা পানি মেখে ভূত। তারপর, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গর্জে উঠল তার মেশিনগান। বুক ঝাঁঝরা করে দিল সে আণ্ডারটেকারের।

'আমি দুঃখিত, বস্। আমারই জন্যে...'

'বুঝতে পেরেছ বলে ধন্যবাদ, আরমান্দো। ভবিষ্যতে আজকের কথা মনে রেখো।'

'নিশ্চই! আর কখনও...'

এবারও বাধা পেল সে। ছুটে এসে হাজির বিল্লাহ-ফয়েজ। 'কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল ফয়েজ। 'গুলি কিসের?' পরক্ষণেই আরমান্দোর গাড়ির আড়ালে পড়ে থাকা মৃতদেহটা চোখে পড়ল। 'এ কি!' পালা করে উপস্থিত তিনজনকে দেখল ওরা।

তখনই কেউ কোন জবাব দিল না।

* * *